বিপ্লবের কথা

বিপ্লবের কথা

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

ওরিয়েন্ট লংম্যান

BIPLABER KATHA
(Subject : Revolution)
In Bengali
by Nityapriya Ghosh

প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৬৫

ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস
৩/৫ আসফ আলী রোড
নয়াদিল্লী ১

আঞ্চলিক অফিস
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
কলকাতা ১৩

নিকল রোড, ব্যালার্ড এস্টেট
বোম্বাই ১

৩৬ এ মাউণ্ট রোড
মাদ্রাজ ২

বি-৩/৭ আসফ আলী রোড
নয়াদিল্লী ১

প্রকাশক
শ্রী এন ভেঙ্কু আয়ার
রিজিওনাল ম্যানেজার,
ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
কলকাতা ১৩

মুদ্রক
শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা ৪

মুখবন্ধ

'বিপ্লব' সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্য কিছু লেখার চেষ্টা বাতুলতা। বিপ্লবকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন চোখে দেখেন। কারো কাছে বিপ্লব কল্যাণকর, কারো কাছে বিভীষিকা। যাঁদের চোখে বিপ্লব কল্যাণকর, তাঁরাও বিপ্লব সম্পর্কে একমত নন, বিশেষ ক'রে সেই বিপ্লব কী ক'রে সংঘটিত করা যায় সে-বিষয়ে তো নয়ই, তাঁরা অবশ্য বিপ্লবের লক্ষ্য সম্পর্কে একমত— বিপ্লব যে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য এবিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোনো মতদ্বৈধতা নেই। কিন্তু সেই বিপ্লবের পথ কী?

এটা অবশ্য ভবিষ্যৎ বিপ্লবের প্রশ্ন। ভবিষ্যৎ বিপ্লব কী রূপ নেবে সেটা তাঁরাই অনুমান করতে পারেন যাঁরা অতীত বিপ্লবের কথা জানেন। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, ইতিহাসে যে-সব বিপ্লব ঘটে গেছে, তার একটা সহজ ও সাধারণ পরিচয় দেওয়া।

বিপ্লব শুধু 'কমিউনিস্ট'রা করে, এরকম একটা ধারণা খুবই প্রচলিত। কিন্তু কমিউনিস্টদের জন্মের আগেই বহু বিপ্লব মানুষের সমাজে ঘটে গেছে। তবে কমিউনিস্টরা সেইসব অতীত বিপ্লব এবং ভবিষ্যতের বিপ্লবের একটা ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন, মার্কসের অনুসরণে। এই ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক কিনা বিচার করার জন্য জানা দরকার, ব্যাখ্যাটি কী? এই গ্রন্থে সেই ব্যাখ্যাই বিবৃত করার চেষ্টা হয়েছে।

তবে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নয়। গ্রন্থের আয়তনের চাইতেও বড়ো কথা, পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা আমাদের উদ্দেশ্যই নয়। বিপ্লব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ও অনুসন্ধান করার জন্য একটা প্রস্তুতি দরকার, এই গ্রন্থ সেই প্রস্তুতির ভূমিকারূপে কাজ করতে পারে বলে আমাদের আশা।

বলাই বাহুল্য, মার্কসীয় ব্যাখ্যা অনুসরণে গ্রন্থটি রচিত— অতএব গ্রন্থকারের নিজস্ব কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু গ্রন্থকারের লক্ষ্য অনুযায়ী ইতিহাসকে সাজাতে হয়ই, তার ফলে গ্রন্থকারের চরিত্রপ্রকৃতির অনুপ্রবেশও ঘটা স্বাভাবিক। তবুও, যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে,

মার্কসীয় ব্যাখ্যাকে অবিকৃত রাখার জন্য। এখানে অবশ্যই একটা প্রশ্ন উঠবে— মার্কসীয় ব্যাখ্যারও নানা রূপ। রাশিয়া যা বলে, চীন তা বলে না, চীন যা বলে যুগোস্লাভিয়া তা বলে না। কিন্তু প্রত্যেকেরই ধারণা, এরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে মার্কসকে অনুসরণ ক'রে যাচ্ছে। অতএব, কোন্ ব্যাখ্যা আমরা নেব ?

এই সমস্যার একটা সহজ সমাধান করা হয়েছে এই গ্রন্থে। রাশিয়ার বিপ্লব রাশিয়ার সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী আলোচনা করা হয়েছে ; চীনের এবং কিউবার ব্যাপারেও চীনের ও কিউবার বর্তমান সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী। নেদারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, শিল্পবিপ্লব সম্পর্কেও বিশেষ কোনো মতদ্বৈধতা নেই। স্পার্টাকাস এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে বেশি আলোচনাই হয় নি, তবে যাঁরা স্পার্টাকাসকে এবং ভারতবর্ষের তখনকার সিপাহী-কৃষককে বিপ্লবী মনে করেন, তাঁদের ভাষ্য দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থের কোনো কথাই গ্রন্থকারের নিজস্ব নয়, সবই কেউ না কেউ বলে গেছেন। বাহুল্য বিবেচনায় কোনো নামই উল্লেখ করা হল না।

ওরিয়েণ্ট লংম্যানের ভূতপূর্ব ম্যানেজার শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশের সাহস, ধৈর্য ও উৎসাহ ছাড়া এই বইয়ের প্রকাশ তো দূরের কথা লেখাই হতো না। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে গ্রন্থের ত্রুটি-বিচ্যুতিও তাঁর উপর বর্তাবে !

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

সূচিপত্র

১

বিপ্লবের কথা

সব বিপ্লবের মূলে রাজনৈতিক বিপ্লব

জল, বরফ আর বাষ্প— তিনটি একই পদার্থের তিন রূপ। কিন্তু তিনটি রূপের চরিত্রে আমূল পার্থক্য। জল ঠাণ্ডা হলে বরফ হয়। এই ঠাণ্ডা হওয়া নিশ্চয়ই সময়সাপেক্ষ। কিন্তু জলের এই ঠাণ্ডা হওয়াটা জলের চরিত্রের ক্রমশ পরিবর্তনেরই রূপ। যত ঠাণ্ডাই হোক, জলটা জলই থাকে। জল, ঠাণ্ডা জল, আরো ঠাণ্ডা জল— এইটুকু মাত্র পরিবর্তন। কিন্তু ঠাণ্ডা হতে হতে হঠাৎ একটা মুহূর্ত আসে যখন জলটা আমাদের চোখে আর জল থাকে না, বরফ হয়ে যায়— আমাদের কাছে জলের চরিত্রই পালটে যায়। এই যে পরিবর্তনের মুহূর্ত, যখন পদার্থটির চরিত্র আমূল পালটে গেল আমাদের কাছে, এই মুহূর্তকেই বলে বৈপ্লবিক মুহূর্ত, এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বলে 'বিপ্লব'। তেমনি জল গরম হতে হতে একটা মুহূর্তে বাষ্প হয়ে যায়, জলের চরিত্রে আর একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যায়।

আজকের জগতে 'বিপ্লব' শব্দটি ঘরে ঘরে চলছে। সুতরাং শব্দটির সম্যক পরিচয় পাওয়া দরকার। বিপ্লব অর্থাৎ আমূল পরিবর্তন নানা ধরনের হতে পারে— সামাজিক বিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লব, অর্থনৈতিক বিপ্লব, রাজনৈতিক বিপ্লব। আমরা আজকাল শিল্পে বিপ্লব, কৃষিতে বিপ্লব প্রায়ই উচ্চারণ করি। সব সময়ে যে খুব গুরুত্ব দিয়ে বিপ্লব কথাটি ব্যবহার করি তা নয়। অনেক সময় বড়ো পরিবর্তন বোঝাতেও এই শব্দের ব্যবহার, হয়ত অপব্যবহার, করি। জামাকাপড় খুব ছোট ক'রে পরা না-পরাকে বলি পোষাকআশাকে বিপ্লব, মেকআপ না নিয়ে স্টেজ না সাজিয়ে অভিনয় করাকে বলি থিয়েটারে বিপ্লব। 'বিপ্লবে'র এইসব লঘুপ্রয়োগ অনেক সময়েই শব্দটির গুরুত্ব কমিয়ে দেয়, তাই মূল কথাটি জানা দরকার।

অনেকের ধারণা সব ধরনের বিপ্লবের মূলে আছে 'রাজনৈতিক বিপ্লব'।

রাজনীতি— রাজার নীতি। আজকাল অবশ্য রাজা তেমন বিশেষ নেই, থাকলেও সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ আর নেই। এক সময় সমগ্র দেশ রাজার কথায় ওঠাবসা করত, রাজার মর্জিমতো দেশ চলত। রাজা বললে যুদ্ধ করতে হতো, রাজা বললে খাওয়া বন্ধ করতে হতো, রাজার দয়ায় জীবন থাকে, রাজার ক্রোধে জীবন যায়। সেই অর্থে রাজনীতি আজ নেই— রাজার নীতিই দেশের নীতি নয়। আজকাল রাজার স্থান নেয় সমাজের এক একটা প্রতিষ্ঠান। তবে রাজাই হোক, প্রতিষ্ঠানই হোক, রাজা বা প্রতিষ্ঠান চলে কোনো একটা শ্রেণীর স্বার্থে। সমাজে যখন যে শ্রেণী প্রবল সেই শ্রেণীর স্বার্থ অনুযায়ীই দেশ চলে। সেই শ্রেণীর নীতিই রাজনীতি। সেই শ্রেণীই রাষ্ট্রযন্ত্র চালায়। রাষ্ট্রযন্ত্র অর্থাৎ সৈন্য ব্যবস্থা, পুলিশ-ব্যবস্থা, আমলাব্যবস্থা এবং এদের সুবিধার্থে আর আর সব ব্যবস্থা। যখন এই শ্রেণী সমাজের আর একটি শ্রেণীর হাতে পরাজয় স্বীকার ক'রে রাষ্ট্রযন্ত্র সেই শ্রেণীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়, তখন সেই দেশের রাজনীতি এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধ সবই পালটে যায় আমূলভাবে। একটি শ্রেণীর হাত থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রের এই হস্তান্তরকেই বলে 'রাজনৈতিক বিপ্লব'।

ইতিহাসে দেখা যায় সমাজের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণী আছে। ইতিহাসের গতিতে কখনো একটি শ্রেণী প্রবল থাকে এবং অন্যান্য শ্রেণীকে শাসন করে। শিল্প-বিপ্লবের আগেকার কথা ধরা যাক। তখন সমাজে প্রবল ছিল সামন্তশ্রেণী। এই শ্রেণী তার দলবল নিয়ে সমাজের বাকি সব লোক অর্থাৎ কৃষক, শ্রমজীবী ইত্যাদিকে প্রায় দাসত্বের পর্যায়ে রেখে দিয়েছিল। তারা মনুষ্যপদবাচ্যই নয়, তারা সামন্তশ্রেণীর সুখের নিমিত্ত। মানুষকে তখন ভারবাহী জন্তুর মতো খাটানো হতো। মানুষ দাঁড় বেয়ে বড়ো বড়ো নৌকো চালাত, পাহাড় খুঁড়ে রাস্তা তৈরি করত, তাজমহল বা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মতো বিরাট বিরাট হর্ম্য তৈরি ক'রে সামন্তশ্রেণীর সাংস্কৃতিক মর্যাদা বাড়াত, ক্ষেতখামার চাষ ক'রে প্রভুর জন্য শস্য উৎপন্ন করত।

শিল্প-বিপ্লবের পর কলকারখানা প্রচণ্ড গতিতে বেড়ে চলল, কৃষক শ্রেণীর এক অংশ এবং অন্যান্য শ্রমজীবীরা পরিণত হল শ্রমিক শ্রেণীতে। শ্রমজীবীদের আর এক অংশ উন্নত হতে হতে আর একটি শ্রেণীতে পরিণত হল, যার সঙ্গে মিশে গেল সামন্ত শ্রেণী থেকে নামতে নামতে এক অংশ, আরো মিশল আর একটি অংশ, যার উদ্ভব হল ব্যবসায়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। এই শ্রেণী হল শ্রমিকের প্রভু, এর নাম 'বুর্জোয়া' শ্রেণী। ফরাসি শব্দ 'বুর্জোয়া', অর্থ

মধ্যবিত্ত। বুর্জোয়া শ্রেণী প্রবল হতে হতে সামন্ত শ্রেণীর হাত থেকে রাষ্ট্রযন্ত্র ছিনিয়ে নিল। ঘটল 'বুর্জোয়া বিপ্লব'। রাজা-রাজড়া, অভিজাত সম্প্রদায়, সামন্ত শ্রেণী বুর্জোয়াদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা হৃতশক্তি হল। ইতিহাসের গতিতে, আবার, শ্রমিকেরা বুর্জোয়াদের ধ্বংস করল, রাষ্ট্রযন্ত্র নিল আপন হাতে। ঘটল শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব, যার অপর নাম 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব'।

এই সামন্ততান্ত্রিক বিপ্লব, বুর্জোয়া বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব— সবগুলোর চরিত্র অবশ্য আলাদা আলাদা। এইসব নানা জাতীয় বিপ্লবের চরিত্র বোঝার জন্য জানা দরকার আরো বিশদভাবে বিভিন্ন বিপ্লবের কাহিনী। সেই কাহিনীই আমাদের গ্রন্থের বিষয়। কিন্তু তার আগে কিছু গোড়ার কথা একটু পরিষ্কার ক'রে জেনে নেওয়া যাক।

ইতিহাসের ইঞ্জিন হল বিপ্লব

ইতিহাসের চালিকা শক্তি হল বিপ্লব। সাবেকি চিন্তায় বিপ্লবকে ভাবা হতো আকস্মিক ঘটনা, নিতান্তই ব্যতিক্রম, অশুভ কর্ম। তখন ভাবা হতো ইতিহাস অগ্রসর হয় আস্তে-আস্তে, বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। বিপ্লব তারই মধ্যে আসে রূঢ়-ভাবে। ভাবা হতো সংখ্যালঘিষ্ঠ একটি দল সমাজের সংখ্যাগুরু অংশকে জোর ক'রে আপন পথে চালায় বিপ্লবের দিকে।

আজকাল যাঁরা ইতিহাসের এই বিবর্তনের কথা স্বীকার করেন না, যাঁরা ইতিহাস আলোচনা ক'রে দেখেন যে বরাবরই সমাজের একটি শ্রেণী অপর একটি শ্রেণীকে উৎখাত ক'রে সমাজকে উন্নতির পথে চালিয়ে নিয়ে এসেছে, তাঁরা অবশ্য বিপ্লবকে এই চোখে দেখেন না। তাঁরা বিপ্লবকে স্বাগতই জানান, কেননা এরই মাধ্যমে ইতিহাসের রুদ্ধ গতি আবার সবেগে এগিয়ে চলে।

যাঁরা বিপ্লবকে উন্নতির অন্তরায় না ভেবে উন্নতির সহায়ক মনে করেন তাঁদের কথা বুঝতে হলে আমাদের সমাজের গতি, ইতিহাসের গতির চরিত্র ভালো ক'রে বুঝে দেখা দরকার।

যে-কোনো সমাজের কথা ধরা যাক না কেন, দেখা যাবে সেই সমাজের মানুষেরা যা ভাবে, জগৎকে যে চোখে দেখে— তাদের ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি, আইন— সবকিছুর পিছনে আছে সেই সমাজের অর্থনীতি। অর্থাৎ কীভাবে

তার উৎপাদন-শক্তি ব্যবহার হচ্ছে? কী তার প্রাকৃতিক ধনসম্পদ, কতটুকু তার জমি, খনি, বনজ সম্পদ ইত্যাদি? সেই প্রাকৃতিক সম্পদকে সেই সমাজের মানুষ কীভাবে কাজে লাগাচ্ছে, কোন যন্ত্রপাতি দিয়ে, কোন বিদ্যা দিয়ে? তার মানুষেরা কি বিজ্ঞান এবং যন্ত্রবিদ্যা দিয়ে সেইসব যন্ত্রপাতি সম্যক ব্যবহার ক'রে প্রাকৃতিক ধনসম্পদ মানুষের কাজে লাগাতে পারছে? যাদের কাজে লাগান হচ্ছে তাদের কি ঠিকমতো কাজে লাগান হচ্ছে? যে যে-কাজ পারে তাকে কি সেই কাজে লাগান হচ্ছে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে যা পাওয়া যাবে তাকে বলে সেই সমাজের অর্থনীতির বনিয়াদ। এই বনিয়াদের উপর তৈরি হয় সেই সমাজের দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, আইন ইত্যাদি। অবশ্য বনিয়াদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজের দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি ইত্যাদিও সেই বনিয়াদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে অনেক সময় মনে হবে, বরাবরই সমাজের একটি শ্রেণী সমাজের এই অর্থনীতি ঠিকভাবে চালনা ক'রে নিজের এবং অন্যান্য শ্রেণীর মঙ্গল আনে। নিজের মঙ্গলই অবশ্য উদ্দেশ্য, তবে তা করতে গেলে অন্যান্য শ্রেণীর সহযোগিতা ছাড়া অসম্ভব, তাই তাদেরও কিছুটা মঙ্গল ঘটে। কিন্তু সেই সমাজের অগ্রগতির এমন একটা পর্যায় আসে যে শাসক শ্রেণী এবং শাসিত শ্রেণী উভয়েরই মঙ্গল এক সঙ্গে হতে পারে না। শাসক শ্রেণীর স্বার্থ শাসিত শ্রেণীর অগ্রগতির পথ রোধ করে। যার ফলে সমাজের সার্বিক মঙ্গল ব্যাহত হয়। উৎপাদনের শক্তির সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্কের একটা সংঘর্ষ বেধে যায়। যদি তখন শাসিত শ্রেণী সার্থকভাবে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে এই উৎপাদন-শক্তি বনাম উৎপাদন-সম্পর্কের সংঘর্ষের মীমাংসা করতে পারে, তাহলেই আবার নতুন ক'রে সেই সমাজের অগ্রগতি হয়।

এখানে 'শ্রেণী' কথাটি পরিষ্কার ক'রে নেওয়া দরকার। একটা সমাজের একজন মানুষ কোন শ্রেণীর তা বোঝার উপায় কী? উপায় হচ্ছে, সমাজের উৎপাদনে তার স্থান কোথায় তা নির্ণয় করা। উৎপাদনের যন্ত্র কি তার হাতে? তা হলে সে শাসক শ্রেণীতে। যদি না হয়, তবে সে শাসিত শ্রেণীতে।

উদাহরণের জন্য, একটি সমাজের কথা নেওয়া যাক— আজকালকার আমেরিকা অথবা ইয়োরোপের বেশির ভাগ দেশের একটি সমাজ— এই সমাজের উৎপাদনের সম্পর্ক হল মূলত ব্যক্তিগত মালিকানা। কিছু লোকের নিজস্ব জমি, নিজস্ব কারখানা আছে। সেই জমিতে, সেই কারখানায় কাজ ক'রে বাকি

সকলের জীবিকার সংস্থান হয়। যাদের এই নিজস্ব জমি, কারখানা, ঐশ্বর্য আছে, অর্থাৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি যাদের কর্তৃত্বে, তাদের বলা হয় 'বুর্জোয়া'। যাদের নেই তারা 'সর্বহারা'। এই সমাজগঠনের নাম 'ধনতন্ত্র'। এখানে ব্যক্তিগত টাকা মূলধন হয়ে খেটে বুর্জোয়াদের ঐশ্বর্য ক্রমাগত বাড়িয়ে চলে, আর বাকি সবাইকে ক্রমশ সর্বহারা ক'রে তোলে।

অবশ্য বুর্জোয়ারা যে বরাবরই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক ছিল তা নয়। এক-সময় তারাও শাসিত শ্রেণী ছিল, তখন শাসক শ্রেণী ছিল জমিদার বা সামন্তরা। তাকে বলা হতো 'সামন্ততন্ত্র'। আবার আজকের জগতে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, চীন রাশিয়া প্রভৃতি, লক্ষ করলে দেখা যাবে— সেখানে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ধ্বংস ক'রে সর্বহারা শ্রেণী সমাজের অর্থনীতির বনিয়াদ বিন্যাস করছে। মোটামুটি, সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। সব সম্পত্তি রাষ্ট্র চালনা ক'রে সমস্ত লোকের মধ্যে বিতরণ ক'রে দিচ্ছে। এবং সেই রাষ্ট্র চালাচ্ছে বুর্জোয়াদের বাদ দিয়ে জনসাধারণের প্রতিনিধিরা।

ইতিহাসের এই গতির নির্ণয় করেছে শ্রেণী-সংগ্রাম। শ্রেণী-সংগ্রামের চরম রূপ হল বিপ্লব। বিপ্লব অবশ্য হঠাৎ ঘটে না, একদিনে বা একমাসে বা এক বছরেও ঘটে যায় না। বিপ্লব একটা গতি। যখন এই গতি খুব দ্রুত হয়ে ওঠে তখন ঘটনার মধ্য দিয়ে বিপ্লব আমাদের চোখে ভেসে ওঠে।

আমরা এই গ্রন্থে বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের কাহিনী লিপিবদ্ধ করব। মনে রাখতে হবে, আমরা হয়ত বিশেষ বিশেষ ঘটনারই শুধু উল্লেখ করব। তার অর্থ এই নয়, ওই ঘটনাগুলিই বিপ্লব। ওই ঘটনাগুলি বিপ্লবের একটি বিশেষ রূপ, যার পরিচয় পেলে আমরা বিপ্লব সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পারব। ইতিহাসে আমরা সব ঘটনা লিখি না, বলি না, অনেক ঘটনা হয়ত আমরা জানি না, সব ঘটনার তাৎপর্য আমরা ধরতে পারি না। তবে অনেক আলোচনা চিন্তার পর সকলেই মেনে নেন কয়েকটি ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ। তাই ইতিহাসে তার উল্লেখ ঘটে। বিপ্লবের ইতিহাসেও তাই। আর আমাদের এই কাহিনীতে সেইসব ঘটনাও বলা হবে অনেক সংক্ষেপে, অনেক বাদ দিয়ে। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য, পাঠক যেন বিপ্লব সম্বন্ধে খুব সাধারণ ধারণা ক'রে বিশদভাবে বিপ্লবের ইতিহাস পড়ার প্রেরণা পান।

সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যতন্ত্র

সামন্ততন্ত্র জন্মেছিল তখন যখন দিগ্বিজয়ী রাজারা রাজ্যজয় ক'রে বেড়াত। রাজা রাজ্যজয় করল বটে, সাম্রাজ্য গঠন করল বটে, কিন্তু যাদের জয় করা হল, যাদের নিয়ে সাম্রাজ্য গঠন করা হল, তাদের একসূত্রে বাঁধা হবে কী দিয়ে? তখনো 'রাষ্ট্র' এই ধারণার উৎপত্তি হয় নি, অতএব রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ত হতে কাউকে বলা যায় না। রাস্তাঘাট এত উন্নত হয় নি, অতএব যোগাযোগ-সূত্র ক্ষীণ। ফলে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। ফলে সাম্রাজ্যগুলো থাকতো বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশ নিয়ে। এই বিচ্ছিন্ন অংশে, গ্রামে গ্রামে, তখন সামন্তরা প্রধান। তখন শিল্পের উদ্ভব হয় নি, কৃষিই জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায়। সামন্তরা তাদের জমি দিয়ে দিত কৃষকদের এই শর্তে যে কৃষক সামন্তের কাছে বিশ্বস্ত থাকবে, সামন্তদের কাজ ক'রে দেবে, শস্য উৎপাদন ক'রে দেবে, পরিবর্তে সামন্তরা কৃষকদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবে।

অর্থাৎ প্রথম দিকের ছোট ছোট জাতির শাসন এবং পরবর্তী আধুনিক রাষ্ট্রের শাসনের মধ্যকার অবস্থা ছিল 'সামন্ততন্ত্র'। এখনো যেসব দেশে কৃষি চলে ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন অংশে, যেখানে সামন্তরা কৃষকদের দিয়ে শুধু ভরণপোষণের জন্যই, নিজেদের এবং কৃষকদের দুয়েরই জন্য, শস্য উৎপাদন করে, সেসব দেশে বলা চলে সামন্ততন্ত্র চলছে।

কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। চাষবাস ক'রে শুধু ভরণপোষণই নয়, বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই থাকা যায়, এবং উদ্বৃত্তও থাকে। ফলে কৃষিতে উৎপন্ন পণ্য বাজারে চলে গেল কেনাবেচার জন্য। এই পণ্য বিক্রি ক'রে টাকা রোজগার করা যায় প্রচুর। যখনই কৃষিজাত পণ্য বিক্রি ক'রে প্রচুর টাকাপয়সা লাভ হতে শুরু হয়, তখনই সামন্ততন্ত্রের পরিবর্তন শুরু হয়। শিল্পে আরো লাভ হয়, ফলে কৃষি থেকে আসা ধনসম্পদ শিল্পে বিনিয়োগ করা হতে থাকে। উৎপত্তি হয় 'ধনতন্ত্রে'র।

ধনতন্ত্রে অবশ্য শুধু ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি বিনিয়োগ করা হয়। এটা করতে পারে তারাই যারা খেয়ে-পরেও টাকা বাঁচাতে পারে। তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিনিয়োগ ক'রে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে থাকে। কিন্তু সমস্ত সম্পত্তি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহার করলে লাভের বহর আরো বাড়ে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মারামারি ক'রে অনেক ধনসম্পদ অপচয় হয়। লোকেরও দুর্দশা বাড়ে। কেননা

প্রবল ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে বিকাশ লাভ করতে দেয় না। সবলেরা পণ্যের দাম ইচ্ছামতো করে— পণ্য সব সময় বিক্রি করে না, লুকিয়ে রাখে দাম বাড়ানোর জন্য। সাধারণ লোকের যেটা প্রয়োজন সেটা উৎপাদন না ক'রে যেসব জিনিসে তার লাভ বেশি সেসব জিনিস বেশি উৎপাদন করে। এই অব্যবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য প্রয়োজন হয় 'সমাজতন্ত্রে'র। এখানে ব্যক্তি কোনো সম্পত্তির অধিকারী নয়, রাষ্ট্র হল সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী। যেটুকু সম্পত্তি দেশে আছে তা সম্যকভাবে বিতরণ ক'রে রাষ্ট্র সবাইকে যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যে রাখে। যখন সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে সমস্ত মানুষ পরস্পরকে ভালোবাসবে, নিজের জন্য নয় পরের জন্য কাজ করবে, তখন উৎপত্তি হবে 'সাম্যতন্ত্র'। তখন রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না। মানুষ তখন ছোট ছোট গোষ্ঠী তৈরি ক'রে চেষ্টা করবে প্রত্যেক মানুষকে দিয়ে তার সাধ্যমতো কাজ করিয়ে নেওয়ার আর তার প্রয়োজনমতো সম্পত্তি তাকে দেওয়ার। রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয় শক্তির সাহায্যে শাসন চালানোর জন্য। যখন মানুষকে চালানোর জন্য শক্তির দরকার হবে না, মানুষ স্বেচ্ছায় অপরের এবং নিজের উন্নতির জন্য সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করবে তখন শক্তির বাহক রাষ্ট্রের আর দরকার হবে না।

রাষ্ট্র হচ্ছে সেই সংগঠন যা দিয়ে শাসকশ্রেণী শাসন চালায়— দেশের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী, সরকার চালানোর জন্য আমলাতন্ত্র, বিচার চালানোর জন্য বিচারব্যবস্থা। এটা অবশ্য নিতান্তই বাইরে থেকে দেখা। আসলে রাষ্ট্রের মূল শক্তি আসে জনসাধারণের কাছ থেকেই। তারা যদি রাষ্ট্রকে নৈতিক সমর্থন না জানায়, তার বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই রাষ্ট্র চালানোর উপযোগী কর্মী তৈরি ক'রে না তোলে, প্রচারের জন্য সংবাদপত্র, সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও ইত্যাদির সাহায্যে নিরন্তর সমর্থন না জানায়, তার উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রের শাসকদের অনুকূলে না নিয়ে যায়, তাহলে রাষ্ট্রের ভিত আলগা হতে থাকে। এই ভিত আলগা হয়ে গেলে জনসাধারণ যখন প্রত্যক্ষভাবে পুলিশ সৈন্য আমলাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং শাসিত শ্রেণী শাসক হওয়ার চেষ্টা করে তখনই হয় 'বিপ্লব'।

সমস্ত বিপ্লবের একটি সাধারণ লক্ষণ

বিপ্লবের, তার চরিত্র যাই হোক না কেন— সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক বা সমাজ-তান্ত্রিক— ইতিহাস লক্ষ করলে তার একটি সাধারণ চরিত্র ধরা পড়ে।

এটা ঠিক যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, এক শ্রেণী দ্বারা অপর শ্রেণী নিপীড়িত হতে থাকলে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে নিপীড়িত শ্রেণী বিপ্লব করে। তবে একথা ঠিক নয় যে কেবল নির্যাতিত হলেই নিপীড়িত শ্রেণী বিপ্লব করবে। বিপ্লবের জন্ম হতাশা থেকে নয়, আশা থেকে। শুধু পড়ে পড়ে মার খেলেই জনসাধারণ ক্রুদ্ধ হয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তা নয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় ভবিষ্যৎ দিনের আশা, স্বপ্ন। হতাশায় মানুষ মুষড়ে পড়ে, আশায় উদ্দীপ্ত হয়। তাই দেখা গেছে, বিপ্লবের সময় নিপীড়িত শ্রেণীর অধিকাংশই ক্লিষ্ট ক্লিন্ন বোধ করে, আর সেই শ্রেণীরই অগ্রসর অংশ ভবিষ্যতের কথা বলে তাদের উদ্দীপ্ত করে।

বিপ্লবের সময় এই শোষক শ্রেণী বা শাসক শ্রেণীর সঙ্গে শোষিত বা শাসিত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। ১৬৪০-এ ইংল্যাণ্ডে, ১৭৭৬-এ আমেরিকায়, ১৭৮৯-এ ফ্রান্সে অভিজাত সামন্ত শ্রেণীর সঙ্গে বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠেছিল। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায়, ১৯৪৯ সালে চীনে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণীর দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে।

যখন দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে তখন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের এক অংশের সহানুভূতি জন্মায় শোষিত ও শাসিতদের প্রতি। তারাই তখন বিশ্লেষণ করে শাসনের, শোষণের স্বরূপ। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য সবকিছুই একমুখী হয়ে ওঠে শাসিত শ্রেণীর জাগরণের উদ্দেশ্যে। নতুন দিনের স্বপ্ন রচনা করে তারা, এবং সেই স্বপ্ন যে বাস্তবে সম্ভব তার ব্যাখ্যা করে অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতি দিয়ে।

এই দ্বন্দ্ব যখন তীব্র আকার নেয়, তখন শোষক শ্রেণীর মধ্যে, শাসক শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যে-সংহতির সঙ্গে কাজ করলে শাসিত শ্রেণীর বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব, যে নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজ পরিবর্তন ক'রে নতুন অর্থনীতি বিন্যাস ক'রে সমাজের ভাঙন রোধ করা সম্ভব, সেই সংহতি সেই নিষ্ঠা তাদের আর থাকে না। অদূরদর্শিতার ফলে তারা পুরনো ঐতিহ্য, পুরনো সুখসুবিধা আঁকড়ে থাকে, তাও সুষ্ঠুভাবে নয়। এদের মধ্যে যাদের মানবিক বোধ প্রবল, তারা বেরিয়ে এসে যোগ দেয় শাসিত শ্রেণীর সঙ্গে। এটা সব বিপ্লবেরই একটা সাধারণ লক্ষণ।

বিপ্লবের সময় রাষ্ট্রের সশস্ত্র ক্ষমতা

ইতিহাসের পাঠকেরা একটা জিনিস লক্ষ করেছেন, পৃথিবীর যেখানেই বিপ্লব সফল হয়েছে সেখানেই রাষ্ট্রের সশস্ত্র ক্ষমতার ব্যবহারে গাফিলতি দেখা গেছে। পুলিশ আর সৈন্য লাগিয়ে বিপ্লবী জনতাকে শায়েস্তা করা যায় নি। উদাহরণ দেখা যাক।

ইংল্যাণ্ডে ১৬৪০ খ্রীস্টাব্দের বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় অবশ্য সে দেশে এমন সৈন্যবাহিনী ছিল না, যাকে আজকের দিনে সৈন্যবাহিনী বলা চলে। ইংল্যাণ্ডের রাজা তখন সাধারণ প্রজার উপর নির্ভর করত, সাধারণ প্রজাদের কাছেই সৈন্যরা থাকত। স্টুয়ার্টদের সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিরোধই বাধে, কে এই সৈন্যদের কর্তৃত্ব করবে সেই প্রশ্ন নিয়ে। ইংল্যাণ্ডের তখনকার রাজা প্রথম চার্লসের অনুগত ছিল অভিজাত সামন্ত শ্রেণী। এই অভিজাত শ্রেণীর আনুগত্যেই ছিল বিভিন্ন সৈন্যদল। কিন্তু পার্লামেণ্টের সঙ্গে বিরোধের সময় দেখা গেল রাজার দলে, অভিজাতদের দলে, সামন্তদের পক্ষে যথেষ্ট সৈন্য নেই। বিপ্লব ঘটে গেল।

আমেরিকতেও ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দের সফল বিপ্লবের সময় দেখা গেল, ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী এবং ব্রিটিশের অনুগত আমেরিকানরা শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে যথেষ্ট নয়। সেই বিপ্লবের সময় ব্রিটিশ প্রভুরা পুলিশবাহিনীকেও সম্যক ব্যবহার করতে পারে নি। ম্যাসাচুসেট্স উপসাগরে প্রথম যখন বিক্ষোভ শুরু হয় তখন পুলিশ ও সৈন্য যদি তৎপর হয়ে তা দমন করতে পারত, তাহলে আমেরিকার বিপ্লব কোন পর্যায়ে উঠত তা বলা বেশ মুশকিল।

১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সে চতুর্দশ লুইয়ের বেশ বিরাট বিশ্বস্ত সৈন্যবাহিনী ছিল। তাদের মধ্যে যারা ফরাসি ছিল তারা অবশ্য অনেকে বিপ্লবীদের প্রচারে শিক্ষিত হয়েছিল, কিন্তু তা ছাড়াও ছিল ভাড়া করা বিদেশী সৈন্য, যার সংখ্যাও ছিল বিরাট। এই ভাড়াটে সৈন্যরা পরে লুইয়ের জন্য প্রাণও দিয়েছিল। তা ছাড়া ছিল বিরাট শক্তিশালী অফিসার বাহিনী। অথচ জুলাই মাসে প্যারিসে যখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে যায়, তখন লুই এই সৈন্যবাহিনীকে কোনো কাজে লাগাতে পারেন নি। ফলে ঘটে যায় ফরাসি বিপ্লব। অথচ কিছুকাল পরেই, নেপোলিয়নের সময়, ১৮৪৮ সালে, ১৮৭১ সালে, বারবার দেখা গেছে এই সৈন্যবাহিনীই বিপ্লবী জনতা ছত্রাকার ক'রে দিয়েছে।

সৈন্য ও পুলিশের অকর্মণ্যতার আর এক উদাহরণ ১৯১৭ সালের পেট্রোগ্র্যাড। জনতা যখন রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভে নেমে গেছে তখন তাদের উপর গুলি চালাতে পুলিশ ও সৈন্য অস্বীকার করেছে। সরকারও তার বিখ্যাত কশাক সৈন্যদের সেসময় কাজে লাগাতে পারে নি।

বিপ্লবের সময় পুলিশ ও সৈন্যের এই ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ অবশ্য বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে করবে। যারা বিপ্লব-বিরোধী তাদের ধারণা, ইতিহাসের এইসব জটিল সংকটময় মুহূর্তে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের ভীমরতিতে ধরে, তাই বিপ্লব হয়। বিপ্লবীদের অবশ্য ধারণা, রাষ্ট্রের সশস্ত্র ক্ষমতাকে অকারণে বড়ো ক'রে দেখা হয়, ভয় করা হয়। দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে, সেই বিরাট শক্তির মোকাবিলা করার ক্ষমতা পুলিশ-সৈন্যের হয় না। কারণ পুলিশ-সৈন্যও তৈরি হয় দেশের সাধারণ শ্রমিক-কৃষকের পরিবারের সন্তানদের দিয়ে। তারা চাকরির চাইতে দেশের সাধারণ মানুষের প্রাণকে তখন বেশি দাম দেয়। তাই এক সময় জাগ্রত হয় মানবতাবোধ, দেশের মঙ্গল করার দায়িত্ব। অবশ্য সবসময়ে যে পুলিশ-সৈন্য সজ্ঞানে অস্ত্রপ্রয়োগে বিমুখ হয় তা নয়, তাদের অজ্ঞাতসারেও এই ব্যর্থতার জন্ম হতে পারে।

বিপ্লব সহসা ঘটে না। বিপ্লব ঘটে দেশের শাসক সম্প্রদায় চরম বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি হয় যখন, দেশের ভালো করার কোনো সামর্থ্যই যখন থাকে না তাদের। সেই বিশৃঙ্খলার সময় শাসকরা সৈন্য-পরিচালনেও ব্যর্থ হয়।

বিপ্লব ও যুদ্ধ

যুদ্ধের সঙ্গে বিপ্লবের কী সম্পর্ক? একটা সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয়। কারণ প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চীনে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং পূর্ব ইয়োরোপে অনেকগুলো দেশে জনগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে। তৃতীয় মহাযুদ্ধ ঘটলে তার পর আরো অনেক দেশে বিপ্লব ঘটবে বলে অনেকের ধারণা।

আগেকার দিনে রাজা-রাজড়া যুদ্ধ ক'রে আপনে রাজ্য বিস্তৃত করত, নিজের দেশের সম্মান বাড়াত। দিগ্বিজয়ের কাহিনী রাজার পক্ষে অপরিহার্য ছিল। আমরা সকলেই ছোটবেলা থেকে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত,

নেপোলিয়নের বীরত্বগাথা ভক্তিভরে শুনে এসেছি। প্রাচীন যুগের সেইসব যুদ্ধের সঙ্গে আজকের যুদ্ধের আকাশপাতাল তফাত।

আগেকার যুদ্ধ ছিল সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধ। তখনো সমাজের বিকাশ সম্যকভাবে হয় নি। ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ যুদ্ধের ফলে ধ্বংসের পরিমাণও কোনো দেশকে পুরো ঘায়েল করতে পারত না। আজকের যুদ্ধ ধনতান্ত্রিক যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এই যুদ্ধের চরিত্র আলাদা।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেখা যায় প্রথমে জনসাধারণকে শোষণ ক'রে সমাজের একটি শ্রেণী কর্তৃত্বশালী হয়ে ওঠে। এই পর্যায় যখন সুসংহত হয়ে ওঠে তখন সেই কর্তাস্থানীয় শ্রেণীরই মধ্যে একটি অংশ অপর অংশকে গ্রাস ক'রে কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেয়। অর্থাৎ ছোট ছোট পুঁজিপতিকে গ্রাস ক'রে বড়ো বড়ো পুঁজিপতি আরো বড়ো হয়ে ওঠে, একচেটিয়া হয়ে ওঠে। এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা আরো বড়ো হওয়ার জন্য, দেশের সীমানা ছাড়িয়ে অন্য অন্য দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে। তাদের বড়ো হওয়ার জন্য দরকার হয়ে পড়ে অনুন্নত দেশের ধনসম্পদ, তাই তখন কাড়াকাড়ি পড়ে যায় উপনিবেশ গড়ে তোলার জন্য। এই উপনিবেশ নিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। বড়ো হওয়ার জন্য একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে আন্তর্জাতিক যে সৌভ্রাত্র দরকার, সেই সৌভ্রাত্রই আবার পরস্পর হানাহানির ফলে নষ্ট হয়।

বর্তমান যুগে মহাযুদ্ধের ফলে যেমন একদিকে বিভিন্ন দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা সংঘর্ষ ক'রে দুর্বল হয়ে পড়ে, তেমনি আরো দুর্বল হয়ে পড়ে আর একটি কারণে।

যেসব দেশে পুঁজিপতিরা জনসাধারণকে শোষণ ক'রে একচেটিয়া পুঁজিপতি হয়েছে, সেইসব দেশে যুদ্ধের ফলে জনসাধারণের দুর্গতি আরো বেড়ে যায়। তারা শোচনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়ে শেষপর্যন্ত আত্মরক্ষার জন্য বিপ্লবী হয়ে ওঠে। দেশের অভ্যন্তরেই নানা ধরনের সংগ্রাম চালিয়ে তারা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আরো দুর্বল ক'রে দেয়।

তার উপর, যেসব উপনিবেশে পুঁজিপতিরা শোষণ ক'রে চলে সেইসব উপনিবেশের জনসাধারণও এই বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে চলে যায়। ফলে তাদের সামলাতেও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হিমসিম খেয়ে যেতে হয়।

এই তিন কারণে, বর্তমান মহাযুদ্ধগুলোর ফলে বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

তার অর্থ এই নয় যে মহাযুদ্ধ হলেই বিপ্লব ঘটবে। যেমন বলা যায়, প্রথম মহাযুদ্ধের পর কেবল রাশিয়াতেই বিপ্লব হয়েছিল, অন্য দেশে হয় নি। জার্মানি বা ফ্রান্স বা ইংল্যাণ্ড বা ইটালিতে হয় নি। অথচ রাশিয়াতে যেমন কমিউনিস্ট-জাতীয় পার্টি ছিল, তেমন জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, ইটালিতেও কমিউনিস্ট-জাতীয় পার্টি ছিল। তার অর্থ তাহলে এই যে, যেসব দেশে জনসাধারণের সঙ্গে গভীর সংযোগ রেখে তাদের আশাপূরণের জন্য ক্রমাগত আন্দোলন ক'রে বিপ্লবী দল বিপ্লবের ভিত পাকা রাখে, সেইসব দলই মহাযুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক ও সামরিক অন্তঃকলহের সুযোগ নিয়ে বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করতে পারে। সেই পথে যদি সেখানকার জনসাধারণ না এগুতে পারে তাহলে সেসব দেশের পুঁজিপতিরা যুদ্ধের পর নিজেদের আবার গুছিয়ে তোলার সময় পায়, সুযোগ পায়।

সেই জন্য দেখা যায় মহাযুদ্ধের পরে প্রায় সব দেশেই নানাধরনের অর্থনৈতিক সংস্কার ঘটে। পুঁজির উপর বেসরকারী কর্তৃত্ব কিছু পরিমাণে কমে, অনেকটাই রাষ্ট্র নিজের হাতে নেয়। সমাজের নানাধরনের কল্যাণমূলক কাজে রাষ্ট্র নিজেকে নিয়োজিত করে। অবশ্য এর স্থায়িত্ব সব সময়ে সুদৃঢ় হয় না। পুঁজিপতিরা অনেক সময়ই দূরদর্শী হয় না— খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের শক্তিশালী করার জন্য রাষ্ট্রকে সব কর্তৃত্ব তো নিতে দেয়ই না, উপরন্তু যেসব কর্তৃত্ব রাষ্ট্র নেয় তাও বানচাল ক'রে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যায়। ফলে সেসব দেশে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কোনো কোনো পুঁজিপতি দেশ কিন্তু আবার অনেক বেশি দূরদর্শী। বিপ্লবের সম্ভাবনা অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীকে সরিয়ে শ্রমিক-কৃষকদের প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করার সম্ভাবনা আছে বলেই তারা সব সময়ে সংস্কারের সাহায্যে জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ অংশকে মোটামুটি সন্তুষ্ট রাখে।

বিপ্লব কি স্বতঃস্ফূর্ত, না পরিচালিত?

অনেকের ধারণা বিপ্লব কেউ সচেতনভাবে ঘটায় না, আপনা থেকে ঘটে যায়। আবার অনেকের ধারণা, আপনা থেকে কিছুই ঘটে না; যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর না হওয়া যায়, তাহলে বিপ্লব ভেস্তে যায়। দ্বিতীয় ধারণা যারা পোষণ

করে তারা অবশ্য বলে না যে ষড়যন্ত্র ক'রে গোপন শলাপরামর্শ ক'রে চক্রান্ত ক'রে বিপ্লব সম্পন্ন করা যায়। তারা বলে ইতিহাসের অগ্রগতির কয়েকটি পর্যায় আছে। সেইসব পর্যায়ে জনসাধারণের সুখদুঃখ আশা অভিলাষ লক্ষ করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে শাসক সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান ব্যর্থতা অসামর্থ্যের কথা খেয়াল রাখলে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে সচেতন বিপ্লবে পরিণত করা যায়। এটা সম্ভব কয়েকটি সংকটময় মুহূর্তে জনসাধারণকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারলে। দুই ধারণার মধ্যে কোনটি সত্য অথবা বেশি সত্য, তা বিবেচনা করার জন্য, একটি উদাহরণ নেওয়া যাক— ফরাসি বিপ্লব।

ফরাসি বিপ্লবের সূত্রপাত ব্যাস্টিলের দাঙ্গা থেকে। সেই দাঙ্গা কি হঠাৎ ঘটে গিয়েছিল, না সুপরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছিল? ঘটনাটি কী? প্যারিসের লোকেরা একদিন শুনল জনপ্রিয় মন্ত্রী নেকারকে বরখাস্ত করা হচ্ছে, রাজা লুই শহরের চারধারে সৈন্য মোতায়েন করছেন, জাতীয় পরিষদ বোধ হয় ভেঙে দেওয়া হচ্ছে এবং সৈন্যবাহিনী দিয়ে শাসনযন্ত্র চালানোর ব্যবস্থা কায়েম করা হচ্ছে। *লোকেরা ক্ষেপে গেল, ব্যাস্টিল ভেঙে ফেলল, বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলল।*

এইভাবে ফরাসি বিপ্লবকে দেখা কি ঠিক? এটা নিশ্চয়ই ঘটনা, কিন্তু ঘটনার পিছনেও ঘটনা আছে। সেটা হল, বিপ্লবী নেতাদের নিরন্তর প্রচারকর্ম। এঁরা কাগজপত্রের মাধ্যমে, সভাসমিতিতে, বই লিখে, ক্রমাগত ফ্রান্সের শাসকদের, বিশেষ ক'রে চার্চ বা গির্জার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন ক'রে তুলেছিলেন। রাজার তখন শোচনীয় অর্থনৈতিক সংকট। সেই সুযোগ নিয়ে বিপ্লবী নেতারা এস্টেটস জেনারেল স্থাপনের প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে নিয়েছিলেন, এবং ক্রমশ জাতীয় পরিষদে প্রভাব বিস্তার ক'রে চলেছিলেন। তাঁরা সংখ্যায় হয়ত নগণ্য ছিলেন, কিন্তু কাজে তাঁরা সুসংহত এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল তাঁদের। তাই আসলে রাজা লুই যখন প্যারিসের চারধারে সৈন্য মোতায়েন করছিলেন জাতীয় পরিষদকে এই সংখ্যায়-নগণ্য কিন্তু অসীম প্রভাবশালী নেতাদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য, তখন এই বিপ্লবী নেতারা ব্যাস্টিলের দাঙ্গা ঘটানোর জন্য সজ্ঞানে কাজ ক'রে চলেছিলেন। রাস্তার কোনায় কোনায়, কাফে-রেস্তোরাঁয় তাঁদের অনুচরেরা অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে চলেছে, উগ্র প্রচারধর্মী পুস্তিকা চতুর্দিকে বিলি করা চলছে, সৈন্যদের মধ্যে বিক্ষোভ তৈরি করার জন্য কর্মীদের পাঠানো হচ্ছে। নেতারা খালি ধৈর্য ধরে বসেছিলেন উপযুক্ত সময়ের জন্য। সেই সময় খবর এল নেকারকে বরখাস্ত করা হচ্ছে। বিপ্লবী নেতা মিরাবো

নির্দেশ দিলেন রাস্তায় নেমে পড়ার জন্য। ব্যাস্টিলের উপর আক্রমণ চলল। ব্যাস্টিলের পতন হল। আপাতদৃষ্টিতে সুতরাং যাকে মনে হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত, আসলে তা ছিল সচেতন, পরিকল্পিত।

বিপ্লবের আগে দ্বৈত সার্বভৌমত্ব

যে-কোনো শাসনতন্ত্রেই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে। সামন্ততন্ত্রে রাজার বা পুরোহিতের হাতে, বুর্জোয়াতন্ত্রে বুর্জোয়াদের সংসদে, সমাজতন্ত্রে সর্বহারাদের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানে। এই রাজা, সংসদ বা প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্র চালায়, তাদের হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা— স্বরাজ্য শাসন, পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ, শত্রুর হাত থেকে দেশরক্ষা ইত্যাদি। যে-কোনো শাসনই, যখন সেটা সুবিন্যস্ত থাকে, দেখা যায় সুদৃঢভাবে ন্যস্ত আছে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর উপর। এই ক্ষমতা ভাগ করা যায় না, ভাগ করতে গেলেই রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে।

বিপ্লব একদিনে হয় না। আস্তে আস্তে সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরে, অর্থনীতি শিথিল হয়ে যায়, রাজনীতিও দুর্বল হয়ে পড়ে। বিপ্লবের আগে তাই দেখা যায় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আর কোনো প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে না— তা রাজাই হোক, সংসদই হোক, কোনো প্রতিষ্ঠানই হোক। প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌম ক্ষমতার পাশাপাশি আর একটি সার্বভৌম ক্ষমতা গজিয়ে ওঠে— একটি শাসকদের, আর একটি শাসিতদের। বলা বাহুল্য, একই সঙ্গে একটি দেশে দুটো সার্বভৌম ক্ষমতা থাকতে পারে না, তাহলে কথাটির কোনো অর্থ ই থাকে না। আসলে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার সার্বভৌমত্ব আর নেই, যদিও বাইরে থেকে মনে হয়, এই প্রতিষ্ঠানটিই সার্বভৌম ক্ষমতা চালাচ্ছে।

এর নজির পাওয়া যাবে ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়। এসময়ে যদিও রাজারি হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা, আসলে বিপ্লবের প্রাক্কালে জনসাধারণের সমর্থন পার্লামেণ্টের প্রতি। একই জিনিস লক্ষ করা যায় ফরাসি বিপ্লবের সময়। ষোড়শ লুই নামে রাজা, আসলে দেশের শাসন চালাচ্ছে এস্টেটস জেনারেল। রাশিয়ার বিপ্লবের সময় ক্ষমতা চলে গেছে সরকারের হাত থেকে সোভিয়েটের হাতে। চীনের বিপ্লবের সময় অর্ধেক দেশ শাসন করছে কমিউনিস্টরা, বাকি অর্ধেক

কুওমিণ্টাঙ সরকার। আমেরিকার বিপ্লবের সময় কোনটি বৈধ সরকার কোনটি অবৈধ সরকার সেই জ্ঞানটিই লুপ্ত হয়েছিল।

বিপ্লবের সাফল্যের মূলে থাকে এই দ্বৈত সার্বভৌমত্ব। শাসিত শ্রেণী বিপ্লবের আগেই কিছুদিন সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ ক'রে ক'রে শিক্ষিত হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রযন্ত্র হাতে এলে তা কী ক'রে চালাতে হয় সেবিষয়ে তারা অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে।

বিপ্লব জনগণের উৎসব

বিপ্লব হচ্ছে জনগণের কাছে উৎসব। জনসাধারণের সমর্থন এবং সক্রিয় সহযোগ ছাড়া বিপ্লব হয় না। ইতিহাস পাঠ করলে এই ধারণাই হয়।

যে-কোনো দেশেরই জনসাধারণকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যায়, তাতে আছে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, বৃত্তিধারী ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী, ছোট ব্যবসায়ী এবং এদের শাসক। শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটে যখন, অনেক বিদ্রোহ কেন্দ্রীভূত হয়ে বিপ্লবে পরিণত হয় যখন , তখন দেখা যায় জনসাধারণের সক্রিয় অংশই সেখানে প্রবল।

কিন্তু শাসকের চরিত্র, শাসনের চরিত্র বিভিন্ন রকম হতে পারে— সামন্তের শাসন, বুর্জোয়ার শাসন, কমিউনিস্ট পার্টির শাসন।

বুর্জোয়া বিপ্লব যখন হয়, অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ যখন হয়, তখন কেবল বুর্জোয়া শ্রেণীই বিপ্লব করে না— আসলে বিপ্লব করে জনসাধারণই। তাহলে এই বিপ্লবকে বুর্জোয়া বিপ্লব বলা হয় কেন? কেননা, বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে, বুর্জোয়াদের স্বার্থে এই বিপ্লব হল। বিপ্লব সবসময়েই জনসাধারণ করে, তবে তাতে যদি সামন্ত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষিত হয় তাহলে তা হবে সামন্ততান্ত্রিক বিপ্লব। যদি বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে হয় তাহলে তা হবে বুর্জোয়া বিপ্লব। যদি জনসাধারণের স্বার্থে হয় তাহলে তা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

সামন্ততান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা হলেই বুর্জোয়া বিপ্লব হতে পারে। আবার বুর্জোয়া বিপ্লব সমাধা হলেই সমাজতান্ত্রিক বা সর্বহারা বিপ্লব সমাধা হয়। এটা অবশ্য আগেকার দিনে সত্য ছিল। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে বুর্জোয়ারা তাদের ধনতন্ত্র বজায় রাখার জন্য দেশের সীমানা ছাড়িয়ে উপনিবেশ তৈরি ক'রে শোষণ করে, সাম্রাজ্যবাদী হয়ে পড়ে। এই সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশের দেশীয় সামন্ত-

তন্ত্রও দুর্বল ক'রে দেয়, ধনতন্ত্রকেও সবল হতে দেয় না। ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য, দেশের জনসাধারণ বুর্জোয়াদের সঙ্গে সহযোগিতা করেই, অবশ্য সংগ্রামের নেতৃত্ব আপন হাতে রেখে, সাম্রাজ্যবাদী এবং সামন্ত-বাদীদের ধ্বংস করে। এই বিপ্লব তাই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নয়, এটা জনগণতান্ত্রিক।

গণতন্ত্র কথাটির এখানে একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। সামন্ততন্ত্রে গণতন্ত্রের স্থান নেই। সামন্ততন্ত্র তখনই থাকে যখন দেশ শিল্পের উপর নির্ভর করে না, করে কৃষির উপর এবং সেই কৃষিও মোটামুটি মানুষের শক্তির উপর নির্ভরশীল, যন্ত্রের উপর নয়। মানুষের শক্তি যেহেতু যন্ত্রের তুলনায় কম উৎপাদনশীল, তাই সামন্ততন্ত্রে উৎপাদন খুব বেশি হয় না। আর যা হয় তাও ছোট ছোট গ্রামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। সামন্ততন্ত্র কৃষকদের একজোট হতে দেয় না, তাদের কাছে মানুষের অসাধারণ ক্ষমতার কথা, অসাধারণ সম্ভাবনার কথা লুকিয়ে রাখে। তা সাধারণ লোককে আপন-নির্ভর হতে দেয় না, তাদের শেখায় ভগবানের উপর নির্ভর করতে, রাজার উপর নির্ভর করতে— রাষ্ট্রশাসনে তাদের কোনো দায়িত্ব আছে, সেকথা কৃষকদের কাছ থেকে, সাধারণ লোকদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। অর্থাৎ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এখানে একেবারেই বিকাশ লাভ করে না। এবং গণতন্ত্র সেখানে অনুপস্থিত।

ধনতন্ত্র আবার ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর অসাধারণ জোর দেয়— প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার নিজের সুখের জন্য, একথা স্বীকার করে। তাই এই তন্ত্রের নাম গণতন্ত্র। কিন্তু যখন গণতন্ত্র একটু বিকশিত হয় তখনই দেখা যায় বুর্জোয়ারা প্রতিটি ব্যক্তির পুরো ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে দেওয়ার অন্তরায় হয়ে ওঠে। তার কারণ, বুর্জোয়া-গণতন্ত্র নির্ভর করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুরো বিকাশের মূলে আছে যে-ব্যক্তি প্রবল তার প্রকাশ ও দুর্বলের বিনাশ। ফলে সমাজে প্রবল ব্যক্তি তথা প্রবল ব্যক্তিজোটই সমাজের বাকি অংশকে দাপটে রাখে, শোষণে রাখে। ফলে মুখে গণতন্ত্র বললেও দেখা যাবে সেটা প্রবলের গণতন্ত্র, দুর্বলের নয়। তাই একে বলে বুর্জোয়া-গণতন্ত্র— জনসাধারণের গণতন্ত্র নয়।

সামন্ততন্ত্রে মানুষ থাকে ধর্মপ্রবণ। ধর্ম অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ধর্ম, যার মাধ্যমে শোষণ চলে। ধর্মের ভয় দেখিয়ে মানুষকে শাসন করে সামন্তদের প্রতিভূ রাজারা। বুর্জোয়া-গণতন্ত্র মানুষকে মানুষের দাম দেয়। জন্ম নেয় মানবতাবোধ।

কিন্তু এই বুর্জোয়া মানবতাবোধ প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিকে ব্যক্তির মধ্যে আটকে রাখতে চায়। শ্রমিককে তার একক সীমার মধ্যে আটকে রাখতে চায়, অন্য শ্রমিকের সঙ্গে জোট বাঁধতে দিতে চায় না—মানুষকে ব্যক্তিগত মানুষ ক'রে রাখতে চায়, সামাজিক মানুষে পরিণত হতে দিতে চায় না। সমাজতন্ত্র আবার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিলন ঘটিয়ে শোষকদের উচ্ছেদ ক'রে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। তাই এর নাম সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র।

বিপ্লব এবং বিদ্রোহ

বিপ্লব এবং বিদ্রোহ এক নয়। সব বিপ্লবের মূলেই বিদ্রোহ থাকে, কিন্তু সব বিদ্রোহই বিপ্লব হয়ে ওঠে না। বিপ্লব অনেক বড়ো ব্যাপার, বিদ্রোহ তার তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র। যখন কেউ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে এবং কর্তাস্থানীয় লোকের বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন তা হয় বিদ্রোহ। যেমন ছাত্ররা অনেক সময় শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, পুলিশ তাদের অফিসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, ব্যক্তি সামাজিক ন্যায়-অন্যায়বোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ যখন শ্রেণী-ভিত্তিক হয় এবং উদ্দেশ্য হয় রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করা, তখন তা বিপ্লবে পরিণত হয়।

বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে সেটা বিদ্রোহ, আর সার্থক হলে তা বিপ্লব, এই ধারণা ভুল। বিপ্লব ব্যর্থ হলেই আবার তা বিদ্রোহে পরিণত হয় না। বিপ্লব ব্যর্থও হতে পারে, সার্থকও হতে পারে।

একটা দেশে যখন বিদ্রোহ ঘটে, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বিদ্রোহ ঘটছে। সক্রিয়ভাবে কর্তাস্থানীয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণকেই বিদ্রোহ বলে। এই বিদ্রোহের স্থায়িত্ব, তার ক্ষমতা— বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে। কিন্তু একটা দেশে বিপ্লব হচ্ছে কি না বোঝার উপায় কী? উপায়, এটা দেখা যে, বিদ্রোহের উদ্দেশ্য কী? রাষ্ট্রযন্ত্র আয়ত্তে আনা? যারা চেষ্টা করছে তারা কি কোনো শ্রেণীর স্বার্থে এটা করছে? বিপ্লবের ফলে নতুন শাসকশ্রেণীর শ্রেণীচরিত্র কি পালটে গেল? যদি এই তিনটির উত্তর হয়, হ্যাঁ, তাহলে সেই বিদ্রোহকে বিপ্লব বলা চলে।

একটা দেশে যখন তুমুল আলোড়ন চলে, তখন তার চরিত্র নিয়ে মত-

বিরোধ হতেই পারে। যেমন ধরা যাক, স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ। অনেকে মনে করেন, এটা বিদ্রোহ, বিপ্লব নয়। আবার অনেকে মনে করেন, এটা বিপ্লব, সাধারণ বিদ্রোহ নয়।

আমাদের বিবরণ স্পার্টাকাসকে নিয়েই শুরু করা যাক। এটা মনে রাখতে হবে যে ইতিহাসকে বিজ্ঞানসম্মত ক'রে তোলার চেষ্টা চলছে। কিন্তু ইতিহাস এখনো বিজ্ঞান হয়ে ওঠে নি। অর্থাৎ একটা ঘটনা বা এক-সারি ঘটনা বিদ্রোহ না বিপ্লব, তা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্ণয় করার জন্য যে প্রচুর তথ্য থাকা দরকার তা না-থাকার ফলে, অনেকে স্পার্টাকাসের বিরুদ্ধাচরণকে বিপ্লব না ভেবে বিদ্রোহ হিসেবেও গণ্য করতে পারেন। যাঁরা স্পার্টাকাসের বিদ্রোহকে বিপ্লব মনে করেন, তাঁরা কী চোখে স্পার্টাকাসকে দেখেন, তা অতি সংক্ষেপে বলে আমরা ইতিহাসের সর্বসম্মত বিপ্লবের প্রসঙ্গে যাব।

স্পার্টাকাস

দাসপ্রথা কবে কোথায় কীভাবে শুরু হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস আজও লেখা হয় নি। প্রাচীন যুগে অনেক দেশেই যে এই প্রথা বেশ বিস্তৃত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তদানীন্তন মহাকাব্য নাটক ইত্যাদি থেকে। সব দেশে যে একইভাবে দাসপ্রথার উৎপত্তি হয়েছিল তা নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দাসের উদ্ভব হতো যুদ্ধের ফলে। যুদ্ধবন্দীদের দাসে পরিণত করাই তখন রেওয়াজ— একক-ভাবেই হোক আর দলবদ্ধভাবেই হোক। মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে দাসে পরিণত করাই ছিল মানবিকতার ধরন। প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে দাসদের উদ্ধার করাও চলত। দাসের উদ্ভবের আর একটা কারণ জলদস্যুদের উৎপাত। তারা জোর ক'রে মানুষ ধরে বিক্রি ক'রে দিত দাস হিসেবে। যুদ্ধে হেরে গেয়ে এক দেশের রাজা নিজের প্রজাদের দাস হিসেবে ঘুষ দিয়েও আত্মরক্ষা করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই দেশের দুটি বিবাদী দলের মধ্যে এক দল জিতে আর এক দলকে দাসে পরিণত করত। অনেক সময় দেশে গুরুতর অন্যায় করলে— রাষ্ট্রদ্রোহিতা, হত্যা, চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি— অন্যায়ের শাস্তি হিসেবে দাসে পরিণত করাও রেওয়াজ ছিল। টাকা ধার নিয়ে শোধ না দিতে পারলেও এই দাসত্ব শাস্তি জুটত।

গ্রীসে, আমেরিকায়, ভারতবর্ষে, চীনে, রোমে— দাসপ্রথা ছিল সর্বত্র। প্রাচীন যুগে যেমন, আধুনিক যুগে এই সেদিনও আমেরিকায় চালু ছিল দাসপ্রথা।

দাসদের নানাভাবে ব্যবহার করা হতো। রাজপ্রাসাদে ভৃত্যের কাজে, আবার অনেক সময় লেখকের, অনুবাদকের। নানা দেশ থেকে আনা বিভিন্ন ভাষায় পণ্ডিতেরাও দাসে পরিণত হতেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য দাসদের কপালে ছিল মাঠে হাল ধরা, খনিতে হাতুড়ি ঠোকা, বা রাজার সম্পত্তি বাড়ানোর ব্যাপারে কাজ করা। দাসপ্রথার প্রথম যুগে অবশ্য দাসদের মানুষ হিসেবেই ভাবা হতো; কিন্তু ক্রমশই দাসরা দাসই, মানুষ নয়, তাদের সঙ্গে পশুর কোনো পার্থক্য নেই, এই ভাবটা প্রবল হয়ে উঠল। সভ্য দেশে মানুষের নীতিবোধ ক্রমশই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিল, কিন্তু সেই নীতিবোধ ছিল কেবল সচ্ছল শ্রেণীদের মধ্যে। দাসের ব্যাপারে নীতিবোধ ব্যাপারটা একেবারে ছিলই না। এই দাসেরাই ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সার্ফে পরিণত হয়েছিল, জমিদারের জমির কাজে নিযুক্ত হয়ে সামন্তপ্রথার ভিত হয়ে উঠেছিল।

খ্রীস্টের জন্মের কয়েক শো বছর আগে থেকে কয়েক শো বছর পর পর্যন্ত যে রোমক সভ্যতা জগতের ঈর্ষার বস্তু হয়ে উঠেছিল তার মূল ভিত্তিও রচনা করেছিল এই দাস শ্রেণী। তখন রোমক সমাজ দুভাগে বিভক্ত, প্যাট্রিশিয়ান আর প্লিবিয়ান। অভিজাত, ধনী, জমির মালিক প্যাট্রিশিয়ান— যাবতীয় সুখসুবিধার অধিকারী তারাই। কৃষক শ্রমিক বণিক প্রভৃতি আর সবাই প্লিবিয়ান— এদের অনেকেই টাকাপয়সায় প্যাট্রিশিয়ানদের সমকক্ষ হলেও, অভিজাত সুখ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই দুই শ্রেণী ছাড়া আর ছিল দাস। এই দাসের সংখ্যা কখনো কমত কখনো বাড়ত। সেটা নির্ভর করত কটা যুদ্ধ হল, কত বড়ো যুদ্ধ হল, যুদ্ধে কী লাভ হল ইত্যাদির উপর। তবে রোমে এমন এমন সময়ও ছিল যখন পুরো সমাজের এক-চতুর্থাংশই ছিল দাস। খ্রীস্টের জন্মের পর, খ্রীস্টান ধর্মের প্রসার হওয়ার পর, খ্রীস্টের মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও কিন্তু দাসপ্রথার কোনো হেরফের হয় নি।

দাসরা তাদের এই অবমানবত্ব বরাবরই মুখ বুজে সহ্য করে নি। রোমে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে বহুবার তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিদ্রোহ করেছে। রোমে তখন একটি রাজনৈতিক দলই ছিল, নাম পপুলারেস; যার সদস্যরা শাসক শ্রেণীভুক্ত হয়েও দাসদের, গরিবদের কল্যাণের কথাও ভাবত।

এমনই একটি বিদ্রোহ এই দলের অনুপ্রেরণায় সংঘটিত হয়েছিল স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে।

জন্মসূত্রে থ্রেশিয়ান, স্পার্টাকাস ছিলেন রোমক সৈন্যের সেনানী। সৈন্যদল ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর আবার ধরা পড়ে তিনি দাসে পরিণত হন। দাস অবস্থায় তাঁকে বাধ্য করা হয় গ্ল্যাডিয়েটরের যুদ্ধে নামতে। রোমে তখন গ্ল্যাডিয়েটরের যুদ্ধ দেখা প্রবল ফ্যাশন। দুই দাসকে নামিয়ে দেওয়া হতো অস্ত্র হাতে, অ্যারিনায় তারা যুদ্ধ করত, একজন আরেক জনকে হত্যা না করা পর্যন্ত। আর অভিজাত দর্শকেরা তাই দেখে খুশি হতো। অবশ্য অনেক সময় দর্শকরা অনুমতি দিলে হত্যা না-ও ঘটতে পারত।

স্পার্টাকাস এমনই সতীর্থ সত্তরজন গ্ল্যাডিয়েটরকে সঙ্গে নিয়ে কাপুয়ার গ্ল্যাডিয়েটর শিক্ষণশিবির থেকে পালিয়ে গেলেন, আশ্রয় নিলেন ভিসুভিয়াস পাহাড়ের উপর। সেটা খ্রীস্টপূর্ব ৭৩ সাল। তাঁর সঙ্গে যোগ দিল বহু পালিয়ে-আসা দাস। স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে এই দাসেরা একটি সশস্ত্র দলে পরিণত হল, উদ্দেশ্য রোমক অভিজাতদের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত ক'রে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করা।

সংঘর্ষ অবশ্য অনিবার্য। স্পার্টাকাস দুবার তাঁর সৈন্য নিয়ে রোমক বাহিনীর দুটো বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর দলের সৈন্যরা দক্ষিণ ইটালির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। স্পার্টাকাস-বাহিনীর নাম শুনলে অভিজাত শ্রেণীতে ত্রাস জন্মাত। সেই বাহিনীতে তখন কয়েক সহস্র সদস্য। দুজন রোমক কনসালকে পরাজিত ক'রে স্পার্টাকাস আলপ্‌স পর্বতমালার দিকে এগিয়ে চললেন, যাতে তাঁর স্বাধীন সদস্যরা আবার আপন আপন ঘরে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু তাঁর সতীর্থরা স্পার্টাকাসকে ছেড়ে যেতে অস্বীকার করল। তখন সিসিলিতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্পার্টাকাস লুসিয়ানাতে ফিরলেন। এইখানে তাঁর সঙ্গে সংঘর্ষ হল বিখ্যাত রোমক সেনাপতি ক্র্যাসাস-এর। ক্র্যাসাস-এর অধীনে প্রায় আট লিজিয়ান সৈন্য, অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ হাজার সুদক্ষ রোমক সশস্ত্র সৈন্য। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্পার্টাকাস ধরা পড়লেন, ক্রসে ঝুলিয়ে মারা হল তাঁকে খ্রীস্টপূর্ব ৭১ সালে। তাঁর যেসব সঙ্গী পালাতে পারল, উত্তরে চলে যাবার চেষ্টা করল, তারাও নিহত হল পম্পের হাতে। একা ক্র্যাসাস-ই প্রায় ছয় হাজার স্বাধীন দাসকে বন্দী ক'রে রাস্তার ধারে ধারে ক্রসে ঝুলিয়ে মারলেন।

দাসের হয়ে মুক্তিযুদ্ধ স্পার্টাকাস করেন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে, তাই স্পার্টাকাস ইতিহাসে বিখ্যাত। তাঁর আদর্শ যুগে যুগে প্রেরণা দিয়েছে নিপীড়িত শ্রেণীকে

বিপ্লবের পথে নামতে, সশস্ত্র শত্রুকে সশস্ত্র উপায়ে মোকাবিলা করতে। স্পার্টা-কাস সফল হন নি, তিনি সেই প্রাচীন জগতে সমস্ত দাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন নি, তাদের যৌথ আক্রমণের অংশীদার করতে পারেন নি— সেকথা বড় নয়। কিন্তু দাস যে শাসকের অত্যাচার পশুর মতো সহ্য করতে সবসময়ে রাজি নয়, তার প্রমাণ দিয়েছিলেন স্পার্টাকাস।

২

নেদারল্যাণ্ড

পৃথিবীর প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব

শাসক ও শাসিতদের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক সম্বন্ধের জন্ম হয় দাসপ্রথার মধ্যেই। দাসপ্রথা চালু থাকায় ছোট ছোট জমির মালিক বড়ো বড়ো জমিতে চাষ করা শুরু করে, যেহেতু দাস সুলভ। রোমক সাম্রাজ্যের বাঁধন আলগা হওয়ার সঙ্গে, রাজনৈতিক শক্তি ক্রমশ দুর্বল হওয়ার সঙ্গে, রোমক সাম্রাজ্য পশ্চিমাঞ্চল আর পূর্বাঞ্চলে বিভক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাসপ্রথার পতন আরম্ভ হয়— উদ্ভব হয় সামন্ততন্ত্রের। এই দাসতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবিরাম জনবিক্ষোভ যেমন সমানে চলছিল, তেমনই সমানে তৈরি হয়ে উঠছিল সামন্ততান্ত্রিক সম্বন্ধ। এই যে মধ্যবর্তী সময়, এটাকে পরিচিত ইতিহাসে মধ্যযুগ বলে। ইয়োরোপে এর শুরু পঞ্চম শতাব্দীতে, শেষ একাদশ শতাব্দীতে। এশিয়ায় এর শুরু তৃতীয় শতাব্দীতে, শেষ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে। ভারতবর্ষে এই মধ্যযুগ হল চতুর্থ-পঞ্চম থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই মধ্যযুগের শেষদিকেই সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে। এই সময় নগরগুলো বিকাশ লাভ করতে থাকে, সেখানে বাণিজ্য শুরু হয়। কৃষি ও হস্তশিল্পে একটা বিভেদ গজিয়ে ওঠে। ইয়োরোপে সামন্ততন্ত্র ক্ষয়িষ্ণু চেহারার রূপ নিতে থাকে, জন্ম হতে থাকে ধনতন্ত্রের।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম বুর্জোয়া জাগরণ হল ধর্মসংস্কার আন্দোলনে এবং জার্মানির কৃষকযুদ্ধে। সেগুলো অবশ্য সার্থক হয় নি। প্রথম সার্থক বুর্জোয়া আন্দোলন হল নেদারল্যাণ্ডে, ১৫৬৬-১৬০৯ খ্রীস্টাব্দে। বাইরে থেকে মনে হবে, এটা স্পেনের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব ও রাজত্ব থেকে নেদারল্যাণ্ডের জাতীয় সংগ্রাম। এটা তা তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে এর আরো একটা পরিচয়, এটা বুর্জোয়া সংগ্রাম।

তখন উত্তর ফ্রান্স, লুক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম আর জার্মানির কিছু অংশে সতেরটি প্রদেশ নিয়ে ছিল নেদারল্যাণ্ড। অর্থনীতিতে বেশ সচ্ছল। গিল্ড-প্রথায় উৎপাদন-পদ্ধতি প্রায় লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরা যাক ইপ্রেস শহরটি,

যেখানে গিল্ড-প্রথায় পোষাক তৈরি হতো। ১৫১৭ থেকে ১৫৪৫-এর মধ্যে তাঁতের সংখ্যা এখানে ৬০০ থেকে ১০০-তে নেমে গেছে। পরিবর্তে শিল্পের নানা শাখার বিকাশ হচ্ছে। পোষাকের কেন্দ্রীভূত কারখানা হয়েছে ভ্যালেনসিয়েনস প্রভৃতি শহরে। সাবান তৈরির কারখানা হয়েছে অ্যাণ্টওয়ার্প শহরে। নামুর এবং লিয়েজ শহরে ধাতু তৈরির কারখানাও হয়েছে। জাহাজ তৈরি, মাছধরা, মাখন তৈরি, মদ তৈরি ইত্যাদি শিল্পও বিকাশ লাভ করেছে। দেশের ভিতরে বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। উত্তরে আমস্টার্ডাম, দক্ষিণে অ্যাণ্টওয়ার্পে ধনতান্ত্রিক বাজারও সুপ্রতিষ্ঠিত। অ্যাণ্টওয়ার্প তখন বাণিজ্য ও ধার দেওযার বিখ্যাত কেন্দ্র। অবশ্য এই বিকাশ অসমভাবে হচ্ছিল। উত্তরে এর বিকাশ যত প্রবল, দক্ষিণে তত নয়। নতুন বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক সংগঠন কেন্দ্রীভূত নয়। ধর্মের ক্ষেত্রেও এরা সঙ্ঘবদ্ধ নয়। এদের নতুন ধর্ম ক্যালভিনিজম বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রতিকূলই।

দক্ষিণে প্রবল সামন্ততন্ত্রীরা দেশের অভ্যন্তরে কোণঠাসা হযে বিদেশী সামন্ত-তন্ত্রীদের শরণাপন্ন হল নিজেদের স্বার্থরক্ষায। তখন স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ। তাঁর সহায় তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী আর ক্যাথলিক চার্চ। নেদারল্যাণ্ডে দ্বিতীয় ফিলিপের শাসন এবং ক্যাথলিক চার্চ, দুটিই নেদারল্যাণ্ডের লোকের কাছে বিরক্তিকর। ১৫৬৬ সাল নাগাদ নেদারল্যাণ্ডের জনসাধারণ এই দুয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। আশ্চর্যের বিষয়, অনেক অভিজাত ব্যক্তিও এই বিদ্রোহে জনসাধারণের পক্ষে অংশ নিল। এদের রাজনৈতিক সংস্থা, ইউট্রেক্ট ইউনিয়ন। ১৫৮১ সালে উওরাঞ্চলের প্রতিনিধিরা হেগ শহরে সমবেত হয়ে দ্বিতীয় ফিলিপকে সিংহাসনচ্যুত বলে ঘোষণা করল। নতুন রাষ্ট্রের নাম হল হল্যাণ্ড, অর্থাৎ যুক্তরাজ্য। এর সফল প্রতিষ্ঠা হয় ১৬০৯ খ্রীস্টাব্দে। এটাকেই বলা হয় পৃথিবীর প্রথম বুর্জোয়া রাষ্ট্র, প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লবের সার্থক পরিণতি। এই সংগ্রামে মুখ্য অংশ নিয়েছিল জনসাধারণ। তবে বুর্জোয়াদের স্বার্থেই এটা ঘটেছিল।

অবশ্য ইয়োরোপের ইতিহাসে হল্যাণ্ডের বিপ্লব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয় নি। সেই মহাদেশের অন্যান্য দেশে তখনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বেশ ভালোই চলছে। ১৬৪০ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে আর ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সে যখন বিপ্লব ঘটল, তখন ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের বুর্জোয়ারা প্রবল হয়ে উঠেছে, তাই ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বুর্জোয়া বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসের মোড় পালটে দেয়।

৩
ইংল্যাণ্ড

রাজা শাসন করে ঈশ্বরের আদেশে ?

বলা হয়ে থাকে ষোড়শ শতাব্দীতে জন্ম হয়েছিল আধুনিক ইংরেজের। সমুদ্রযাত্রায়, সাহিত্যে, বাণিজ্যে মধ্যবিত্ত ইংরেজ প্রতিষ্ঠালাভ শুরু করে এই শতাব্দীতে। রিফর্মেশান আর রেনেশাঁসের কল্যাণে জন্ম হয় বুদ্ধিশীলতা, ধর্মের কুসংস্কার ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে প্রসারলাভ করতে থাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। পার্লামেণ্টের জন্ম আগেই হয়েছিল। এর প্রধান অংশে, হাউস অফ কমনসে, আধিপত্য লাভ করতে থাকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

এলিজাবেথের রাজত্বকালে বিদেশীদের আক্রমণের ভয় থেকে ইংল্যাণ্ড মুক্ত হয়, আর্মাডার ধ্বংস হয়, রাষ্ট্রদ্রোহিতার আতঙ্ক দূর হয়, ধনৈশ্বর্য বাড়তে থাকে। এর ফলে জন্ম হয় দুটি বিপরীত স্রোতের। রাজারা আরো বেশি দাপট দেখাতে শুরু করে, এবং মধ্যবিত্তরা আপন প্রভাব বিস্তারে উঠে পড়ে লাগে। যার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হয়ে ওঠে রাজা বনাম পার্লামেণ্টের যুদ্ধের, সামন্ততন্ত্র বনাম বুর্জোয়াতন্ত্রের বিরোধের সময়। যার ফল ১৬৪০-৪৯ সালের ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধ, যার ফল রাজার মুণ্ডচ্ছেদ এবং ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লবের সাফল্য। ঘটনাগুলো একটু বিস্তারিতভাবে দেখা যাক।

এলিজাবেথের পর ইংল্যাণ্ডে পত্তন হয় স্টুয়ার্ট যুগের। এই বংশের দুই রাজা প্রথম জেমস ও প্রথম চার্লস— দুজনেরই বদ্ধমূল ধারণা ছিল, রাজা হল দৈবপ্রেরিত। রাজা রাজত্ব করে ঈশ্বরের আদেশে, দেশের লোকের কথা শোনার কোনো প্রয়োজন তার নেই। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে পার্লামেণ্ট আছে, সেখানে জনসাধারণের প্রেরিত প্রতিনিধিরা আছে, তাদের একটা বক্তব্য আছে। রাজার পক্ষে আছে সামন্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিরা, গির্জার পাদ্রিরা। যেন রাজার কথাই, রাজার ইচ্ছাই আসল ; পার্লামেণ্ট একটা উৎপাত মাত্র। অথচ আইন করতে গেলে পার্লামেণ্ট ডাকতে হয়, কর বসাতে গেলে পার্লামেণ্টের সম্মতি নিতে হয়।

এলিজাবেথ এর একটা ভালো সমাধান করেছিলেন। তিনি তাঁর শাসনকালে, পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে, মাত্র এগারো বার পার্লামেণ্ট ডেকেছিলেন। তা-ও কর বসানোর ব্যাপারে আর ধর্ম নিয়ে এত বেশি বচসা হতো যে তিনি পার্লামেণ্ট ছাড়াই কাজকর্ম চালাতেন। মধ্যবিত্ত ইংরেজ এটা মেনে নিয়েছিল। যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে ইংল্যাণ্ড তখন বিপর্যস্ত এবং ভাঙনের মুখোমুখি। কিন্তু সংকট তীব্র হয়ে উঠল স্টুয়ার্ট যুগে। তার নানা কারণ।

আমেরিকা থেকে তখন ইংরেজ বণিকেরা রাশিরাশি রুপো নিয়ে আসছে ইংল্যাণ্ডের বাজারে। ফলে ইংল্যাণ্ডের জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু রাজার আয় বাড়ছে না, কারণ, কী কী খাতে তার আয় হবে সেটা তো বাঁধাধরা। জমি থেকে খাজনা রাজার প্রাপ্য, কিন্তু পার্লামেণ্ট তাতে সম্মতি না দিলে খাজনা বাড়ানো বা নতুন খাজনা বসানো যাবে না। অতএব স্টুয়ার্ট রাজারা বাধ্য পার্লামেণ্ট ডাকতে। অথচ পার্লামেণ্ট ডাকলেই পার্লামেণ্ট দাবি করবে কর্তৃত্বের অংশ নিতে। তাই পার্লামেণ্ট না ডেকেই রাজা টাকা তুলতে গেল ; পার্লামেণ্ট ঘোরতর আপত্তি তুলল। যারা বেশি সরবে আপত্তি তুলল, রাজা তাদের জেলে পাঠাল।

এর সঙ্গে যুক্ত হল ধর্ম নিয়ে মারামারি। এলিজাবেথের মতো স্টুয়ার্ট রাজাও অ্যাঙলিকান চার্চের অনুরাগী, যে চার্চ ক্যাথলিক আর প্রোটেস্টাণ্টদের মাঝামাঝি। পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যই কিন্তু ঘোরতর প্রোটেস্টাণ্ট, তাদের চোখে অ্যাঙলিকান চার্চ প্রায় ক্যাথলিকদের কাছাকাছি। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোর বিরোধ। মধ্যবিত্তরা প্রোটেস্টাণ্ট, তারা পোপকে ঘৃণা করে, পোষাক-পরিচ্ছদে আচার-আচরণে অ্যাঙলিকান বা ক্যাথলিকদের চাইতে অনেক নিষ্ঠাবান।

আরো আছে। রাজা, তার অনুচর ও দরবারের লোকেরা ঐশ্বর্যে বিলাসিতায় লাম্পট্যে অত্যন্ত কুখ্যাতি অর্জন করেছে। নিষ্ঠাবান মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই জীবনকে ঘৃণা করে। তাদেরই পরিশ্রমের ফল রাজা এবং তার অনুচরেরা ভোগ করবে, একথা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় স্বীকার ক'রে নিতে আর রাজি ছিল না।

এইসব বিরোধ অবশ্য কাটিয়ে ওঠা যেত, যদি এলিজাবেথের মতো স্টুয়ার্ট রাজা দু-জনও কৌশলে ও তৎপরতার সঙ্গে রাজত্ব চালাতে পারতেন। কিন্তু প্রথম জেমস ছিলেন, তখনকার ইয়োরোপের আর এক রাজার কথায়, ইয়োরোপের

সবচাইতে পণ্ডিত মূর্খ। আর প্রথম চার্লস ছিলেন অস্থিরমস্তিক, মুখে-এক কাজে-আর জাতীয় রাজা। তাঁদের কৌশলের অভাব সবচেয়ে বেশি উৎকট হয়ে দেখা দিল পররাষ্ট্র নীতিতে। প্রথম জেমস চাইতেন স্কটল্যাণ্ড আর স্পেনের সঙ্গে সম্প্রীতি এবং মিলন। স্কটল্যাণ্ডের এবং স্পেনের জন্মশত্রু ইংল্যাণ্ডের সাধারণ লোকের চোখে এটা অত্যন্ত বিসদৃশ ব্যাপার। ইংল্যাণ্ডের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের তখন স্বপ্ন যে-স্পেনকে করতলগত ক'রে তাকে শোষণ করা, সেই স্পেনের সঙ্গে জেমসের সৌহার্দমূলক আচরণ তাকে রুষ্ট ক'রে তুলল। জেমসের ভুল চার্লসও জিইয়ে রাখলেন। মুখে তিনি বলেন, ইংল্যাণ্ডের ক্যাথলিকদের তিনি কোনো সুবিধা দেবেন না, অথচ বিয়ে করলেন এক ক্যাথলিক রাজপরিবারের মেয়েকে। স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য পার্লামেণ্ট তাঁকে টাকা দিল, অথচ তিনি যুদ্ধের কোনো তোড়জোড়ই করেন না।

প্রথম চার বছর চার্লস তিনবার পার্লামেণ্ট ডেকেছিলেন। কিন্তু রাজার ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাসী চার্লসের সঙ্গে মানুষের প্রতিনিধি পার্লামেণ্টের কোনো বনিবনা হওয়ার কথা নয়। অতএব পরের এগারো বছর চার্লস পার্লামেণ্ট ডাকার কোনো লক্ষণই দেখালেন না।

এই এগারো বছর চার্লস টাকা তোলার জন্য নানা ধরনের পুরনো আইন চালু করলেন, যে আইন ভাঙলেই অর্থদণ্ড দিতে হবে। মদের কারবার, লবণ, সাবান ইত্যাদির ব্যবসা করার অধিকার দিলেন নানা কোম্পানিকে। বিনিময়ে নিলেন মোটা টাকা। জনসাধারণের সব চাইতে ক্রোধের কারণ হয়ে উঠল তাঁর জাহাজ-টাকা তোলার চেষ্টা। দেশরক্ষা করার জন্য সমুদ্রতীরবর্তী শহরের অধিবাসীদের কর দিতে হতো জাহাজ বানানোর জন্য। সে সময় জাহাজ বানানো বন্ধ, তবু চার্লস আদেশ দিলেন রণতরী রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও কর দিতে হবে। শুধু সমুদ্র-তীরবর্তী শহরগুলিই নয়, চার্লস এই টাকা আদায় করতে লাগলেন সমুদ্র থেকে বহু দূরের শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকেও। বিদ্রোহী হয়ে উঠল লোকেরা। তাদের হয়ে মামলা আনলেন জন হ্যাম্পডেন। মামলা অবশ্য টিঁকল না, রাজার বশংবদ বিচারকেরা রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতার তত্ত্ব স্বীকার ক'রে নিয়ে রাজার নতুন করের আদায়ক্ষমতা স্বীকার ক'রে নিয়েছিল।

কিন্তু এগারো বছর পর চার্লস পার্লামেণ্ট ডাকতে বাধ্য হলেন, টাকা তোলার জন্য। কারণ স্কটল্যাণ্ডের জনসাধারণ তখন চার্লসের ধর্মব্যাপারে নাক গলানোতে রুষ্ট। শুধু রুষ্ট তাই নয়, রীতিমতো বিদ্রোহী। সুতরাং যুদ্ধ চালাতে হবে, অতএব

চাই সৈন্যবাহিনী। তখনো কিন্তু ইংল্যাণ্ডে স্থায়ী সৈন্যবাহিনী বলে কিছু ছিল না। রাজাকে নির্ভর করতে হতো সামন্তদের উপর, তাদের সৈন্যদের উপর। চার্লস ঠিক করলেন স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গড়তে হবে। দরকার টাকার। ডাক পড়ল পার্লামেণ্টের। পার্লামেণ্ট বুঝতে পারল, এইবার রাজাকে থামানো দরকার। পার্লামেণ্টের এক নেতা, জন পীম, দাবি করলেন, রাজা এবং তাঁর সামন্তদের স্বৈরাচার বন্ধ করতে হবে। আর্চবিশপ লড, যিনি রাজার অতি বিশ্বাস-ভাজন, যিনি প্রায়-ক্যাথলিক, যাঁর শাসনে হাজারে হাজারে প্রোটেস্টাণ্ট প্রোটে-স্টাণ্টদেরই দেশ ইংল্যাণ্ড ছেড়ে আমেরিকায় পালিয়েছে, সেই লডের অপসারণ দাবি করল পার্লামেণ্ট। আরো দাবি, জাহাজ-কর নেওয়া বন্ধ করতে হবে, ইচ্ছেমতো পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়া চলবে না, তিন বছর পর-পর পার্লামেণ্ট ডাকতে রাজা বাধ্য থাকবেন।

এতটা চার্লসের সহ্য হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া নতুন বিক্রমে স্কটল্যাণ্ড দমন করার পর তাঁর সাহসও বেড়েছে। উপরন্তু তিনি লক্ষ করেছেন কয়েকটি ব্যাপারে পার্লামেণ্টও একমত নয়। তিনি সশরীরে পার্লামেণ্টে ঢুকে তার নেতাদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করলেন। এই নেতাদের মধ্যে ছিলেন হ্যাম্পডেন আর পীম। চার্লস তাঁর চারশো সৈন্য নিয়ে ঢোকার আগেই অবশ্য পীম আর হ্যাম্পডেন সরে পড়েছেন, কিন্তু চার্লসের এই অবিমৃষ্যকারী আচরণের পর শুরু হল ইংল্যাণ্ডে সাতবছর ব্যাপী গৃহযুদ্ধ।

এই গৃহযুদ্ধে একদিকে রাজা, অভিজাত সম্প্রদায়, জমিদার। অপরদিকে শহরের গ্রামের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। রাজা বনাম পার্লামেণ্ট— অ্যাঙলিকান চার্চ বনাম প্রোটেস্টাণ্ট চার্চ।

এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, যাদের নিয়ে গড়ে উঠছে বুর্জোয়া শ্রেণী, তাদের হাতে লণ্ডন শহর। ইংল্যাণ্ডের দুই-তৃতীয়াংশ লোকের সহানুভূতি এদের দিকে, দেশের সম্পত্তির তিন-চতুর্থাংশও এদের হাতে, যদিও সৈন্যসামন্ত নেই, রণতরী নেই। শুধু পদাতিক সৈন্য তাদের হাতে, কিন্তু তখনো বেয়নেট চালু হয় নি। রাজার হাতে বেশির ভাগ ঘোড়া আর অশ্বারোহী। আর রাজার সবচেয়ে বড়ো সহায় রাজার ভাইপো রাজপুত্র রুপার্টের মতো অশ্বারোহী নেতা।

গৃহযুদ্ধের প্রথম বছরই চার্লস চেষ্টা করলেন লণ্ডন অধিকার করতে। অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তিনি প্রায় লণ্ডন পৌঁছিয়েও ছিলেন, কিন্তু লণ্ডনের প্রত্যন্তে ২৪০০ সাধারণ নাগরিকের জীবন পণ ক'রে রুখে দাঁড়ানোতে চার্লস ঢুকতে সাহস

পেলেন না। পরের বছর আবার তিনি চেষ্টা করলেন। লণ্ডন শহর প্রায় যায় যায়, যুদ্ধে হাম্পডেন নিহত হলেন, কিন্তু বছরের শেষের দিকে যুদ্ধের চাকা ঘুরতে শুরু করল। পার্লামেণ্টের পক্ষে নতুন বীর হয়ে দেখা দিলেন অলিভার ক্রমওয়েল। লণ্ডন যখন পড়ে পড়ে, তখন পীম চেষ্টা করলেন প্রোটেস্টাণ্ট স্কটল্যাণ্ডের সাহায্য নিতে। পীমও যুদ্ধে নিহত হলেন, তবে স্কটল্যাণ্ড ২০০০০ সৈন্য পাঠিয়ে দিল পার্লামেণ্টের সাহায্যে। পরের বছর মার্স্টন মুরের যুদ্ধে রাজার বিরাট পরাজয় ঘটল। এই যুদ্ধে রাজার পক্ষে লড়ল সতেরো হাজার, পার্লামেণ্টের পক্ষে ছাব্বিশ হাজার সৈন্য— রাজপুত্র রুপার্ট বনাম সাধারণ নাগরিক অলিভার ক্রমওয়েল।

অবশ্য যুদ্ধের এখানেই শেষ নয়। কখনো রাজা জেতে, কখনো পার্লামেণ্ট। এই সময় পার্লামেণ্ট তৈরি করল তার বিখ্যাত নিউ মডেল সৈন্য। নিয়মিত বেতন, যথেষ্ট ঘোড়া, প্রচুর পদাতিক, দায়িত্বশীল অফিসার। ১৬৪৫ সালের নেসবি যুদ্ধে নিউ মডেল আর্মির কার্যকারিতার পরিচয় পাওয়া গেল। ক্রমওয়েলের হাতে রুপার্টের অর্ধেক সৈন্য ও অস্ত্র ধ্বংস হল। পরের বছর চার্লস আত্মসমর্পণ করলেন।

গৃহযুদ্ধের একদিক সমাপ্ত হল, কিন্তু এখন প্রশ্ন কে রাজ্যশাসন করবে। চার্লস পরাজিত, তাই বলে রাতারাতি সব ইংরেজই সামন্ততন্ত্র-বিরোধী হয়ে উঠল বা অ্যাংলিকান চার্চ ধ্বংস করতে চাইল তা নয়। তাছাড়া নিউ মডেল সৈন্য যে রাজ্যশাসন করবে এটাও সবার মনঃপূত নয়। আর স্কটল্যাণ্ডের চার্চের, প্রেস-বাইটারিয়ান চার্চের, আধিপত্যও সকলের কাম্য নয়। পার্লামেণ্ট নানাভাগে ভাগ হয়ে গেল, প্রকাশ্যে না হলেও। এদের মধ্যে এগিয়ে এল চরমপন্থীরা। এর মধ্যে ছিল তারা যারা ভোটাধিকার সর্বব্যাপী করতে চাইল, চাইল পার্লামেণ্ট প্রত্যেক বছর বসুক। এল লেভেলার দল, যারা বলল সব মানুষ সমান। এল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দল, যারা বলল স্বাধীনভাবে ধর্ম অনুসরণ করতে দিতে হবে। এল নিউ মডেল সৈন্যদল, যার নেতা ক্রমওয়েল, যাঁর প্রভাবে আছে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার শিক্ষিত সৈন্য।

নিউ মডেল সৈন্যের সহায়তায় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলই জয়ী হল। তাদের নির্দেশে ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে চার্লসের মুণ্ডচ্ছেদ করা হল। ইংল্যাণ্ড 'কমনওয়েলথ' বলে ঘোষিত হল, যেখানে রাজাও থাকবে না, হাউস অব লর্ডসও থাকবে না।

এই বুর্জোয়া বিপ্লবের নায়ক ছিল ইংল্যাণ্ডের ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, তার নেতা পীম, হাম্পডেন, ক্রমওয়েল আর লেভেলার দলের লিলবার্ন। এই সম্প্রদায় একনিষ্ঠ, আড়ম্বরহীন, রাজা এবং চার্চের একাধিপত্যের ঘোরতর বিরুদ্ধে। এরা

মনে করত রাজা রাজ্যশাসন করে ঈশ্বরের আদেশে নয়, পার্লামেণ্টের সম্মতি নিয়ে। পার্লামেণ্ট হচ্ছে জনপ্রতিনিধি। অবশ্য সেইসময় সাধারণ মানুষ বলতে তারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেই বুঝত। শ্রমিক শ্রেণী তখনো ভালো ক'রে তৈরি হয় নি, সেটা হতে হতে ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লব ঘটে যাবে। কৃষক শ্রেণীও তখনো সঙ্ঘবদ্ধ নয়। এই বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় কৃষকরা আনুগত্য প্রকাশ করেছিল— রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে, রাজদরবারে ব্যভিচারের বিরুদ্ধে— মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে। এই বিপ্লবের ফলে অনেক সামন্ত তাদের জমি হারাল, সেটা পেল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা। এই বিপ্লবের সময় ইংল্যাণ্ডের বুদ্ধিজীবীরাও বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থনে এগিয়ে আসে। তখনকার দিনে সাহিত্যে রাজনীতি আর ধর্ম নিয়ে মাতামাতি প্রকট হয়ে উঠেছিল। খবরের কাগজের যুগ সেটা নয়, পরিবর্তে বেরুত রাশিরাশি প্যামফ্লেট। জেমসকে বারবার আদেশ দিতে হয়েছে রাজদ্রোহী প্যামফ্লেট পুড়িয়ে ফেলার জন্য। বুদ্ধিজীবী ও কৃষকদের সহায়তায় নবজাগ্রত বুর্জোয়া সম্প্রদায় পার্লামেণ্টের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ক'রে রাজা এবং সামন্তদের প্রভাব খর্ব ক'রে ইংল্যাণ্ডের প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব সমাধা করল।

৪
আমেরিকা

মত না নিয়ে কর বসানো অত্যাচার

ইংল্যাণ্ডে ১৬৪০-৪৯ সালে প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটে। এই বিপ্লবের ফলে পার্লামেণ্টের শক্তি বাড়ে, রাজার শক্তি খর্ব হয়। ১৬৮৮ সালে আবার ঘটে বিপ্লব, বুর্জোয়া পার্লামেণ্টের শক্তি আরো বাড়ে, রাজার ক্ষমতা আরো খর্ব হয়। তবে রাজা তখনো আছে, সাংবিধানিক রাজা হয়েও। আমেরিকা তার বিপ্লবের পর (১৭৭৫-৮৩) রাজা ব্যাপারটা তুলে দিয়ে, পার্লামেণ্টের হাতে তুলে দিল সব ক্ষমতা। আর পার্লামেণ্ট হল জনসাধারণের নির্বাচিত। অতএব বলা চলতে পারে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ, যেখানে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল— হল জনসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা,জাতীয় স্ব-শাসন আদর্শের প্রথম স্বীকৃতি। অতীতের রাজার শাসন অবলুপ্ত হল, রাজতন্ত্রের ধ্বংস হল, খেতাবওয়ালা অভিজাতদের প্রতিপত্তি বিনষ্ট হল। অন্ধকার মোহাচ্ছন্ন মধ্যযুগ থেকে হল যুক্তিবাদী বর্তমান যুগের সূচনা। ফরাসি দার্শনিক রুশোর কল্পনা, যেখানে মানুষ মানুষ হয়ে বাঁচবে, মানুষ মানুষকে অত্যাচার করবে না, সব মানুষই সমান, সেই কল্পনার বাস্তব রূপায়ণ ঘটল।

বলা বাহুল্য, আমেরিকার এই স্বাধীনতযুদ্ধে উদ্দীপ্ত হয়েছিল তখনকার অনেক বুদ্ধিজীবী। অভিজাত ফরাসি নেতা লাফায়েত লাফিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন আমেরিকার যোদ্ধাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইংল্যাণ্ডের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। ইংল্যাণ্ডে পার্লামেণ্টের শাসন, কিন্তু সেখানে পার্লামেণ্ট ধনী বুর্জোয়ার হাতের ক্রীড়নক। তাই ইংল্যাণ্ডের চিন্তাশীল নেতা এডমাণ্ড বার্ক, টমাস পেনও স্বাগত জানিয়েছিলেন এই স্বাধীনতাযুদ্ধকে। অবশ্য কালক্রমে এই আমেরিকাও বুর্জোয়াদের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল। এই বিপ্লবের নেতা ছিল আমেরিকার নবজাগ্রত বুর্জোয়ারা, যারা ইংল্যাণ্ডের প্রবলতর বুর্জোয়াদের কুক্ষিগত থাকতে অস্বীকার করল। তবে আমেরিকার বিপ্লব এই অর্থে বিশিষ্ট, ঔপনিবেশিক

সত্তা ঘুচিয়ে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ ক'রে তারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করল।

আমেরিকায় ইংল্যাণ্ড উপনিবেশ স্থাপন করার পর এর পূর্ব উপকূলে তেরটি প্রদেশে প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক বসতি স্থাপন করেছিল। সাত-বছরের-যুদ্ধ থামলে, ক্যানাডা ইংল্যাণ্ডের হাতে পরাস্ত হলে, ক্যানাডার ফরাসিদের হাত থেকে যেহেতু এই উপনিবেশের কুড়ি লক্ষ লোক নিস্তার পেল, সুতরাং ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে দাবি উঠল, যুদ্ধের খরচ কিছুটা উপনিবেশ দিতে বাধ্য। খরচ তোলা হবে করের মারফত। উপনিবেশগুলো কিন্তু দাবি করল, যেহেতু ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে উপনিবেশের কোনো প্রতিনিধি নেই, সুতরাং উপনিবেশের সম্মতি ছাড়া নতুন কোনো কর বসানো চলবে না। ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লবের পর, সংসদে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত— অতএব উপনিবেশের এই দাবি এমন কিছু বিপ্লবাত্মক বলে মনে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে সেখানকার শাসকদের মনে এমন কোনো ভাববিকার ঘটে নি যে সেই বিপ্লবের বাণী উপনিবেশেও বহন ক'রে নিয়ে যেতে হবে। ইংল্যাণ্ডের শাসকরা উপনিবেশের এই স্বাধিকার দাবি বিদ্রোহ বলে বিবেচনা করল।

আমেরিকার উপনিবেশে তখন খাঁটি বুর্জোয়ারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ইংল্যাণ্ডে তখনো অভিজাত শ্রেণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নি— কিন্তু দোকানদার, স্বাধীনচেতা বড়ো বড়ো কৃষক, প্ল্যানটেশনের মালিক ইত্যাদিরাই প্রবল। উপনিবেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবশ্য নিগ্রো দাসদের খাটিয়ে সামন্তপ্রথায় চাষ চলে, তবে সেই সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক সাদা আর নিগ্রোদের মধ্যেই, সাদাতে সাদাতে নয়। আমেরিকার তখন সবে জন্ম, বিরাট চাষের জায়গা অনাবাদী হয়ে পড়ে আছে, সুতরাং নতুন নতুন যারা এসে বসতি স্থাপন করছে তারা সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বস্তু না হয়ে স্বাধীনভাবে জমিজমার মালিক হয়ে চাষবাস করছে, বুর্জোয়া পদ্ধতিতেই। আপন সাহসে, আপন শক্তিতে এরা বসতি স্থাপন করছে, সামাজিকভাবে কাউকে প্রভু ভাবতে এরা অস্বীকার করে। এদের স্বাধীন সত্তায় বাধানিষেধই এদের ক্রোধের কারণ। তাই ইংল্যাণ্ডের শাসকদের হুকুম এরা বরদাস্ত করতে রাজি নয়। ধর্মীয় কারণেও এদের কাছে অ্যাঙলিকান ইংরেজদের আধিপত্য অসন্তোষের কারণ। প্রোটেস্টাণ্ট আমেরিকানদের কাছে তাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরূপতার সঙ্গে ধর্মীয় বিরূপতাও যুক্ত হল। আর বিদ্রোহ করলে তেমন ভয়েরও কারণ নেই— ইংল্যাণ্ড আমেরিকা থেকে এত দূরে, মধ্যে

এমনই এক দুস্তর সমুদ্র, যে ইংল্যাণ্ডের সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে উপনিবেশ ধ্বংস ক'রে দেবে তেমন কোনো প্রবল আশঙ্কা নেই।

উপনিবেশের বুর্জোয়া শ্রেণী, যাদের ব্যবসা-অন্ত প্রাণ, তাদের কাছে ব্যবসায়িক বিধিনিষেধ সবচাইতে ক্রোধের কারণ হবে বোঝাই যায়। আইনকানুন অবশ্য বরাবরই ছিল। আইন ছিল আমেরিকায় এমন কোনো পণ্য উৎপাদন করা চলবে না যাতে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। ইংল্যাণ্ডের যে পণ্যের দরকার উপনিবেশগুলো শুধু তাই উৎপাদন করবে। অবশ্য আমেরিকার প্রজারাও ইংরেজ, ইংল্যাণ্ডের শাসকরাও ইংরেজ— একই দেশে এদের জন্ম। আর তাছাড়া আমেরিকা শত হলেও ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশ। সুতরাং এই সমস্ত উৎপাদনের বিধিনিষেধ, ইংল্যাণ্ডের সরকার, সৈন্যবাহিনী আর নৌবাহিনীর খরচ জোটানোর ব্যাপার আগে তেমন গায়ে লাগে নি। তাছাড়া ফরাসিদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড যুদ্ধ করেছে উপনিবেশ বাঁচানোর জন্য, সুতরাং ইংল্যাণ্ডের স্বার্থ এদের কিছু দেখতেই হয়। আর ইংল্যাণ্ডও কড়াকড়িভাবে এইসব আইনকানুন চালানোর চেষ্টা করে নি। অতএব আইনকানুন আছে, ইংল্যাণ্ড আছে, আবার আমেরিকাও আছে— এইভাবে ব্যাপারটা চলছিল।

গণ্ডগোল বাধল যখন সাত-বছরের-যুদ্ধের পর ইংল্যাণ্ড কড়া হওয়ার চেষ্টা করল। পার্লামেণ্ট বলল উপনিবেশ রক্ষার জন্য প্রত্যেক বছর যে খরচ হয় তার অর্ধেক দিতে হবে উপনিবেশকে। এই খরচ তুলতে হবে চিনির উপর আর স্ট্যাম্পের উপর কর বসিয়ে। চিনির উপর কর আগেও ছিল, তবে কে দিত আর কে দিত না তার কোনো তোয়াক্কা কেউ রাখত না। আর স্ট্যাম্প কেনা বাধ্যতামূলক হলে খরচ বেড়ে যায় ব্যবসায়ীদের, খবরের কাগজওয়ালাদের, উকিলদের। অর্থাৎ আঁতে ঘা লাগল সচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। উপনিবেশ থেকে সর্বত্র স্লোগান উঠল : প্রতিনিধিত্বের দাবি স্বীকার না ক'রে কর বসানো বিষম অত্যাচার। সাধারণ লোকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হল, স্ট্যাম্প-কালেক্টরদের মূর্তি বানিয়ে পোড়ান শুরু হল, রাস্তায় জনতা হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হল, ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করার আন্দোলন আরম্ভ হল। নয়টি উপনিবেশ থেকে প্রতিনিধিরা একটা কংগ্রেসে মিলিত হয়ে স্ট্যাম্প অ্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করল। ভয় পেয়ে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট স্ট্যাম্প অ্যাক্ট উঠিয়ে নিল।

এটা ঘটে ১৭৬৬ সালে। কিন্তু পরের বছর টাউনসেণ্ড নামে এক উগ্রচেতা চ্যান্সেলার ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে কয়েকটি অ্যাক্ট পাশ করালেন। তাঁর বক্তব্য

শুধু উপনিবেশ রক্ষার জন্যই নয়, বিভিন্ন উপনিবেশের গভর্নর, বিচারক, অফিসারদের মাইনের খরচও উপনিবেশগুলোকে দিতে হবে। ফলে কাঁচ, সীসা, রঙ, কাগজ আর চায়ের উপর শুল্ক বসল।

এর প্রতিবাদে আমেরিকার ব্যবসায়ীরা ব্রিটিশ পণ্যবর্জনের আন্দোলন তীব্রতর ক'রে তুলল। একবছরের মধ্যে ব্রিটিশ পণ্যের বিক্রয় প্রায় এক কোটি টাকার মতো কমে গেল। শুল্ক অফিসারেরাও শুল্ক আদায় করতে তেমন ব্যগ্র বা সাহসী হল না, আদায় ভীষণ কমে গেল। ইংল্যাণ্ডের শাসকবর্গ ক্ষেপে গেল, সৈন্যবাহিনী পাঠালো বোস্টন শহরে ব্যবসায়ীদের ভয় দেখাতে। ১৭৭০ সালে ঘটল বোস্টন হত্যালীলা— রাস্তায় রক্তপাত ঘটল প্রথম।

পার্লামেণ্টে মন্ত্রীবদল হল। নতুন প্রধানমন্ত্রী টাউনসেণ্ড-প্রবর্তিত শুল্ক বরবাদ ক'রে দিলেন, তবে চায়ের উপর শুল্কটা বজায় রেখে। উদ্দেশ্য একথা বোঝানো যে উপনিবেশের দাবি— 'প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর বসানো যাবে না'— স্বীকার করা হচ্ছে না। চায়ের উপর শুল্কের প্রতিবাদে বোস্টনের কয়েকজন অধিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশ ধরে একটা ব্রিটিশ চায়ের জাহাজে উঠে ৩৪২টা চায়ের বস্তা উপুড় ক'রে ফেলে দিল ডকের উপর। বোস্টনের এই অভাবিত 'টী-পার্টি'র পর পার্লামেণ্ট প্রচণ্ড কড়া হয়ে উঠল। বোস্টন বন্দর বন্ধ ক'রে দেওয়া হল, ম্যাসাচুসেট্‌স সরকারের হাত থেকে স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল, যেসব অফিসারের কর্তব্যচ্যুতি ঘটেছে বলে মনে হল তাদের বিচারের ব্যবস্থা হল, উপনিবেশে সৈন্য প্রহরা বসানো হল এবং ম্যাসাচুসেটস, কানেটিকট আর ভার্জিনিয়া উপনিবেশের সীমা সংকীর্ণ ক'রে দেওয়া হল। ক্ষেপে গিয়ে ইংল্যাণ্ডের অ্যাঙলিকান শাসকেরা এমনই বেসামাল যে ক্যানাডার কুইবেকের ক্যাথলিক-দের পর্যন্ত তারা অনেক সুবিধাদান ক'রে ফেলল— উদ্দেশ্য, যাতে এই ক্যাথলিক কুইবেক উপনিবেশের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে, যদিও নিজের ঘরে শাসকেরা ঘোর ক্যাথলিকবিরোধী।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরু হল ১৭৭৪ সালে। জর্জিয়া বাদে আর সব উপনিবেশ থেকে প্রতিনিধিরা একটি কণ্টিনেণ্টাল কংগ্রেসে মিলিত হয়ে তাদের দাবিদাওয়া পেশ ক'রে ইংল্যাণ্ডের রাজার কাছে আবেদনপত্র পাঠালো। তখনো কিন্তু এরা ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের কথা ভাবছে না, ভাবছে শুধু নিজেদের স্বার্থ, দাবিদাওয়া কীভাবে অক্ষুণ্ণ রেখে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সদ্ভাব রাখা যায়।

ইংল্যাণ্ডের অনেক প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা, উইলিয়াম পিট, এডমাণ্ড

বার্ক প্রমুখ, উপনিবেশের সাথে বোঝাপড়া ক'রে সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষপাতী। কিন্তু অন্যান্য সদস্যরা এতে কান দিল না।

ইতিমধ্যে উপনিবেশের লোকেরা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদল রাজভক্ত, তাদের ইচ্ছা উপনিবেশ শাসন যেমন চলছিল তেমনি চলুক। অপর দল দেশ-প্রেমিক, তারা উপনিবেশের স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজি নয়। এই দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে রাজভক্তদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামও ঘটল ম্যাসাচুসেট্‌সে ১৭৭৫ সালে। দ্বিতীয় কন্টিনেণ্টাল কংগ্রেস ডাকা হল, দেশপ্রেমিকদের মধ্যে থেকে সৈন্যবাহিনী গঠন ক'রে তার নেতৃত্ব দেওয়া হল জর্জ ওয়াশিংটনের উপর।

এই দেশপ্রেমিকেরা ক্রমশ কলোনির সংসদ আর কন্টিনেণ্টাল কংগ্রেসে আধিপত্য বিস্তার করে। তারা উপনিবেশের সর্বত্র উদ্দীপনাময় প্যামফ্লেট বিতরণ করা শুরু করে। বিদগ্ধ রাজনীতিবিদ্ টমাস পেন লিখলেন তাঁর বিখ্যাত 'কাণ্ডজ্ঞান' প্যামফ্লেট। তিনি বললেন, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার সময় হয়েছে। রাজার কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই, রাজারা আসলে মুকুটধারী বদমাইস। যদি তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহলে তারা হয় অত্যাচারী। আর ইংল্যাণ্ডের মতো যেখানে রাজার হাতে বিশেষ ক্ষমতা নেই, সাংবিধানিক রাজা, সেখানে রাজাকে রাখা নিরর্থক। টমাস পেন যখন এই উত্তেজনাপূর্ণ দর্শন প্রচার করছেন, জর্জ ওয়াশিংটন তখন ব্যস্ত সৈন্যবাহিনী গঠন ক'রে সশস্ত্র আন্দোলনে নামতে। কর না দেওয়ার আন্দোলন পর্যবসিত হয়েছে স্বাধীনতার সংগ্রামে।

১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই কন্টিনেণ্টাল কংগ্রেস স্বাধীনতা ঘোষণা করল। এই সনদ প্রস্তুত করলেন টমাস জেফারসন। তিনি বললেন, ইংরেজদের মতো সকল মানুষের অধিকার আছে জীবনের, স্বাধীনতার, শান্তির। সরকারের সমস্ত ক্ষমতার উৎস সাধারণ দেশবাসী। প্রয়োজন হলে, সশস্ত্র উপায়ে সাধারণ মানুষের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিপ্লবের অধিকার সমস্ত মানুষের। সুতরাং, আমেরিকার উপনিবেশের অধিকার আছে বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের।

স্বাধীনতার সনদ ঘোষণার পর উপনিবেশের সর্বত্র সাড়া পড়ে গেল। নিউ ইয়র্ক শহরে রাজা তৃতীয় জর্জের সীসার মূর্তি ভেঙে বুলেট তৈরি করল সাধারণ লোক। রাজভক্তদের স্তব্ধ ক'রে দেওয়া হল, ঘোষণা করা হল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তেরটি উপনিবেশের সমষ্টি নয়— আমেরিকা একটি দেশ, একটি জাতি।

পার্লামেণ্ট এই দেশপ্রেমিকদের বিদ্রোহী গণ্য করলেন। উপনিবেশ থেকে

দিকে দিকে সাহায্যের আবেদন গেল। আশা করা গিয়েছিল, ক্যানাডার সদ্য-বিজিত কুইবেক আর নোভা স্কোশিয়া দেশপ্রেমিকদের আহ্বানে সাড়া দেবে। কিন্তু সেখানকার ক্যাথলিক লোকেদের ধারণা হল আমেরিকার দেশপ্রেমিক-দের চাইতে ইংল্যাণ্ডের অ্যাঙলিকানরাই তাদের বড়ো বন্ধু। তারা আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইচ্ছাও প্রকাশ করল ইংল্যাণ্ডের কাছে।

১৭৭৬ সালের শেষের দিকে ইংল্যাণ্ড তিরিশ হাজার ভাড়া-করা জার্মান সৈন্য পাঠালো নিউ ইয়র্ক দখল করার জন্য। এদের আছে যুদ্ধ করার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, সাহায্যে আছে নৌবাহিনী। সুতরাং যুদ্ধে জয় তাদের হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যাদের জয় করতে পাঠানো হল তারা আছে বিশাল দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে, তাদের অদম্য স্পৃহা স্বাধীনতালাভের, তাদের নেতা সাত-বছরের-যুদ্ধে শিক্ষিত জর্জ ওয়াশিংটন। তিনি জানেন এই অসম যুদ্ধে শত্রুকে কী ক'রে ঘায়েল করতে হয়— শত্রু যখন প্রবল তখন তাকে এড়িয়ে, শত্রু যেখানে দুর্বল সেখানে ঘা মেরে, লুকিয়ে থেকে অতর্কিত আক্রমণ ক'রে। প্রিন্সটন আর ট্রেনটনের যুদ্ধে ওয়াশিংটন এইভাবেই জিতেছিলেন।

১৭৭৭ সালের অক্টোবরে ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে ব্রিটিশ সেনাপতির সারা-টোগাতে আত্মসমর্পণ আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের একটি বিরাট ঘটনা। এই ঘটনায় দেখা দিল আমেরিকায় স্বাধীনতালাভের প্রবল সম্ভাবনা। এটাও প্রমাণ হল যে, যুদ্ধ করার ক্ষমতা উপনিবেশেরও আছে। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ফরাসি সরকারকে উত্তেজিত করছিলেন আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধে উপনিবেশকে সাহায্য করতে, সাত-বছরের-যুদ্ধের অপমানের শোধ তুলতে। সারাটোগার যুদ্ধের পর ফরাসি সরকারও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, ১৭৭৮ সালে। ১৭৭৯ সালে স্পেন যোগ দিল ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। ১৭৮০ সালে হল্যাণ্ড। ইংল্যাণ্ডের ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠা ইয়োরোপের অনেক দেশেরই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছিল। ইংল্যাণ্ড শক্তিমদমত্ততায় অনেক দেশকে চটিয়েছে— সমুদ্র-শক্তিতে প্রবল হয়ে ওঠার জন্য সে সমুদ্রে যে-কোনো জাহাজ আটক ক'রে খোঁজা আরম্ভ করেছে সেই জাহাজে আমেরিকার সাহায্যে অস্ত্রশস্ত্র পণ্যসম্ভার যাচ্ছে কি না দেখার জন্য। রাশিয়া, সুইডেন ও ডেনমার্ক ইংল্যাণ্ডকে সতর্ক ক'রে দিল, ইংল্যাণ্ড যেন এদের থেকে কোনোরকম প্রশ্রয় আশা না করে। প্রাশিয়া, পর্টুগাল, সিসিলিও যোগ দিল এদের সঙ্গে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, স্বাধীনতাযুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবার উপক্রম।

অবশ্য এদের কাছ থেকে সরাসরি যুদ্ধের আশঙ্কা তেমন প্রবল ছিল না, তবে ইংল্যাণ্ডের আত্মতুষ্টি লোপ পেল সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে। ফরাসিরা কিন্তু সত্যসত্যই যুদ্ধে নেমেছিল। তাদের সহায়তায় ওয়াশিংটন ভার্জিনিয়ার ইয়র্ক-টাউনে লর্ড কর্নওয়ালিসকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করলেন সাত হাজার সৈন্য সমেত।

১৭৭৮ থেকে ১৭৮৩ পর্যন্ত টানা যুদ্ধ চলেছিল। ইংল্যাণ্ডের তখন করুণ অবস্থা। ভারতবর্ষে পর্যুদস্ত, মিনোরকা থেকে বিতাড়িত, আয়ার্ল্যাণ্ডে বিদ্রোহের সম্ভাবনা। ইংল্যাণ্ড যুদ্ধ থামাতে পারলে তখন বাঁচে। যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের সংখ্যা সমান, অতএব মানে-মানে সন্ধি করাই শ্রেয়, এই বিবেচনায় ইংল্যাণ্ড প্যারিসে আমেরিকার সঙ্গে সন্ধি করল, ভার্সাইতে করল স্পেন আর ফ্রান্সের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন দেশ, স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি পেল।

ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ক'রে আমেরিকার বুর্জোয়ারা আপন বিকাশের পথ উন্মুক্ত ক'রে নিল। অবশ্য বুর্জোয়া ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর এতে কোনো উন্নতির অবকাশ ছিল না। আমেরিকার আদি অধিবাসী ইণ্ডিয়ানদের নাগরিক অধিকার দেওয়া হল না, নিগ্রোদের দাসত্ব ঘুচল না, যেসব জমি হাতে পাওয়া গেল তার চড়া দামের জন্য গরিব লোকেরা তাতে মালিকানা পেল না। ১৮৬১ সালের গৃহযুদ্ধের পর দাসপ্রথা রহিত হলে অবশ্য কোনো কোনো অন্যায় দূর হয়েছিল। ১৮৬১-৬৬ সালের গৃহযুদ্ধও আমেরিকার বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলশ্রুতি।

৫

ফ্রান্স

সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে যেমন ফ্রান্সেও তেমন শিল্প গড়ে উঠছে, বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে, টাকাকে মূলধন ক'রে খাটানো হচ্ছে, জন্ম হচ্ছে একটি সচ্ছল মধ্যবিত্ত সমাজের। এই সমাজটি আর্থিক ক্ষেত্রে যেমন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তেমনি, প্রবল উচ্চাশা নিয়ে উঠছে, লক্ষ্য অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া।

অবশ্য যা বুর্জোয়া বলে আজ পরিগণিত, সেই পুরো সচ্ছল শ্রেণীটির পক্ষে অভিজাত শ্রেণীতে ওঠা সম্ভব নয়— আর অভিজাত শ্রেণী তা হতে দেবেও না। এই অভিজাত শ্রেণীর হাতে রাজ্যশাসনের ক্ষমতা। জৈবিক বিলাসব্যসনে এরই একচেটিয়া মালিকানা বলে এর লোকেদের মত। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজকে প্রতিহত করতে চাইলে দরকার একটা সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা, সুদৃঢ় সমাজ সংগঠন। ফ্রান্সে, ইয়োরোপের অন্যত্রও যেমন, তার নিদারুণ অভাব।

রাজার ক্ষমতা কতটুকু সে-বিষয়ে কারো কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই। ফলে রাজা যখন সক্ষম হয় তখন রাজার ক্ষমতা নিয়ে রাজ্যশাসন করে, আর রাজা যখন দুর্বল হয় তখন রাজার ক্ষমতা প্রয়োগে নানা অসুবিধা ও গণ্ডগোল দেখা দেয়। ফ্রান্সে বিপ্লবের প্রাক্কালে ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছিল। বুরবন বংশের চতুর্দশ লুই দোর্দণ্ড প্রতাপে ফ্রান্স শাসন ক'রে গেছেন, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী পঞ্চদশ এবং ষোড়শ লুই অকর্মণ্য।

কিন্তু কোনো দেশেই কোনো কালেই রাজা কেবল একাই রাজ্যশাসন করে না। সেজন্য তার পেছনে থাকে একটি সুসংহত শ্রেণী, কর্মঠ অমাত্য, সুদৃঢ় নিয়ম-কানুন। ফ্রান্সে সেসময় রাজাও যেমন অকর্মণ্য, তাঁর পিছনের শক্তিও তেমনি নির্জীব। নানান ধরনের কানুন, একটার সঙ্গে আর একটা মেলে না। নানান ধরনের অমাত্য, পরস্পরের সঙ্গে বনিবনা তো দূরের কথা কোনো সম্পর্কই প্রায়

নেই— যে যার ইচ্ছামতো, সুবিধামতো চলে। দেশটা নানান প্রদেশে ভেঙে গেছে, প্রত্যেক প্রদেশে আছে গভর্নর, কিন্তু সব গভর্নর সব প্রদেশ সংহত ক'রে চালানোর কেন্দ্রীয় ক্ষমতা রাজার হাতে নেই। শাসন করার জন্য যেমন আছে নানান প্রদেশ, তেমন আছে নানান প্রদেশ বিচারবিভাগের সুবিধা অনুযায়ী, যাজক শ্রেণীর সুবিধা অনুযায়ী, শিক্ষাকর্তাদের সুবিধা অনুযায়ী। শহর চালানোর জন্য আছে কাউন্সিল, অথচ এক-একটা কাউন্সিলের ধরন আলাদা, আইনকানুন আলাদা। ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশে সেসময় নাকি চারশো রকম আইন।

অর্থনৈতিক দিক দিয়েও চরম নৈরাজ্য। সেসময় বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে, বাণিজ্য ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে। অথচ মুদ্রার ব্যাপারে, ওজনের ব্যাপারে, করের ব্যাপারে, শুল্কের ব্যাপারে কোনো একটা বোধগম্য সাদৃশ্য নেই। কোন খাজনাটা রাজার নিজস্ব প্রাপ্য, কোনটা সরকারের, কেউ তা হলফ ক'রে বলতে পারে না। বাজেটের কোনো ব্যাপারই নেই, টাকা আদায় হচ্ছে, খরচ হয়ে যাচ্ছে, কেউ তার হিসাব রাখে না। কর আছে বটে, তবে তা আদায় করবার ধরনটা অপূর্ব— কেউ বেশি দেয়, কেউ কম দেয়, কেউ বেশি আদায় করে, কেউ বা গা ছেড়ে বসে থাকে। বলা বাহুল্য, অভিজাত শ্রেণী করের ব্যাপারে বেশ ওস্তাদ— কী ক'রে ফাঁকি দেওয়া যায়, বৈধভাবে, অবৈধভাবে। উঠ্‌তি বুর্জোয়ারাও টাকার মাহাত্ম্য বুঝতে পেরেছে, টাকা কীভাবে সঞ্চয় ক'রে আরো বাড়ানো যায় তার ফন্দিফিকিরে ব্যস্ত— অতএব স্বেচ্ছায় কর দিয়ে রাজার বিলাসিতায় সাহায্য করবে সেই শ্রেণী এটা নয়। অতএব পুরো চাপ গিয়ে পড়ল কৃষকসমাজের উপর। বুর্জোয়াদের উপর-তলার লোকেরা অভিজাতদের মতোই কর এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে বটে কিন্তু মধ্য-বুর্জোয়া নিম্ন-বুর্জোয়ারা সে সুযোগ পায় না, ফলে করের চাপে তাদেরও ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারে অসুবিধা। এরই সঙ্গে আছে বিচিত্র রাজাদেশ, বিনাবিচারে অসুবিধা-জনক ব্যক্তিদের জেলে পুরে রাখার ক্ষমতা। রাজার আদেশে যখন-তখন বাক্-স্বাধীনতা রুদ্ধ হয়ে যায়।

এই নৈরাজ্য বেশিদিন চলতে পারে না, কেননা সামন্তপ্রথা তখন যেমন ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসছে তেমনই গড়ে উঠছে নতুন বুর্জোয়ারা। তাদের সংহতির জন্য দরকার দেশের শাসনব্যবস্থায় সংহতি। ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস হচ্ছে, বুর্জোয়া শ্রেণীর এই সংহতি আনার প্রয়াস, রাজা তথা সামন্ত শ্রেণীর বিরোধিতা— এবং এই দ্বন্দ্বে ক্রমশ রাজা এবং সামন্ত শ্রেণীর পতন।

সংহতি আনার প্রথম প্রয়াস করলেন টার্গট। বিখ্যাত ব্যঙ্গপ্রিয় সমাজ-সমালোচক ভলটেয়ারের বন্ধু তিনি। নিজেও পণ্ডিত— সেসময় অনেকে মিলে ফ্রান্সে যে 'এনসাইক্লোপিডিয়া' লেখা চলছিল, তার অন্যতম লেখক। তিনি নিযুক্ত হলেন অর্থমন্ত্রী। বলাই বাহুল্য, তাঁর চেষ্টা হল, বুর্জোয়াদের শিল্প-ব্যবসায়ে সংহতি আনার জন্য নানা কাজকরা। তিনি চেষ্টা করলেন উৎপাদন যারা করে, যাদের নির্জীব ক'রে রাখলে উৎপাদন হবে না— অতএব ব্যবসা চালানো যাবে না— সেই কৃষকসমাজ এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের উপর থেকে করের বোঝা নামিয়ে তা ধনী অভিজাত ও যাজকদের উপর কিছুটা বসিয়ে দেওয়া, খাদ্যের উপর থেকে কর তুলে দেওয়া এবং কৃষকদের জোর ক'রে খাটানো বন্ধ করা। বলা বাহুল্য, অভিজাত সামন্তরা এতে টার্গটের উপর ক্ষেপে গেল। দরবারের অমাত্যদের সুযোগ-সুবিধা তারা ছাড়তে রাজি নয়। একচেটিয়া কারবারীরা ভয় পেয়ে গেল। ফলে ১৭৭৬ সালে টার্গট বরখাস্ত হলেন।

তাঁর বদলে এলেন এক ধনী ব্যাঙ্ক মালিক নেকার, তিনিও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। তাঁর চেষ্টা হল কর ঠিকমতো আদায় করা, হিসেবপত্র ঠিক ক'রে রাখা, রাজার কোষাগারটি সুবিন্যস্ত করা, রাজকার্য চালানোর জন্য ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করা। কিন্তু রাজার কোষাগারে হাত দিতেই রানী মারি অ্যান্টোনেট ক্ষেপে গেলেন, নেকারও বরখাস্ত হলেন। এলেন কালোন।

এসময় আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় ফ্রান্সের প্রচুর অর্থব্যয় হচ্ছিল, রাষ্ট্রের দেনা বিপুল হয়ে উঠছিল। কালোন অতি সহজ উপায় গ্রহণ ক'রে দেশকে বাঁচাতে চাইলেন— মোটা সুদ দিয়ে টাকা ধার ক'বে। ফলে ফ্রান্সের সরকার আকণ্ঠ দেনায় ডুবে গেল।

অবস্থা যখন চরম সংকটে তখন রাজা ডাকলেন তাঁর অভিজাতদের, যাজকদের, আর বিচারকদের দিয়ে গড়া এক অ্যাসেম্বলিকে। উদ্দেশ্য, নতুন ক'রে কর বসানো। এঁরা পরামর্শ দিলেন এস্টেটস জেনারেল ডাকা হোক। রাজা অবশ্য তাতে রাজি নন। তিনি অ্যাসেম্বলি ভেঙে দিলেন। এবং তার উপর, নিজে নিজেই নতুন কর বসালেন। এতে অ্যাসেম্বলি চটে গেল, তার পেছনে আছে সাধারণ লোকের সমর্থন। এরা বলল কর বসানোর ক্ষমতা আছে শুধু জনসাধারণের প্রতিনিধি এস্টেটস জেনারেলের। অ্যাসেম্বলি ভেঙে দেওয়ায় প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ক্রুদ্ধ জনতা। রাজা ভয় পেয়ে শেষে জনপ্রিয় নেকারকে আবার ডাকলেন অর্থমন্ত্রী হবার জন্য এবং ভার্সাইতে আহ্বান করলেন এস্টেটস জেনারেল।

এটাই সম্ভবত বিপ্লবের শুরু। এস্টেটস জেনারেল গত দেড়শো বছর ডাকা হয় নি, যদিও আইনমতে এস্টেটস জেনারেল ছাড়া সরকার চলে না। এই সভার তিনটি অংশ। একটি তৈরি অভিজাতদের নিয়ে। একটি যাজকদের নিয়ে। তৃতীয়টি সাধারণ লোকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে। তিনটি অংশের একটি একটি ভোট। যাজক ও অভিজাতদের এস্টেটস জেনারেল আহ্বান করতে পরামর্শ দেওয়ার কারণ ছিল। তাদের ধারণা তারা দুই-এক ভোটে তৃতীয় অংশটির পরামর্শ অগ্রাহ্য ক'রে আপন সুবিধামতো কর বসিয়ে নেবে।

১৭৮৮-৮৯ সালে এস্টেটস জেনারেলের নির্বাচন সমাধা হল। নির্বাচক জনসাধারণ আপন আপন স্থানের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য পেশ ক'রে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দিল। এটা বোঝা গেল ফ্রান্সের সাধারণ লোক আর মুখ বুজে সামন্ত শ্রেণীর অন্যায় অবিচার সহ্য করবে না। অবশ্য তারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কোথায়ও করে নি। তাদের শুধু দাবি রাজ্যশাসন সুশৃঙ্খল-ভাবে হোক। তাদের অংশের, যা পরিচিত তৃতীয় এস্টেট হিসেবে, নেতৃত্ব দিলেন মিরাবো আর সাইয়েস। মিরাবো অভিজাত বংশের সন্তান, কিন্তু তাঁর সহানুভূতি উঠ্‌তি বুর্জোয়াদের প্রতি। তাঁর ধ্যানধারণা অভিজাতদের কাছে, এমন কি তাঁর নিজের বাবার কাছেও, এমন ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিল যে তাঁর বাবাই বার-বার রাজাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, মিরাবোকে যেন জেলে পুরে রাখা হয়। মিরাবো কিন্তু দমবার পাত্র নন। তৃতীয় এস্টেট নির্বাচিত হবার পর তাঁর এক মাত্র লক্ষ্য কীভাবে তৃতীয় এস্টেটকে শক্তিশালী ক'রে তোলা যায়। এই তৃতীয় এস্টেট অবশ্য জনসাধারণের প্রতিনিধি হলেও কার্যত বুর্জোয়াদের হাতের অস্ত্র, তার নেতৃত্ব পুরো বুর্জোয়াদের হাতে। মিরাবো ছাড়া অন্য নেতা সাইয়েস'ও অভিজাত যাজক, যদিও তিনি যাজক শ্রেণীর প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল নন। তিনিও চান এস্টেটস জেনারেলে তৃতীয় এস্টেটের প্রতিষ্ঠা।

রাজা মহা আড়ম্বরে এস্টেটস জেনারেলে এলেন। তাঁর কোনো ধারণাই নেই তখন কী থেকে কী হতে যাচ্ছে। সেবছর ফসল খুব খারাপ হয়েছে। কৃষকদের অবস্থা সঙিন। প্যারিসের জনসাধারণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ খাদ্যবস্তুর দাম অসম্ভব চড়া হয়ে গেছে বলে। প্রচণ্ড শীত চতুর্ধারে, লোকের গায়ে শীতবস্ত্র নেই। এমনই এক পরিস্থিতিতে তৃতীয় এস্টেট দাবি জানালো এস্টেট অনুযায়ী ভোট গোনা চলবে না, প্রতিটি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোট গুনতে হবে, যাতে তৃতীয় এস্টেট যা প্রকৃত জনসাধারণের এস্টেট, তার দাবি গ্রাহ্য হয়। এই তৃতীয় এস্টেট

নিজেকে ঘোষণা করল জাতীয় পরিষদ হিসেবে এবং অন্য দুই এস্টেটকে নিমন্ত্রণ জানালো তাতে যোগদান করতে। এই ঘোষণার তিনদিন পর তৃতীয় এস্টেটের সদস্যরা সভায় এসে দেখল সভার দরজা বন্ধ, সেখানে নাকি মেরামতি কাজকর্ম চলছে।

এই ঔদ্ধত্যে ভার্সাইয়ের সাধারণ লোক রাগে ফেটে পড়ল। মিরাবো আর সাইয়েসের নেতৃত্বে তারা কাছেই এক টেনিস-কোর্টে হাজির হল। তৃতীয় এস্টেটের সদস্যরা শপথ নিল, ফ্রান্সের নতুন সংবিধান তারা তৈরি করবেই করবে। রাজার স্বৈরাচার, সামন্ত শ্রেণীর যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হল। নেতৃত্বে বুর্জোয়া নেতারা,অংশীদার ফ্রান্সের জনসাধারণ। অবস্থা বেগতিক বুঝে রাজা নতি স্বীকার করলেন— মেনে নিলেন, তৃতীয় এস্টেটই জাতীয় পরিষদ এবং এস্টেটস জেনারেলের ভোট এস্টেট গুণে নয়, মাথা গুণেই হবে।

কিন্তু রাজা চালে ভুল করলেন। প্যারিসে আর ভার্সাইয়ে তিনি দিনের পর দিন সৈন্য মোতায়েন ক'রে যাচ্ছেন, তাদের শক্তিশালী ক'রে তুলছেন। উদ্দেশ্য কী? অস্ত্র দিয়ে পরিষদ ভেঙে দেওয়া? পরিষদ সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি করল, উত্তরে রাজা সৈন্য তো প্রত্যাহার করলেনই না, উপরন্তু নেকারকে বরখাস্ত করলেন।

এর যোগ্য প্রত্যুত্তর দিল প্যারিসের জনতা। ১৪ জুলাই ফোবার্গ সেণ্ট অ্যাণ্টোনের শ্রমিকেরা প্যারিসের পূর্ব উপকণ্ঠে অবস্থিত দুর্গ ব্যাস্টিল আক্রমণ করল। সৈন্যদের গুলি অগ্রাহ্য ক'রে তারা গভর্নরকে নিহত করল, ব্যাস্টিলের পাথর একটার পর একটা খসাতে শুরু করল। ডেজমুলিন নামে এক অসাধারণ বাগ্মী সাংবাদিকের নেতৃত্বে তারা সশস্ত্র হয়ে ব্যাস্টিল উৎপাটিত করল। ব্যাস্টিলের পরিচয়— এই সেই দুর্গ যে দুর্গে বিনা বিচারে দিনের পর দিন ফ্রান্সের যে কাউকে আটক রাখা যায়, প্যারিসের স্বাধীনতার শত্রু, বুরবন বংশের অত্যাচারের প্রতীক। শ্রমিকদের উদ্দেশ্য, দুর্গের অভ্যন্তরে রক্ষিত অস্ত্রশস্ত্র লুঠ ক'রে সশস্ত্র হয়ে পরিষদকে পাহারা দেওয়া, যাতে রাজা পরিষদ ভেঙে দিতে না পারেন। বিপ্লব, এই ব্যাস্টিল আক্রমণের মধ্য দিয়ে, প্যারিসের জনসাধারণের হাতে চলে গেল। এই ব্যাস্টিল আক্রমণের কয়েকদিনের মধ্যেই বুরবন পতাকার সাদা রঙের সঙ্গে প্যারিস শহরের পতাকার লাল আর নীল রঙের যোগ হল, তৈরি হল ফ্রান্সের নতুন ত্রিবর্ণ পতাকা। প্যারিসের উপকণ্ঠ থেকে সৈন্য সরে গেল।

শুধু প্যারিস শহরেই নয়, গ্রামাঞ্চলেও বিরাট উন্মাদনা, বিপুল উত্তেজনা।

রাজা শান্তিরক্ষার জন্য দলে দলে সৈন্য পাঠাচ্ছেন, গ্রামে গ্রামে এই খবর রটে যাওয়ায় উত্তরে দক্ষিণে সর্বত্র গ্রামবাসীরা তাদের গোরু ঘোড়া মাঠ থেকে সরিয়ে ঘরে নিয়ে এসে, দরজা বন্ধ ক'রে, রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি ক'রে দিনের পর দিন প্রস্তুত হয়ে রইল রাজসৈন্যের মোকাবিলা করার জন্য।

শ্রমিক এবং কৃষকদের শায়েস্তা করার জন্য রাজদরবারে অবশ্য চক্রান্তের বিরাম নেই। ফ্ল্যাণ্ডার্স থেকে সৈন্য এনে প্যারিসকে কীভাবে ঠাণ্ডা করা যায় সেই ষড়যন্ত্র চলছে তখন ভার্সাইয়ের রাজদরবারে। তারই সঙ্গে হচ্ছে প্রচুর খানাপিনা। যখন প্যারিসের লোকেরা না খেয়ে আছে তখন ভার্সাইয়ে ভোজসভা চলেছে— এই খবর রটে যাওয়ায়, বিক্ষোভ ফেটে পড়ল। পাঁচই অক্টোবর প্যারিস থেকে দুঃস্থ নিরন্ন রমণীদের এক বিশাল শোভাযাত্রা 'রুটি চাই রুটি চাই' দাবি জানাতে জানাতে— হাতে লাঠি গদা— প্যারিস থেকে ভার্সাই বারো মাইল হেঁটে চলে এল। তার পিছন পিছন এর উদ্যোক্তা বুর্জোয়া নেতা লাফায়েত। রমণীদের হাতে প্রাসাদ পরিবেষ্টিত, পাহারাদারদের অনেকেও তাদের উপর গুলি চালাতে অসম্মত। লাফায়েতের যুক্তিপূর্ণ আবেগময় বক্তৃতায় সৈন্যরাও ব্যারাকে ফিরে গেছে। জনতার হাতে প্রাসাদ এবং রাজা। কিছু পাহারাওয়ালা উদ্ধত হয়ে আক্রমণ করতে গেলে জনতার হাতে মৃত্যুবরণ করল। অবশেষে ভোরে রাজা বেরিয়ে এলেন, রাজি হলেন জনতার সঙ্গে প্যারিসে যেতে। আবার শোভাযাত্রা —প্যারিসের মেয়েদের দল, সঙ্গে বস্তি থেকে আসা পুরুষেরা, পাশে সাদা ঘোড়ায় চড়ে লাফায়েত আর রাজারানী এবং তাঁদের বাচ্চারা। রাজা কার্যত জনতার হাতে বন্দী। ভার্সাইয়ের হাত থেকে প্যারিস বিপ্লবের কর্তব্য তুলে নিল। জাতীয় পরিষদও এল প্যারিসে। রাজারানী টুইলারিসের প্রাসাদে অন্তরীণ রইলেন।

ব্যাস্টিলের পতন এবং রাজার গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যশাসনক্ষমতা পরিষদের হাতে চলে গেল। গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহ দেখা দিল। রাজার প্রতিনিধিদের দূর ক'রে দিয়ে জনসাধারণ শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে নতুন নির্বাচিত শাসক, সৈন্য, বিচারক-সংস্থা গঠন ক'রে নিল। অভিজাতদের প্রাসাদ-দুর্গ আক্রমণ ক'রে ভেঙে দেওয়া শুরু হল, জমিদারের দলিলদস্তাবেজ পোড়ানো শুরু হল, পাদ্রিদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস হল, কোথাও কোথাও জোতদার নিহত হল, কোথাও তারা পালিয়ে গেল গ্রাম ছেড়ে।

এদিকে জাতীয় পরিষদ ৪ আগস্ট ঘোষণা করল সামন্ততন্ত্রের আনুষ্ঠানিক অবসান। গ্রাম থেকে যখন খবর আসতে লাগল যে জমিদারদের প্রাসাদ আক্রান্ত

হচ্ছে তখন পরিষদে দাবি উঠল অভিজাত জমিদার শ্রেণীর অন্যায় সুযোগসুবিধা বন্ধ করতে হবে। প্রচণ্ড তর্ক লেগে গেল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল সার্ফ প্রথা উৎখাত করতে হবে। রাজা এই সামন্ত প্রথা রদ করার আদেশে সই দিলেন।

এরই সঙ্গে পরিষদ ঘোষণা করল 'মানুষের অধিকার'। তাতে বলা হল, মানুষ জন্ম নেয় স্বাধীনভাবে, মানুষ থাকবে স্বাধীনভাবে। সকল মানুষের সমান অধিকার। প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে স্বাধীনতার, সম্পত্তির, নিরাপত্তার, অত্যাচার প্রতিরোধের। আইন হল মানুষের তৈরি। প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে এই আইন তৈরি করবার। আইনের চোখে সব মানুষ সমান। আইন ছাড়া মানুষের বিচার চলবে না। ধর্মের স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতায় সকলের সমান অধিকার। শাসকবর্গ সাধারণ মানুষের কাছে দায়িত্বশীল হবে।

জাতীয় পরিষদ এরই সঙ্গে মন দিল শাসনব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে। আগেকার নানাধরনের প্রদেশের বদলে পুরো ফ্রান্সকে তিরাশিটা ডিপার্টমেণ্টে ভাগ করা হল, আয়তনে লোকসংখ্যায় সবকটি প্রায় সমান। প্রত্যেকটা ডিপার্টমেণ্ট আবার জেলা আর কমিউনে বিভক্ত। এদের শাসক নিয়োগে রাজার হাত রইল না, জনসাধারণের ভোটে শাসক নির্বাচিত হতে লাগল। বিচারকও নিযুক্ত হতে থাকল জনসাধারণের ভোটে। অসংখ্য আইনকে একটা শৃঙ্খলায় আনার চেষ্টাও আরম্ভ হল। এইসব কাজের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে জন্ম হল এক নতুন জাতীয়তা-বোধ। এমন কি, নতুন সৈন্যদের নাম হল জাতীয় রক্ষী। এই নতুন উন্মাদনার, নতুন সংহতির পরিচয় পাওয়া গেল ব্যাস্টিল পতনের একবছর পর, ১৭৯০ সালের ১৪ জুলাই-য়ে। ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায ৫০,০০০ প্রতিনিধি ও ১৪,০০০ জাতীয় রক্ষী উপস্থিত হল জাতীয় দিবস উদ্‌যাপনের জন্য প্যারিসে। রাজারানীর সমক্ষে, জাতীয় পরিষদের উপস্থিতিতে, ১২০০ গায়কের অংশ গ্রহণে, ২০০ পাদ্রির ধর্মানুষ্ঠানে, ৪০টি কামান দাগার মধ্যে, প্যারিসের জনগণ শপথ নিল— পিতৃভূমি রক্ষা করতে হবে।

এর একবছর পর জাতীয় পরিষদ সংবিধান রচনা শেষ করল। এই প্রথম ইয়োরোপে সংবিধান রচিত হল। ১৭৯১ সালে রাজা সই দিলেন— তাঁর একচ্ছত্রাধিপত্য শেষ হল। ঘোষণা হল, এখন থেকে রাজা সাংবিধানিক রাজা, সংবিধান অনুযায়ী তিনি চলবেন, সংবিধানে যতটুকু ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হল ততটুকুই তিনি প্রয়োগ করবেন।

জাতীয় পরিষদের যতটুকু করণীয় ছিল তা পরিষদ সমাধা করল। কিন্তু বিপ্লবের

আরো বাকি। জাতীয় পরিষদের নেতৃত্ব তখন বুর্জোয়াদের হাতে, বুর্জোয়ারা রাজাকে সামনে রেখে, গণতন্ত্রের কথা তুলে আপন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতে ব্যস্ত। চেষ্টা চলল পরবর্তী দুই বছর মারাট, ডাণ্টন, রোবসপিয়েরদের নেতৃত্বে এই বিপ্লবের সার্থক পরিণতি আনার। পরবর্তী দু-বছর ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধের বছর, একদিকে ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত সমাজের স্বার্থ, অপরদিকে কৃষক এবং শ্রমিক সমাজের স্বার্থ।

প্যারিসে সেসময় দিকে দিকে ক্লাব তথা বৈপ্লবিক ক্লাবের পত্তন হচ্ছে। এর শুরু সেই ১৭৮৯ সালেই, যখন ভার্সাইতে এস্টেটস জেনারেলের সদস্যরা খাওয়ার জন্য একসঙ্গে খাওয়ার ক্লাবে উপস্থিত হতেন। এইসব কাফে বা ক্লাবগুলো হয়ে উঠল বৈপ্লবিক আলোচনা, বুদ্ধিজীবীদের তর্কবিতর্কের জায়গা। কোনো ক্লাব প্রতি-ক্রিযাশীল সামন্ত রাজার অনুরাগী, কোনো ক্লাব আবার প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোযা, কোনো ক্লাব আবার প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদের মিলন-স্থান। কর্ডে-লিযার আর জ্যাকোবিন ক্লাবগুলো শেষোক্ত ধরনের। কর্ডেলিয়ার ক্লাবের সদস্যরা মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করতে চাইতেন। জ্যাকোবিন ক্লাবের প্রথম দিকের নেতা ছিলেন মিরাবো, সাইয়েস, লাফায়েতের মতো মধ্যপন্থীরা। কিন্তু অচিরেই রোবসপিয়েরের মতো চরমপন্থীদের নেতৃত্বে এই জ্যাকোবিন ক্লাবগুলোও কর্ডেলিয়ার ক্লাবগুলোর মতো বৈপ্লবিক হয়ে ওঠে। প্যারিসের পর ফ্রান্সের অন্যান্য শহরেও এই ধরনের ক্লাব গজিয়ে উঠল। জ্যাকোবিন ক্লাবগুলোর মধ্যে, প্যারিস ও অন্যান্য শহরের মধ্যে, যোগাযোগের সূত্র হল প্যামফ্লেট আর খবরের কাগজ। জ্যাকোবিন ক্লাব অচিরেই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠল। এদের নেতা হলেন মারাট, ডাণ্টন, রোবসপিয়ের।

বিদগ্ধ পণ্ডিত মারাট। পেশায় ডাক্তার, পদার্থবিদ্যায় পণ্ডিত। কিন্তু এস্টেটস জেনারেল ডাকার পর থেকে তিনি রাজনীতিতে মগ্ন। তাঁর ইংল্যাণ্ড-প্রবাসের সময় সাংবিধানিক রাজা সম্পর্কে তিনি মোহমুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই ফ্রান্সে যাঁরা সাংবিধানিক রাজার অনুরক্ত তিনি গোড়া থেকেই তাঁদের বিরুদ্ধে— সাংবিধানিক রাজার শাসনে সাধারণ মানুষের যে কোনোই লাভ নেই, সাংবিধানিক রাজাকে শিখণ্ডী রেখে সামন্তরাই যে রাজ্য শাসন করে, সে বিষয়ে তিনি ফরাসি জাতকে গোড়া থেকেই সতর্ক ক'রে দিতে সচেষ্ট। তাঁর সম্পাদিত খবরের কাগজে— 'জনসাধারণের বন্ধু' পত্রিকায়— তিনি দিনের পর দিন রাজদরবার, পাদ্রি, অভিজাত শ্রেণী, সংসদ এসবের বিরুদ্ধে পাতার পর

পাতা লিখে গেছেন। এই মারাট ছিলেন কর্তাব্যক্তিদের চক্ষুশূল, আর সাধারণ লোকের চোখে বীর।

ডাণ্টন ছিলেন চাষার ছেলে। আইনবিশারদ এই ডাণ্টনকে রাজনীতিতে আনেন মিরাবো। অসাধারণ বাগ্মী ডাণ্টন মারাট এবং ডেজমুলিনের সহায়তায় কর্ডেলিয়ার ক্লাবগুলো চালু করেন। রাজার বিরুদ্ধে, রাজপরিবারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে এই ডাণ্টন অনলস পরিশ্রম ক'রে গেছেন, ফ্রান্সকে রাজতন্ত্র থেকে জনতন্ত্রে রূপান্তর করার চেষ্টা ছিল তাঁর অবিশ্রান্ত।

চরমপন্থীদের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন রোবসপিয়ের। সাবেকি ঐতিহাসিকের হাতে এঁর পরিচয় হয় নরখাদক হিসেবে। আসলে ফরাসি বিপ্লবকে বুর্জোয়া বিপ্লবের সার্থকতায় পরিণত করার চেষ্টায় তাঁকে বিপুল বাধার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল, রাজভক্তদের রক্তে তাঁর হাত কলুষিত হয়েছিল বিপ্লবের স্বার্থেই। রুশোর একনিষ্ঠ পাঠক রোবসপিয়ের তৃতীয় এস্টেটে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই প্যারিসের সাধারণ লোকের প্রতিনিধি। জ্যাকোবিন ক্লাব-গুলো তিনি মধ্যপন্থীদের হাত থেকে মুক্ত ক'রে খাঁটি বিপ্লবীদের আলোচনার স্থান ক'রে তোলেন। প্রথম জীবনে যিনি প্রাণদণ্ডাদেশ দিতে সংকোচ বোধ ক'রে বিচারকপদ ত্যাগ করেছিলেন, ইতিহাসের চক্রে সেই রোবসপিয়েরকেই ফরাসি গণতন্ত্র বাঁচানোর চেষ্টায় হাজার হাজার প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিকে গিলো-টিনে চড়াতে হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে 'রক্তচোষা রোবসপিয়ের' বলে আখ্যাত হবার মতো কোনো কাজ তিনি করেন নি।

১৭৯১ সালের অক্টোবরে আইন পরিষদ বসল বটে— কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই, নানা মতের মুনি, এমনসব সদস্যদের নিয়ে কাজ চলা খুবই কঠিন। রাজাও সর্বদাই সচেষ্ট কী ক'রে তাঁর হৃত শক্তি পুনরুদ্ধার করা যায়। খিতাড়িত সামন্তরা ফ্রান্সে ফিরে এসে লুপ্ত শক্তি ফিরে পাওয়ার চক্রান্ত ক'রে যাচ্ছে, পাদ্রিরা তাদের সহায়। প্যারিস ও অন্যান্য শহরে সাধারণ লোক ক্রমশই অস্থির হয়ে উঠছে বিপ্লবের ফলে তাদের কোনো সুখসুবিধা হল না বলে। লা ভেণ্ডিতে রাজভক্ত কৃষকদের বিদ্রোহ ঘটে গেছে। সমস্ত ইয়োরোপ ফরাসি বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এমন কি ইংল্যাণ্ডে, যেখানে সাংবিধানিক রাজা রাজ্য চালাচ্ছেন, সেখানে, প্রথমদিকে মুষ্টিমেয় কবি ছাড়া বেশির ভাগ বুদ্ধিজীবীরা ফরাসি বিপ্লবের বিপক্ষে। এডমাণ্ড বার্ক তো একখানা বই লিখেই ফেললেন বিপ্লব কেন করা উচিত নয় তা দেখিয়ে। এমনসব জটিল পরিস্থিতিতে আইন পরিষদের সদস্যরা

বেশ কয়েকটি ভাগে আলাদা হয়ে গেলেন। একদল রাজাকে উচ্ছেদ করতে চান না, শুধু রাজার ক্ষমতা সামান্য খর্ব করেই তাঁরা সন্তুষ্ট। বেশির ভাগেরই কোনো বিশেষ মতামত নেই, যখন যেখানে সুবিধা ভোট দেন। আর চরমপন্থীরা— জিরোণ্ডিস্ট— জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর।

এমন সময়ে যুদ্ধ লাগল, অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের। ফরাসি জনসাধারণ স্বাধীনতা, মৈত্রী, জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নেমে এল রাস্তায়। মাথায় লাল টুপি, স্বাধীনতার প্রতীক, হাতে বন্দুক, অন্য হাতে লাঠি। মার্সেই থেকে আসা ফরাসি সৈন্যরা সদ্য-রচিত একটি গান গাইতে গাইতে এগিযে এল, যে গান এখন 'লা মার্সেই' বলে বিখ্যাত।

এদিকে শত্রুরা একজোট হয়ে এগুচ্ছে, ফরাসি বিপ্লব দমন ক'রে রাজাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঘটল প্যারিসের গণজাগরণ। এদের চোখে সাংবিধানিক রাজাই সব গলদের গোড়া। ফরাসি বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে গঠিত কমিউন ভেঙে প্যারিসের লোকেরা তৈরি করল বিপ্লবী কমিউন, নেতা হলেন ডাণ্টন। প্রাসাদ আক্রমণ ক'রে, প্রাসাদরক্ষীদের হত্যা ক'রে রাজাকে তারা বাধ্য করল প্রাসাদ ছাড়তে। আইন পরিষদের সদস্যরা রাজাকে উৎখাত ক'রে ঘোষণা করলেন সর্বজনীন ভোটের দ্বারা একটি জাতীয় কনভেনশন তৈরি হবে, যে কনভেনশন তৈরি করবে নতুন সংবিধান। প্যারিসের এই জাগরণে ভীত লাফাযেত পালিয়ে গিয়ে শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

শত্রুরা তখন এগিয়ে আসছে। ডাণ্টনের আদেশে রাজভক্তদের বিনাশ করা শুরু হল। এই রাজভক্তরা অপেক্ষায় ছিল কবে বিদেশী রাজভক্তরা এসে, অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার সাহায্যে, তাদের মুক্ত করবে। ঘরের শত্রু বিভীষণ এদের দেখে ফরাসি বিপ্লবীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, জেল থেকে বার ক'রে এনে জনতা তাদের হত্যা করল। এদিকে যুদ্ধে শত্রুদের আগমন রোধ হয়েছে। নতুন তৈরি জাতীয় কনভেনশন ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করল।

এই কনভেনশন তিনবছর ফরাসি বিপ্লবের অগ্রসরের জন্য অবিরত চেষ্টা ক'রে গেছে, বিপ্লব ব্যর্থ হওয়া পর্যন্ত— শত্রুকে সীমান্তপারে ঠেকিয়ে রেখেছে, অসংখ্য সামাজিক সংস্কার ক'রে ফরাসি জীবনকে সাধারণের পক্ষে সহজ ক'রে তোলার চেষ্টা করেছে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে, দেশে একটা সমর্থ সরকার গঠন ক'রে অভ্যন্তরীণ শ্রেণীশত্রু দমন ক'রে নতুন সংবিধান প্রতিষ্ঠা ক'রে দেশে শান্তি আনার চেষ্টা করেছে। এর সদস্যরা খাঁটি বিপ্লবী। অবশ্য এদের মধ্যেও

বিরোধ ছিল। একদিকে ছিলেন ব্রিসো, কনডরসেট, আর টমাস পেন— যিনি এডমাণ্ড বার্ককে যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন। কিন্তু এঁরা ছিলেন মুখেই বিপ্লবী। প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি দেখে এঁরা আতঙ্কিত। শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিভূ ছিলেন ডাণ্টন, রোবসপিয়ের, কার্নট, সেণ্ট জুস্ট। এঁদেরই দাবিমতো রাজা ষোড়শ লুই-এর— যিনি স্বদেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে যাচ্ছিলেন বিপ্লব ধ্বংস করার জন্য— ফাঁসি হল।

সাময়িকভাবে শত্রুরা নিশ্চেষ্ট থাকলেও, অচিরেই অষ্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দিল ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, স্পেন, সার্ডিনিয়া। সকলেরই ভয় ফ্রান্সে জনগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের ফলে সমস্ত ইয়োরোপেই বিপ্লব দেখা দেবে।

উপায়ান্তরবিহীন হয়ে কার্নটের উদ্যোগে সমস্ত ফরাসি জাতিই তখন যুদ্ধে নামল। পাঁচ লক্ষ নতুন সৈন্য তৈরি করা হল। বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য আঠারো থেকে পঁচিশ বছর বয়সের সব যুবক যোগ দিল সৈন্যবাহিনীতে। ১৭৯৩ সালের শেষের দিকে জাতীয় সৈন্যবাহিনীতে ছিল সাত লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য। স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর স্লোগান নিয়ে এগিয়ে এল শ্রমিকেরা, কৃষকেরা। এই সৈন্যবাহিনী সফলভাবে রোধ করল সমবেত শত্রুকে। শুনতে যত সহজ, কাজে অবশ্য তত সহজ নয়। তার উপর আছে ঘরের শত্রুদের দমন। প্যারিসেই প্রায় পাঁচ হাজারের মতো চক্রান্তকারী প্রতিক্রিয়াশীলদের ফাঁসি দেওয়া হল। তাদের মধ্যে রাজা ও রানীও ছিলেন। প্যারিসের বাইরেও বিপ্লবী সরকার প্রায় পনেরো হাজার প্রতিক্রিয়াশীলের ফাঁসি দিল। এই ফাঁসি দেওয়ার জন্যই এই সরকারের নাম দেওয়া হয়েছিল 'সন্ত্রাসের সরকার', যদিও এই রাজভক্তদের দমন করতে না পারলে বিপ্লবের বিসর্জন বহু আগেই ঘটে যেত। কিন্তু এই সন্ত্রাস উপলক্ষ ক'রে কনভেনশনে ভাঙন দেখা দিল। রাজার ফাঁসিতে অনেকে ভীত, মারাটের নির্দেশে প্যারিসের শ্রমিকেরা এইসব ভীত সদস্যদের কনভেনশন থেকে বার ক'রে দিল। মারাট নিহত হলেন আততায়ীর হাতে। ফলে রাজভক্তদের দমন করা শুরু হল আরো কঠোরভাবে। আপাতবিপ্লবী ব্রিসো প্রাণ দিলেন গিলোটিনে। এমন কি ডাণ্টনও শেষপর্যন্ত অগ্রসর হতে পারলেন না, বললেন প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে আপস ক'রে নিতে। তাঁর সঙ্গী তাত্ত্বিক ডেজমুলিনেরও তাই মত। প্যারিসের জনতার ক্রোধ তাঁদের উপরও পড়ল, তাঁরাও গিলোটিনে প্রাণ দিলেন। কিন্তু ক্রমশই দেখা গেল কনভেনশনে রক্ষণশীল দলটিই শক্তিমান হয়ে উঠছে। শেষ বিপ্লবী রোবসপিয়ের আর সেণ্ট জুস্টকেও

তাঁরা পাঠালেন গিলোটিনে। রোবসপিয়েরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবে ভাঙন ধরল। বুর্জোয়া বিপ্লব যা ১৭৯১ সালে সমাধা হয়েছিল রাজতন্ত্র বিনাশের পর, রোবসপিয়েরের মৃত্যুর পর তার আরো বিকাশের আশা অন্তর্হিত হল। প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের হাতেই সরকার চলে গেল। কনভেনশন চেষ্টা করেছিল পালিয়ে-যাওয়া অভিজাতদের সম্পত্তি সাধারণ লোকের মধ্যে বণ্টন ক'রে দিতে, তাদের এবং গির্জার জমি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করতে, মাইনেপত্রের সর্বনিম্ন সীমানা নির্ধারণ ক'রে দিতে, জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দিতে, সবাইকে সমানভাবে গণ্য করতে, বড়লোকদের কাছ থেকে জোর ক'রে টাকা ধার ক'রে সাধারণের উপকারের জন্য নানা পথ নিতে। রোবসপিয়েরের মৃত্যুর পর নেতৃত্বহীন প্যারিসের শ্রমিকেরা কনভেনশনের উপর প্রভাব হারিয়ে ফেলল। এর শেষ পরিণতি, কনভেনশনের ডিরেক্টরিতে রূপান্তর— যার ফল নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, যাঁর হাতে ফরাসি বিপ্লবের অনেক চিহ্নেরই প্রায় অবলুপ্তি।

ফরাসি বিপ্লবের চরিত্র বুর্জোয়া বলা হয় কেন? কেননা সামন্ততন্ত্রের প্রায় সব চরিত্রই এই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে লুপ্ত হতে শুরু করল। পুরনো ধাঁচের ফরাসি সমাজ নতুন চেহারা নিল। সামন্তদের কাছে কৃষকদের বাধ্যতামূলক দায়-দায়িত্ব আর থাকল না। জমির মালিক হল যে চাষ করে সে; ভোগ্যপণ্যের সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দেওয়া হল, যাতে গরিব লোককে যথেচ্ছ শোষণ করা আর না হয়। চিন্তার স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভাসমিতি করার স্বাধীনতা, আপন ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মচর্চা করার স্বাধীনতা, আদালতে নালিশ করার স্বাধীনতা, শিক্ষার স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে নেওয়া হল। জন্মসূত্রে, বংশসূত্রে অধিকার ভোগ করার সুবিধা আর থাকল না। একুশ বছরের বেশি বয়সের পুরুষের ভোটাধিকার স্বীকার করা হল।

যে জ্যাকোবিনদের হাতে এইসব আমূল পরিবর্তন এল, তারা কিন্তু শেষপর্যন্ত একমত হয়ে থাকতে পারে নি। তখনো ফ্রান্সে শ্রমিকসমাজ সঙ্ঘবদ্ধ নয়, প্রবল নয়। তার সমর্থন জ্যাকোবিনদের প্রতি, কিন্তু সেই সমর্থনের জোর এমন বেশি নয় যে তার স্বার্থেই জ্যাকোবিনরা আগাগোড়া চলবে। রোবসপিয়ের যতদিন জ্যাকোবিনদের চালনা করতে পেরেছিলেন ততদিন ফরাসি বিপ্লব শ্রমিকদের, জনসাধারণের কল্যাণের পথে এগিয়ে চলছিল। কিন্তু ফ্রান্সে তখনো শিল্পবিপ্লবের সমাধা হয় নি, শ্রমিক শ্রেণীর পুরো জন্ম তখনো হয় নি, তাই বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী আপন স্বার্থের দিকে বিপ্লবকে নিয়ে গেল। যে-জনসাধারণের

সাহায্যে বিপ্লব ঘটল সেই জনসাধারণের সম্পত্তির অধিকার কিন্তু স্বীকৃত হল না, সম্পত্তির বৈষম্য থেকেই গেল। বণিকের স্বার্থে, কারখানা-মালিকের স্বার্থেই ক্রমে বিপ্লব এগিয়ে গেল, মুক্ত বাণিজ্য চালু হল, ভোগ্যপণের সর্বোচ্চ দামের সীমা বণিকেরা লঙ্ঘন করলেও শাস্তির হাত থেকে অব্যাহতি পেতে থাকল। শ্রমিকেরা প্রতিবাদ করল, ধর্মঘট করল, কিন্তু পরবর্তী জ্যাকোবিনরা সবলে তা দমন তো করলই, শ্রমিকের মাইনেও কমিয়ে দিল। কৃষকদের উপরেও আবার নানা দাবিদাওয়া শুরু হল। সবই হল বুর্জোয়াদের, উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থে।

৬
শিল্পবিপ্লব : ইংল্যাণ্ড

মানুষের পরিবর্তে বাষ্প দিয়ে যন্ত্র চালানো

শিল্পবিপ্লব শুরু হয়, বলা চলতে পারে, যেদিন থেকে যন্ত্রপাতি চালাতে বাষ্পের সাহায্য নেওয়া হয়— প্রথমে উৎপাদনের জন্য, তারপর যানবাহনের জন্য। আগে যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করা হতো, কিন্তু করত মানুষ তার শারীরিক শক্তি প্রয়োগ ক'রে। গাড়ি টানত মানুষ, বলদ চালাতো মানুষ, পাহাড় সরাতো মানুষ— সবই হতো মানুষ বা পশুর কায়িক শক্তি দিয়ে। তারপর সাহায্যে এল বাতাসের শক্তি, জলের শক্তি। বাতাস নিয়ন্ত্রণ ক'রে, জল নিয়ন্ত্রণ ক'রে মানুষ তার পরিশ্রম বাঁচাতো। কিন্তু বাতাসের গতি অনির্দিষ্ট, ঠিকমতো কাজে লাগানো যায় না। জলের ব্যবহারও অপরিসীম নয়। এইসময় স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে, এবং জেমস ওয়াটের হাতে পিস্টনের সাহায্যে এই ইঞ্জিন চালু হওয়ার পর মানুষের শারীরিক শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন কমে এল। এর ফল হল সুদূরপ্রসারী।

স্টীম ইঞ্জিন তৈরি করতে দরকার হয় কয়লা আর লোহা— স্টীমের জন্য কয়লা, ইঞ্জিনের জন্য লোহা। যেসব দেশে কয়লা আর লোহা বেশি তারাই এই স্টীম ইঞ্জিন প্রয়োগে এগিয়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং ইংল্যাণ্ড প্রথম এগিয়ে গেল।

এই সময়ে শুরু হয় আর একটি প্রবণতার। কাপড় আর ধাতুজ নানা পণ্য উৎপন্ন করার জন্য আবিষ্কৃত হয় নানা দামী যন্ত্রপাতি। এগুলো চালানোর জন্য দরকার সমবেত প্রচুর শ্রমিক। বড়ো বড়ো কারখানা, যা এসব যন্ত্রপাতি কিনে ব্যবহার করতে পারে, তা সবই শহরে। অতএব শ্রমিকেরা সব জড়ো হতে লাগল শহরে।

কিন্তু বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে শ্রমিকের হাতের কাজের চাহিদা কমে এল। অদক্ষ শ্রমিক দিয়েও যন্ত্রপাতি চালানো যায়, যেহেতু মূল শক্তি আসছে

বাষ্প থেকে। অতএব অদক্ষ শ্রমিক, যার শ্রম অনেক সস্তায় পাওয়া যায়, বেশি নিযুক্ত হতে লাগল কারখানায়। দক্ষ শিল্পীর চাহিদাই যে এতে কমতে শুরু করল তাই নয়, মেয়ে আর বাচ্চাদেরও চাকরি জুটতে লাগল কারখানায়। মেয়ে আর বাচ্চাদের মাইনে আরো কম, অদক্ষ পুরুষ শ্রমিকের চাইতেও। কারখানার এবং শ্রম-বাজারের চেহারাই গেল পালটে। শহরের ঘিঞ্জি অঞ্চলে হাজার হাজার শ্রমিকের ভিড় বাড়ল। কাজের চাপ বেশি, মাইনে কম, স্বাস্থ্য খারাপ, অস্বাস্থ্যকর কর্ম-পরিবেশ এবং বসতিস্থান। সমাজের সমস্যার আমূল পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল। কারখানায় কারখানায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে, শ্রমিকের মাইনে কমিয়ে কমিয়ে উৎপাদনের খরচ কমানোর চেষ্টা শুরু হল। একটা শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া গজিয়ে উঠল শ্রমিকের জীবনে।

উৎপাদনের পর যানবাহনে যখন বাষ্প প্রয়োগ শুরু হল, বাষ্পীয় পোত আরম্ভ হল, যাতায়াতে সুবিধা এবং সময়-সংকোচ ঘটল, ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের সমাজের চেহারা তখন আরো পালটাতে শুরু করল। শিল্পে অগ্রসর দেশগুলি বেশি সুবিধা পেতে লাগল, ফলে সেই সেই দেশের লোকজনের চালচলনও পালটালো। সেসব দেশে গজাতে লাগল একদিকে যেমন বৃহৎ শিল্পপতি, তেমনি গড়ে উঠতে লাগল ট্রেড ইউনিয়ন— একদিকে রেলকোম্পানি আর একদিকে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল। এক-একটা দেশের আইন, শৃঙ্খলা, সরকারের ধরনধারণ পালটাতে লাগল নতুন নতুন সমস্যার মোকাবিলার জন্য। আগেকার ঢিলেঢালা সামন্ততান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি এসব সমস্যা মোকাবিলাতে অসমর্থ। ইয়োরোপের দেশে দেশে বিপ্লব ঘটছে, ব্যর্থ হচ্ছে, আর তার জোয়ার এসে লাগছে অন্যান্য দেশে। শ্রমিকজীবনের গ্লানি আর অসন্তোষ ক্রমশ বাড়ছে, সাবেকি চালের সরকার সেসব সমস্যার সুরাহা করতে পারছে না— বিদ্রোহ হচ্ছে, বিপ্লব হচ্ছে— ব্যর্থ হচ্ছে, অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছে।

এই শিল্পবিপ্লবের ফলে শাসকগোষ্ঠীতেও পরিবর্তন আসা শুরু হল। নতুন বণিক ও শিল্পপতিরা ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠছে, যারা টাকা লগ্নি করছে, ব্যবসা করছে, কারখানা চালাচ্ছে সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী শক্তিমান হয়ে উঠছে— তাদের কথা পুরনো শাসকশ্রেণী আমল না দিয়ে পারছে না। পুরনো সামন্ততন্ত্র পুরনো সমাজব্যবস্থা আঁকড়ে পড়ে আছে, আর এই নবোদ্ভূত শিল্পমালিকশ্রেণী, বুর্জোয়া শ্রেণী পুরনো ব্যবস্থা ধ্বংস ক'রে, নতুন সমাজবিন্যাস সংঘটিত ক'রে আপন শ্রেণীর সুবিধা অন্বেষণে ব্যস্ত। ইংল্যাণ্ডে, হল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে এই মুষ্টিমেয় শিল্পপতিরা

ক্রমশই সংখ্যায় বেড়ে চলছে। এদের কাছে পুরনো সামন্তশ্রেণীর অলস জীবন ঘৃণার বিষয়। আরো অর্থ, আরো সাচ্ছল্য, আরো বাজার, আরো উদ্যমের পূজারী এই বুর্জোয়া শ্রেণী তখন পরিবর্তনের পক্ষপাতী। লগ্নি করার জন্য চাই মূলধন, চাই ঋণ। প্রবল তেজের সঙ্গে এরা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, পুরনো আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে অনেক সময় তাল না রেখেই। ফলে ইয়োরোপের নানা দেশে অনেক সময়েই আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিল, ১৮১৬-১৭ সালে, ১৮১৯ সালে, ১৮২৫-২৬ সালে। অর্থনীতি আর রাজনীতিতে সংঘাত দেখা দিতে লাগল। সামন্ততন্ত্র নির্ভর করে কৃষির উপর, বুর্জোয়ারা নির্ভর করে শিল্পের উপর। সামন্ততন্ত্র পুঁজিপতিদের সুচোখে দেখে না, ব্যবসায়ের উপর শিল্পের উপর নানারকম সরকারী বিধিনিষেধ বুর্জোয়াদের ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল। সরকারী শাসনতন্ত্রে তারা নিজেদের বক্তব্য শোনানোর দাবি তুলতে লাগল।

শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকসমাজেরও প্রসার ঘটতে শুরু করল। প্রথম দিকে শিল্পপতিদের সাচ্ছল্যের সঙ্গে শ্রমিকদের অবস্থা ভালো হওয়ার কথা। কিন্তু বুর্জোয়ারা প্রথমদিকে তেমন দূরদর্শী নয়, কেবল আপন লাভের সন্ধানে যে হাঁস ডিম পাড়ে সেই হাঁসকেও না খাইয়ে মেরে ফেলার উপক্রম করল। শ্রমিকদের যত কম মাইনে দিয়ে যত বেশি খাটিয়ে নেওয়া যায়, সেই কেবল তাদের চিন্তা। ফলে শ্রমিকদেরও পক্ষ থেকে চেষ্টা উঠল শাসনতন্ত্রে কীভাবে নিজের কথাটা পৌঁছে দেওয়া যায়। সুতরাং শিল্পবিপ্লবের ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হল। একদিকে ক্রমক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র, অপরদিকে নবোদ্যমী বুর্জোয়াদের এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের শাসনতন্ত্রে আসন দখল করার চেষ্টা। ফলে একই সঙ্গে বুর্জোয়া বিপ্লব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের, সর্বহারাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি।

শিল্পবিপ্লবের জন্য অবশ্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ আসে কোথা থেকে? যে কোনো একটি দেশের ইতিহাস লক্ষ করা যাক। ইংল্যাণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীতে অর্থের সমাগম হতে লাগল বিপুল পরিমাণে। দাস-ব্যবসা থেকে এবং ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন ক'রে ভারতীয় জনগণকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ ক'রে। অবশ্য এই টাকা যে সবটাই শিল্পে লগ্নি হল তা নয়। ইংল্যাণ্ডে তখনো বুর্জোয়া ব্যবস্থা, ধনতন্ত্র পুরো প্রতিষ্ঠা হয় নি, রাজনৈতিকভাবে বুর্জোয়ারা শাসনতন্ত্রে আসা সত্ত্বেও। অভিজাত সম্প্রদায় লুণ্ঠিত অর্থ বিলাসব্যসনেও বহু নষ্ট করে। তবে এর বৃহৎ পরিমাণ বুর্জোয়াদের হাতেই পড়ে, তারা কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে

আরো অর্থের আশায় খনিতে, লোহায় আর উৎপাদনে লগ্নি করে। কয়লা খনির মালিকেরাও, সামন্তশ্রেণীর লোক হয়েও, আত্মরক্ষার তাগিদে বুর্জোয়াদের দেখা-দেখি টাকা নষ্ট না ক'রে শিল্পবিপ্লবে মন দেয়, ছোট ছোট পুঁজিপতিরা তাদের স্বল্প সঞ্চয় শিল্পে কৃষিতে নিয়োগ করে। ল্যাঙ্কাশায়ার তুলোর কারখানায় প্রথমদিকে এই স্বল্প সঞ্চয়ই নিয়োজিত হয়েছিল। কারখানা থেকে যে টাকা আসছিল, বুর্জোয়ারা তা আমোদপ্রমোদে নষ্ট না ক'রে বা কৃষিতে বিনিয়োগ না ক'রে, কারখানার প্রসারেই ঢালছিল।

শিল্পবিপ্লবের আর একটা বৃহৎ কারণ উপনিবেশের প্রসার। বিদেশে উপনিবেশ হবার পর, অনুন্নত দেশগুলোতে আপন পণ্য বিক্রি করার খুব বড়ো সুযোগ পেয়ে গেল উন্নত দেশগুলো। বিরাট বাজার, যত পণ্য ঢালা যায় ততই তা বিক্রি হয়ে যায়। সেইসব উপনিবেশে যাতে এইসব পণ্য না উৎপন্ন হয় তার দিকেও বিশেষ নজর রাখা হল, যাতে প্রতিযোগিতায় না পড়তে হয়। এমন অবস্থা যে অনেকে এও মনে করেন— ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপিত না হলে, ভারতীয় জনগণকে শোষণ করার সুযোগ না পেলে ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটতই না, অর্থাৎ যে যে কারণে ইংরেজ পুঁজিপতিরা শিল্পে টাকা খাটানোর উৎসাহ পেয়েছিল, সেই সেই কারণ উদ্ভূতই হতো না। উপনিবেশ স্থাপনের ফলে ঔপনিবেশিক সরকারও নানা ধরনের শিল্পে অর্থ নিয়োগ করতে লাগল— জাহাজ, অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যদের উর্দি, জুতো, মদ ইত্যাদিতে।

অবশ্য ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের নিশ্চয়ই একটা কারণ তার অভিজ্ঞ শ্রমিকশ্রেণী। বহুদিন ধরে এই শ্রেণী তার কাজ শিখে এসেছে, তার একটা ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে। ফলে শিল্পবিপ্লবের মূল কারণ যখন ঘটল, অর্থাৎ বাইরে বিরাট বাজার এবং বুর্জোয়া সমাজ শিল্পে অর্থ লগ্নি করতে প্রস্তুত, তখন এই অভিজ্ঞ শ্রমিকশ্রেণী সেই বিপ্লবকে সফল ক'রে তুলতে সাহায্য করল। আরো কয়েকটা প্রাকৃতিক কারণও এটাকে সফল ক'রে তুলল। ইংল্যাণ্ডে দুশো বছর আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ গেছে— শীত প্রবল, ফসল ভালো হয় নি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আবহাওয়া ভালোর দিকে যায়। লোকবৃদ্ধিও ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, মৃত্যুহার কমে, আয়ুবৃদ্ধি ঘটে, ফলে খরিদ্দারদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। দেশে যেমন তেমন বিদেশেও— ভারতবর্ষে, চীনে— লোকসংখ্যা স্ফীত হয়েছে, ফলে বিদেশী খরিদ্দারদের সংখ্যাও বেড়েছে। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সোনায় সোহাগা— জন্ম শিল্পবিপ্লবের, প্রসার শিল্পবিপ্লবের। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশও সেইভাবে এগিয়ে চলল।

বলা যেতে পারে, ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব শুরু ১৭৬৫ সালে, যখন 'স্পিনিঙ জেনি', অর্থাৎ সুতো বুনবার চাকা আবিষ্কার হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটা যন্ত্র বেরুল, যার ফলে সুতো বোনার প্রক্রিয়াটিই পালটে গেল। সুতো বুনবার কারখানা শুরু হল ১৭৭০ সালে, শ'য়ে শ'য়ে কর্মী নিযুক্ত হল এইসব কারখানায়। ১৭৮০ সাল নাগাদ ইংল্যাণ্ডে কুড়িটা কারখানা হল, পরের দশ বছরে দেড়শোটা। সুতো বোনার প্রক্রিয়ার সঙ্গে কাপড় বোনার প্রক্রিয়াও পালটে গেল, নতুন যন্ত্র এল। এইসব যন্ত্র চলত জলের সাহায্যে, ফলে কারখানাগুলো হতো নদীর পাশে। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার হল ১৭৮০ নাগাদ, তখন কারখানাগুলো ছড়িয়ে পড়ল দেশময়, শহরে শহরে।

যন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ধাতুর ব্যবহারও বেড়ে গেল। ১৭৮৪ সালে হেনরি কোর্ট আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে ধাতুর ব্যবহার অনেকগুণ বাড়ার সুবিধা পেল। লোহার উৎপাদন দশবছরে দ্বিগুণ হয়ে গেল। একশো বছরের মধ্যে কয়লার উৎপাদন বাড়ল চারগুণ।

সুতো বোনার যন্ত্রের ব্যবহারে যে বিপ্লব শুরু হল, তা ছড়িয়ে পড়ল অন্যান্য উৎপাদনেও। ভারি শিল্প উৎপাদনে, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে। ১৮২৮ সাল নাগাদ ইংল্যাণ্ড নিজের দেশের চাহিদা মিটিয়ে যন্ত্রপাতি রপ্তানি করা শুরু করল। ১৮৪০ সাল নাগাদ যখন ইংল্যাণ্ডে রেলপথ সুপ্রতিষ্ঠিত তখন সেদেশে যন্ত্রশিল্পও সুসংহত। ১৭৬৫ থেকে ১৮৪০, এই হল ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের সময়।

৭
ভারতবর্ষ

একদিকে চাপাটি-পদ্ম অপরদিকে চর্বি-দেওয়া টোটা

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিস্তারের ইতিহাস সাম্রাজ্য-বিস্তারের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। এই ইতিহাস একটি দেশ কর্তৃক অন্য একটি দেশ আক্রমণ ক'রে বিজয়ের ইতিহাস নয়। এটা এমনই একটা ইতিহাস যেখানে ভারতবর্ষের সাধারণ লোক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অভিপ্রায় বুঝতে না পেরে স্বেচ্ছায় নিজের দেশকে আস্তে আস্তে বিদেশীদের হাতে তুলে দিয়েছে। যদি ব্রিটিশ রাজা বা রানীর নামে গোড়া থেকেই এই অভিযান চলত তাহলে সম্ভবত ভারতবাসীরা সাবধান হতে পারত, কিন্তু রাজ্যবিজয় ঘটেছে ব্যবসায়ীদের মারফত। সেই ব্যবসায়ীরা প্রকাশ্যে অবশ্য দেশীয় নৃপতি এবং মোগল বাদশাহের হুকুম অনুযায়ী চলেছে। দেশের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা যেমন সেই রাজাবাদশাহের দরবারের সামান্যতম কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে সুবিধা আদায় করত, ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরাও সেইভাবে ঘুষ দিয়েই সুবিধা আদায় করত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কখনো নিজের নামে হুকুম জারি করত না, করত দেশীয় নৃপতিদের আজ্ঞাবহ হয়েই— তা সে দক্ষিণে কর্নাটকের নবাবের হুকুমবাহী হয়েই হোক বা বাংলাদেশে মুর্শিদাবাদের নবাবের নামেই হোক। বাংলাদেশ অধিকার করার পরও ক্লাইভ দেওয়ানী অধিকারের জন্য দিল্লীর সম্রাটের কাছে আবেদন করেছিলেন এবং বহু বছর সম্রাটের অনুগত প্রজা হয়েই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কাজকর্ম চালাতো। এর ফলে ভারতীয়রা বুঝতেই পারে নি ব্রিটিশরা কার্যত ভারতের শাসনভার নিয়েই ফেলেছে।

ভারতীয়রা ব্রিটিশ শাসনের স্পষ্ট সাম্রাজ্যবাদী রূপ বুঝতে পারল যতদিনে, ততদিনে ভারতবর্ষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। যে ভারতবর্ষ বারংবার বৈদেশিক আক্রমণ সহ্য করেছে, বিদেশী শাসনে শত শত বছর চালিত হয়েছে, দুর্ভিক্ষ মহামারিতে বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে, সেই ভারতবর্ষের মূল কাঠামো, তার গ্রামীণ জীবন কিন্তু কখনো ভেঙে পড়ে নি। কিন্তু

ব্রিটিশ রাজত্বের চরিত্র অন্যরকম। এই রাজত্বে শুধু ভারতের রাজনীতি নয়, পুরো অর্থনীতিই বদলে গেছে, যার ফলে পুরো ভারতবর্ষের চেহারাটাই পালটে গেল। পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশো বছর পর ভারতীয়রা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ইতিহাসে সেই বিদ্রোহ 'সিপাহীবিদ্রোহ' নামে পরিচিত।

এই বিদ্রোহকে অবশ্য অনেকে সিপাহীদের 'বিদ্রোহ' বলে ভাবতে অস্বীকার করেন। সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের সূচনা ঘটেছিল, কিন্তু সেখানেই তা আটকে থাকে নি— তা ছড়িয়ে পড়ে ভারতীয় কৃষকদের মধ্যে, যারা ব্রিটিশ শাসনে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। সিপাহীরাও সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নি, করলে ১৮৫৭ সালেই ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হতো। হিসেবে দেখা গেছে সত্তর হাজার সিপাহী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তিরিশ হাজার ছিল নিষ্ক্রিয়, আর তিরিশ হাজার ব্রিটিশদের হয়ে লড়েছিল। আবার অন্যদিকে এই বিদ্রোহ কেবল ব্যারাকে ব্যারাকেই আবদ্ধ ছিল না, হলে ব্রিটিশ শাসকেরা উন্মত্ত হয়ে সমস্ত দেশ জুড়ে তাণ্ডবলীলা চালাতো না, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিত না, গাছে গাছে বিদ্রোহীদের ফাঁসি দিয়ে লটকে রাখত না। এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল ভারতবর্ষের রাজ্যহারা রাজা ও রানীর দল, জমিহারা জমিদারের দল, জমিহারা কৃষক, জীবিকাহারা কারিগর শ্রমিক মোল্লা পুরোহিতের দল। এই বিদ্রোহের চরিত্র ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক বারবার বিকৃতভাবে বিবৃত হয়েছে। ভারতের রাজ্যচ্যুত রাজা আর জমিদারেরা এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব করলেও, সিপাহীরা যুদ্ধের অগ্রে অবস্থান করলেও মূলত উত্তর ভারত জুড়ে এই বিদ্রোহের কেন্দ্রশক্তি হিসেবে কাজ করেছে ভারতের শোষিত কৃষকশ্রেণী। বহু স্থানে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করার আগেই জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এমন একটা অবস্থা আসে যখন গঙ্গা আর যমুনার মধ্যে বসবাসকারী এমন কোনো হিন্দু বা মুসলমান ছিল না যারা বিদ্রোহ করে নি। উত্তর ভারতের অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড, সগর ও নর্মদা প্রদেশে জনসাধারণের প্রায় সকল অংশই বিদ্রোহে অংশ নেয়। বিহারের পশ্চিমাঞ্চলে, আগ্রা, মীরাট, পাঁটনায় সিপাহী এবং জনসাধারণ একই সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহীদের মধ্যে ধর্ম বা জাতিগত ভেদাভেদ ছিল না, সকলের লক্ষ্য ছিল অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসনের অবসান। গ্রামাঞ্চলে কে বিদ্রোহী আর কে নয়, বুঝতে না পেরে গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বন্দুকের অভাবে কৃষকরা বল্লম কাস্তে নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়েছিল। ব্রিটিশ

সৈন্যবাহিনী পারাপার করার জন্য মাঝি পাওয়া যেত না, ১৮৫৮ সালে পতনের আগে পর্যন্ত বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর জন্য রসদ পাওয়া যায় নি। দিল্লী পতনের পর লক্ষ্ণৌ পতনের সময় লক্ষ্ণৌ রক্ষার জন্য অগণিত কৃষক প্রাণ দিয়েছিল, লক্ষ্ণৌ ও কানপুরের মধ্যবর্তী মিয়াঁগঞ্জের যুদ্ধে যে আট হাজার বিদ্রোহী যুদ্ধ করেছিল তার সাত হাজার ছিল কৃষক। আর সিপাহীদের মধ্যেও যারা এই দুইবৎসরব্যাপী বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল তারাও ছিল মূলত কৃষক, কৃষিকর্ম থেকে উৎখাত হয়ে চাকরির জন্য সিপাহী হতে তারা বাধ্য হয়েছিল।

ইংরেজরা যে নতুন কৃষিব্যবস্থা কায়েম করেছিল সেই দুঃসহ ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই এই বিদ্রোহ। তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল রাজ্যচ্যুত ভূস্বামীরা। কৃষকরা শুধু যে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছিল তা নয়, যেসব জমিদার ইংরেজদের তাঁবেদার হয়ে শোষক শ্রেণীর অংশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছিল তাদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছিল। বিদ্রোহে তাদের অংশগ্রহণের ফলেই সিপাহীদের সাধারণ বিদ্রোহ ভারতবর্ষে একটি জাতীয় সশস্ত্র বিপ্লবের আকার ধারণ করে বলে অনেকে মনে করেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই বিরাট বিপ্লবের চরিত্র ভারতীয়রাই অনেকে ঠিক বুঝতে পারে নি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজ শাসন মঙ্গলের হবে এই ভুল ধারণায় অনেকে বিদ্রোহীদের সমর্থনে আসে নি। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা কৃষকদের বিরুদ্ধেই গিয়েছিল।

বিদ্রোহীদের প্রাথমিক সাফল্যের পর, যখন জনসাধারণ অত্যাচারী জমিদার-দের হাত থেকে জমি কেড়ে নিতে শুরু করে, ধনী লোকের সম্পত্তি লুঠ করা শুরু করে, সরকারী দলিল-দস্তাবেজ পুড়িয়ে ফেলতে শুরু করে, বেনিয়াদের উৎখাত করা শুরু করে, তখনই বিপ্লবী কৃষকের অভ্যুত্থানে ভীত হয়ে জমিদার তালুকদার সাহুকারেরা বিদ্রোহের পথ ছেড়ে ইংরেজদের সঙ্গে আপস করা ছাড়া পথ পায় না। ব্যবসায়ী মহাজনেরা ইংরেজদের পক্ষ নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। যে অর্থনীতিতে তাদের সুবিধা হবে না, সেই অর্থনীতি কায়েম করার জন্য তারা স্বভাবতই বিদ্রোহীদের সাহায্য করবে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীও তার স্বার্থরক্ষার জন্যই কৃষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে চলে গিয়ে ইংরেজদের সমর্থন করা আরম্ভ করে। কৃষক সিপাহীদের মধ্যে তখন সচেতন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল না, সঙ্ঘবদ্ধ বিপ্লবী প্রয়াস ছিল না, তারা নির্ভর করেছিল রাজ্যচ্যুত সামন্তদের উপর। সুতরাং ভারতের প্রথম জাতীয় বিপ্লব ব্যর্থ হয়।

বিদ্রোহের স্ফুরণ হয় সিপাহীদের মধ্যে একথা সত্য। তার কারণ তাদের মধ্যে ক্রমাগত অসন্তোষ। ব্রিটিশ শাসকদের দুটো নীতির জন্য এই অসন্তোষ প্রবল আকার ধারণ করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথমদিকে বড়ো বড়ো জমিদার সৃষ্টি করার পক্ষপাতী ছিল, আশা ছিল বড়ো জমিদারেরা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভ হয়ে কাজ করবে। কিন্তু ১৮৫৫ সাল নাগাদ কোম্পানির এই নীতি কিছু পালটায়। তখন জমিদারেরা এত বেশি প্রতাপশালী হয়ে উঠছিল যে ব্রিটিশ কর্তাদের ভয় হল জমিদাররাই ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে দেবে। ফলে কোম্পানি তৎপর হয়ে উঠল ক্রমাগত স্বাধীনচেতা জমিদারদের জমিচ্যুত করার জন্য। কোম্পানির দ্বিতীয় নীতিটি সিপাহীদের কাছে আরো সন্দেহের কারণ হয়ে উঠল। লর্ড ডালহৌসি তখন একটার পর একটা প্রদেশ অধিকার ক'রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত ক'রে চলছিলেন। ভারতবর্ষে তখন সামন্ততন্ত্র, অর্থাৎ কৃষকদের প্রাথমিক আস্থা তখন জমিদারদের উপরেই, দেশ বা জাতির নামে তাদের কাজে উদ্দীপ্ত করা যায় না। কৃষকেরা যখন দেখল ব্রিটিশ সরকার একটার পর একটা প্রদেশে সামন্তদের রাজ্যচ্যুত করছে, ভূস্বামীদের জমি থেকে বিতাড়িত করছে, তখন তাদের কাছে ব্রিটিশ শাসকদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল। এই সন্দেহ ঘন হল যখন কোম্পানি অযোধ্যাও অধিকার করে। অযোধ্যা সত্তর বছর ধরে কোম্পানির একনিষ্ঠ সেবা ক'রে এসেছে, তা সত্ত্বেও যখন অযোধ্যাতেও রাজার পতন ঘটল তখন ইংরেজ-দের প্রতি সিপাহীদের অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠল। অযোধ্যার পতনের ফলে বাংলাদেশের সিপাহীদের ক্রোধই হল সবচেয়ে বেশি, কারণ এইসব সিপাহীরা বেশির ভাগ এসেছিল অযোধ্যা থেকে।

অবশ্য এই রাজনৈতিক অসন্তোষের পিছনে আরো নানাবিধ অসন্তোষও ছিল, যার মধ্যে প্রধান হল ধর্মীয় অসন্তোষ। হিন্দু এবং মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের সিপাহীদের নানা ঘটনায় ক্রমাগত ধারণা জন্মাচ্ছিল যে ব্রিটিশ সরকার তাদের খ্রীস্টানে পরিণত করতে চায়। সিপাহীদের কপালে তিলক কাটা চলবে না, বিশাল দাড়ি রাখা চলবে না, গোঁফ ছোট করতে হবে, পাগড়ির ধরন পালটাতে হবে, ইত্যাকার বিধানে তাদের ধর্মীয় সংস্কারে আঘাত লাগছিল। পেটের দায়ে তারা সিপাহী হয়েছে, কিন্তু তাই বলে ধর্ম ছাড়তে তারা রাজি নয়। ১৮২৫ সালে হিন্দু সিপাহীদের বলা হল ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ করতে। তারা স্থলপথে ব্রহ্মদেশে যেতে রাজি, কিন্তু আদেশ হল জলপথে যেতে। হিন্দু সিপাহীদের কাছে সমুদ্রযাত্রার আজ্ঞা

প্রায় ধর্মত্যাগের নির্দেশ। এর পরে এল সতীদাহ প্রথার অবলুপ্তি। সিপাহীরা আবার সন্দেহ করল ব্রিটিশ শাসকরা তাদের ধর্মে বড়ো বেশি হাত দিচ্ছে। হিন্দু সিপাহীদের সন্দেহ মুসলমান সিপাহীদের মধ্যেও প্রসারিত হতে দেরি হল না। মিশনারিরা তখন প্রকাশ্যেই জনসাধারণকে প্ররোচিত করছে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য— নানা সুবিধার প্রলোভন তারা দিয়ে যাচ্ছে প্রকাশ্য জনসভায়। এরই মধ্যে ব্যারাকে ব্যারাকে হুকুম হল সব সিপাহীদের একই সঙ্গে খেতে হবে।

ধর্মীয় সন্দেহ ছাড়াও সিপাহীদের আরো নানা অভাব অভিযোগ ছিল। মাইনে তাদের অত্যন্ত কম, মাসে সাত টাকা মাত্র। পাশাপাশি ইংরেজ সৈন্যরা অনেক বেশি মাইনে পায়, যদিও কাজ একই। সামরিক অফিসাররা অত্যন্ত উদ্ধত ব্যবহার করে। সামান্য কারণে সিপাহীদের গুরু শাস্তি দেওয়া হয়। ভারতীয় মহিলাদের ইংরেজ অফিসাররা যথেচ্ছ ব্যবহার করে সিপাহীদের সামনেই। ভারতীয় অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয় না।

সিপাহীবিদ্রোহ যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে হতো, সামন্তরাজারা যদি দৃঢ় পরিকল্পনা নিয়ে ইংরেজদের উৎখাত করার প্রয়াসে নামত, তাহলে হয়ত বিদ্রোহ সফল হতে পারত। কিন্তু সমস্ত দেশ জুড়ে এই সিপাহীদের সঙ্ঘবদ্ধ করা তখন সম্ভব হয় নি, কেউ চেষ্টাও করে নি। বিদ্রোহ হল, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে।

বিদ্রোহের প্রথম ঘটনা ঘটে ব্যারাকপুরের ব্যারাকে। মার্চ মাস। জনৈক ইংরেজ কর্মচারী ব্যারাক দেখতে এসে অপমানিত বোধ করল, সিপাহীরা তাকে যথেষ্ট সম্মান দেখাচ্ছে না। ক্রুদ্ধ ইংরেজ একটি সিপাহীকে ঘুষি লাগালে মঙ্গল পাণ্ডে নামে আর এক সিপাহী সেই উদ্ধত ইংরেজকে গুলি ক'রে মারল। সমস্ত ইংরেজ অফিসার সৈন্য তাড়া ক'রে এসে ব্যারাক থেকে মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার ক'রে, সাতদিন পর ফাঁসি দিল। মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে দাবানল ছড়িয়ে পড়ল। ব্যারাকপুরে, বহরমপুরে, চট্টগ্রামে। কিন্তু পরিষ্কার কর্মপদ্ধতি, সুযোগ্য নেতা, জনগণের সঙ্গে সংযোগ ইত্যাদির অভাবে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে বিদ্রোহী সিপাহীরা পরাজিত হল, নিশ্চিহ্ন হল।

বাংলাদেশের পর উত্তর আর মধ্য ভারত। মীরাটের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে মীরাটের সমস্ত ইংরেজ হত্যা ক'রে দিল্লীর পথে অগ্রসর হয়। সঙ্গে যোগ দেয় কৃষকেরা। রেল লাইন উপড়ে ফেলে, টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়ে, ইংরেজদের ব্যারাক ভেঙে দিয়ে তারা যোগ দিল সিপাহীদের সঙ্গে। তারা ঘোষণা করল, দিল্লীর সিংহাসন-হারা মোগলসম্রাট বাহাদুর শাহই ভারতের সম্রাট।

মীরাটের একমাস পর কানপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহ করল গদিচ্যুত পেশোয়া নানাসাহেবের নেতৃত্বে। অযোধ্যা, রোহিলখণ্ডের সিপাহীরা বিদ্রোহ করল অযোধ্যার বেগমের নেতৃত্বে। মধ্যভারতে ঝাঁসীর গদিচ্যুত রানী লক্ষ্মীবাই, বিহারের কুমার সিংহ নামে জায়গীরদার পাটনায় এবং শোলাপুর ও কাল্পীর রাজা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহীদের পরিচালনা করলেন। এছাড়া আম্বালা, মীরাট, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, রুড়কি, কাশী, আজমগড়, জৌনপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, ফতেপুর, বিঠুর, জিয়ামী, ফিরোজপুর, গোবিন্দপুর, পেশোয়ার, ঝিলাম, শিয়ালকোট, দানাপুর, আরা, জগদীশপুর, আটক, মৈনপুর, সাহারানপুর, বদায়ুন, ইন্দোর, ফৈজাবাদেও সিপাহীরা বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্রোহ করল।

বিদ্রোহ দমনে ইংরেজরা বেশিদিন সময় নেয় নি। নানাসাহেবের সেনাপতি তাঁতিয়া তোপী হেরে গেলেন হ্যাভলকের কাছে, কানপুর চলে গেল আবার ইংরেজদের কবলে। তিনমাস যুদ্ধ ক'রে বাহাদুর শাহ দিল্লী হারালেন। হ্যাভলক আর আউটরাম লক্ষ্ণৌ দখল ক'রে নিলেন।

এর পর শুরু হল ইংরেজ সিপাহীদের পৈশাচিক বর্বরতা। যখনই কোনো শহর তারা পুনর্দখল করে, সেই শহরের স্ত্রীপুরুষ শিশুবৃদ্ধ নির্বিচারে তারা খুন করে। দিল্লীতে পাঁচদিন ধরে রাস্তায় যে কেউ বেরিয়েছে সেই ইংরেজদের গুলিতে মরেছে। বাহাদুর শাহের তিন পুত্র নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেয়ে আত্মসমর্পণ করলে তাদের গুলি ক'রে মারা হল। দিল্লীতে প্রায় ছয় হাজার লোককে মেরে রাস্তায় রাস্তায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল এই সময়।

কানপুরের যুদ্ধে হেরে গিয়ে নানাসাহেব আবার অযোধ্যা আক্রমণ করলেন। লক্ষ্ণৌ-এর পথে হ্যাভলকের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত ক'রে, তাঁতিয়া তোপীর সহায়তায় কানপুর জয় ক'রে তিনি নিজেকে পেশোয়াপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ঝাঁসীর রানী এদিকে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। তাঁতিয়া তোপী গেলেন তাঁর সাহায্যে, কিন্তু পারলেন না। তাঁরা গোয়ালিয়র দুর্গ দখল ক'রে আবার চেষ্টা করলেন ইংরেজদের হাত থেকে হৃতরাজ্য উদ্ধার করতে। গোয়ালিয়রের যুদ্ধে লক্ষ্মীবাই নিহত হলেন। তোপী পালাতে চেষ্টা করলেন সৈন্যদের নিয়ে, কিন্তু সৈন্যরা বিধ্বস্ত হল। তোপী ধরা পড়লেন, ফাঁসি হল। নানাসাহেব নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। সিপাহীদের প্রধান পরামর্শদাতা অজিমুল্লা খাঁ ধরা পড়ে নিহত হলেন।

এদিকে পাটনাতেও সিপাহীরা নিস্তেজ হয়ে পড়ল। কুমার সিংহ পাটনা, আরা, দানাপুরে দীর্ঘদিন ধরে সুযোগ্য নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ইংরেজদের কোষাগার,

অস্ত্রাগার বিদ্রোহীদের কবলে। আরার দুর্গ কুমার সিংহের করতলগত। কিন্তু আরাতেই কুমার সিংহ পরাজিত হলেন ইংরেজদের এক বিরাট বাহিনীর কাছে। আরা ত্যাগ ক'রে কুমার সিংহ আজমগড় দখল করলেন। মান্নাহারে আবার তাঁর পরাজয়, গুরুতর আঘাত। জগদীশপুরে আহত অবস্থাতেই তিনি সিপাহী-দের পরিচালন ক'রে ইংরেজদের পরাজিত করেন, কিন্তু অতর্কিত গুলিতে তিনি প্রাণ দিলেন। সিপাহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

১৮৫৭-৫৮ সালে বিদ্রোহের প্রথম বারো মাসে তিরিশ হাজার বিদ্রোহী সিপাহী যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। দুই বছরে যুদ্ধে নিহত, বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, ইংরেজ বর্বরতায় নিহত লোকের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ।

ভারতের এই প্রথম জাতীয় মুক্তি বিপ্লব ব্যর্থ হল, কারণ শ্রমিক-কৃষক-সৈন্যকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কোনো নেতৃত্ব তৈরি হয় নি, এগিয়ে আসে নি। এই বিপ্লবীরা জনসাধারণকে তাদের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি, জাতীয়তা বোধটিকে জাগ্রত করতে পারে নি। যোগ্য সেনানায়কের অভাবে, অনেক সময় সেনানায়কের বিশ্বাসঘাতকতায়, অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে ও ইংরেজ সামরিক শক্তির পরাক্রমে বিপ্লব ব্যর্থ হল।

সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন আজও হয় নি। অনেক সত্যমিথ্যা গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল এই বিদ্রোহ নিয়ে। যেমন চাপাটি আর পদ্মের গল্প। বিদ্রোহের আগে নাকি সমস্ত ভারতবর্ষে কে বা কারা গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে চাপাটি আর লাল পদ্ম বিলি করত। যে চাপাটি আর লাল পদ্ম পেত তাকে বলা হতো আরো পাঁচটা চাপাটি আর পদ্ম সে যেন পাশের পাঁচটা গ্রামে পাঠিয়ে দেয়। যব বা গমের আটা দিয়ে বানাতে হবে চাপাটি, সেগুলো হবে হাতের তালুর মতো, ওজনে দুই তোলা। মারাঠা শক্তির পতনের পর এভাবে রুটির টুকরো পাঠিয়ে দেওয়া হতো গ্রামে গ্রামে কোনো গূঢ় নির্দেশ দিয়ে। সরকারী অফিসাররা খুবই সন্দেহের চোখে দেখত এই চাপাটি বিলির ব্যাপারটা— চাপাটি যেন বিদ্রোহের বাণী বহন ক'রে দেশময় পরিব্যাপ্ত ক'রে দিচ্ছে।

আর রটেছিল, গোরু আর শুয়োরের চর্বি মাখানো টোটার গল্প। এমন টোটা দাঁত দিয়ে কাটতে গেলে হিন্দু-মুসলমান সব সিপাহীরই জাত যাবে। দমদম, ব্যারাকপুর আর মীরাটের সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয় নাকি এমনই টোটা ব্যবহারের বিরুদ্ধে।

সত্যমিথ্যা যাই হোক, একথা সত্য ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সিপাহীদের বিক্ষোভ

জমা হচ্ছিল বহুদিন ধরেই। এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলক্ষ নিয়েই হয়ত তার প্রকাশ হয়ে থাকতে পারে।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় বিভিন্ন অঞ্চলের নেতাদের নাম কিংবদন্তীর মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন ফৈজাবাদের বিপ্লবী মৌলবী, আহমদ শাহ। বিখ্যাত ইংরেজ সেনাপতি স্যার কলিনের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধের সময়ই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল তিনি শুধু মৌলবীই ছিলেন না, অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন রণনেতাও ছিলেন। উত্তর ভারতে ইংরেজদের সবচাইতে দুর্ধর্ষ শত্রু এই বিপ্লবী আহমদ শাহের পতনের পর, পঞ্চাশ হাজার টাকার লোভে পাওয়েনের রাজা তাঁকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দেবার পর, সাহেবরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

এমনই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঝাঁসীর রানী, অযোধ্যার বেগম, তাঁতিয়া তোপী, নানা সাহেব, আজিমুল্লাহ খান, অযোধ্যার উজীর আলী নকী খাঁ, বিহারের কুমার সিং। তবে নেতার চাইতেও বড়ো ছিল বিদ্রোহী জনতা। ঝাঁসীর রানী যখন চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, মেরী ঝাঁসী দুংগী নেহী, সে সময় তাঁর পেছনে ঝাঁসীর আপামর জনতা ছিল বলেই তিনি তেমন কথা বলতে পেরেছিলেন। পরিবর্তে ব্রিটিশরাজ ভারতবর্ষকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে গিয়েছিল, যার কিছু মর্মান্তিক দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন কবি মীর্জা গালিব: 'সম্মুখে আমার রক্তের মহাসমুদ্র, খোদা-ই শুধু জানেন আমাকে আরো কত কী দেখতে হবে! কোনোখানে নেই আশার লেশ, কোনোখানে নেই সুন্দরের আভাস, মরণের দিন স্থির হয়েছে—সারারাত কেন কারো চোখে ঘুম নামে নি!'

৮

রাশিয়া

পৃথিবী কাঁপানো দশদিন

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় যে ঘটনাস্রোতের প্রবাহ পুরো দেশের চেহারাই শুধু নয়, সমস্ত পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেহারা পালটে দিয়েছিল, সেই ঘটনাস্রোতের সামান্য পরিচয় যদি সংক্ষেপে দিতে হয়, তাহলে বলা যায় :

মার্চ মাসে পেট্রোগ্রাড শহর অশান্ত হয়ে উঠল ধর্মঘটে আর শোভাযাত্রায়। রাজ্য 'ডুমা' কমিটি এবং পেট্রোগ্রাডে কর্মী প্রতিনিধিদের 'সোভিয়েট' তৈরি হল। অস্থায়ী সরকার গঠন করলেন প্রিন্স লিভভ। দ্বিতীয় নিকোলাস মাইকেলের উপর শাসনভার দিয়ে পদত্যাগ করলেন, মাইকেলও পদত্যাগ করলেন। পেট্রোগ্রাড-সোভিয়েট আহ্বান জানালেন প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে রাশিয়ার সরে আসার জন্য। ১৬ এপ্রিল লেনিন এসে পৌঁছলেন পেট্রোগ্রাডে। তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর 'এপ্রিল থীসিস'। এদিকে অস্থায়ী সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী জানালেন, রাশিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এই ঘোষণায় পেট্রোগ্রাড আবার অশান্ত হয়ে উঠল। পেট্রোগ্রাড-সোভিয়েটকে আহ্বান জানালেন প্রিন্স লিভভ অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে যোগ দিতে। অস্থায়ী সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী এবং যুদ্ধমন্ত্রী দুজনেই পদত্যাগ করলেন। মে মাসে ট্রটস্কি এসে পৌঁছলেন রাশিয়ায়। ১৮ মে প্রিন্স লিভভ অস্থায়ী যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠন করলেন। এতে যোগ দিলেন মেনশেভিকরা আর সোশ্যালিস্ট রিভোলিউশনারিরা। এর যুদ্ধমন্ত্রী কেরেনস্কি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পেট্রোগ্রাডে আবার অশান্তি, বলশেভিকেরা প্রচণ্ডভাবে সরকারী ঘোষণার বিরোধিতা করল। 'ক্যাডেটে'রা সরকার থেকে বেরিয়ে গেল। ১৬ থেকে ১৮ জুলাই পর্যন্ত বলশেভিকরা রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা ক'রে অস্থায়ী সরকারের বিরোধী প্রচার চালালো, সরকার সৈন্য দিয়ে তা দমন করল। লেনিন, জিনোভিয়েভ এবং অন্যান্য বলশেভিকেরা আত্মগোপন করলেন। ২১ জুলাই কেরেনস্কি প্রধানমন্ত্রী হলেন,

দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হল। ট্রটস্কি গ্রেপ্তার হলেন। সরকার মস্কোতে রাজ্যবৈঠক ডাকলেন। পেট্রোগ্রাড-সোভিয়েটও বলশেভিক মতকে সমর্থন জানালেন। এদিকে জেনারেল কর্নিলভ সৈন্য নিয়ে পেট্রোগ্রাড দখল করতে এগিয়ে এলেন, কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। ১৯ সেপ্টেম্বর মস্কো সোভিয়েটেও বলশেভিকদের জয় হল। পেট্রোগ্রাড-সোভিয়েটের সভাপতি নির্বাচিত হলেন ট্রটস্কি। ৮ অক্টোবর আবার অস্থায়ী যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হল। ২৩ অক্টোবর লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নিল সশস্ত্র সংগ্রামের, যদিও দুই বলশেভিক নেতা কামেনিয়েভ আর জিনোভিয়েভ এতে আপত্তি জানালেন। ২৫ অক্টোবর পেট্রোগ্রাড-সোভিয়েট মিলিটারি রিভলিউশনারি কমিটি গঠন করল। সশস্ত্র সংগ্রামের আয়োজন সম্পূর্ণ। অস্থায়ী সরকার এর মোকাবিলা করতে বদ্ধপরিকর। ৬ নভেম্বর লেনিন আত্মপ্রকাশ করলেন। ৭ নভেম্বর দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হল, বলশেভিকদের নেতৃত্বে। এঁদের দমন করার জন্য কেরেনস্কি পেট্রোগ্রাড ছেড়ে চলে গেলেন। পেট্রোগ্রাডে অস্থায়ী সরকারের পতন হল। ৮ নভেম্বর সোভিয়েট সরকার শান্তিচুক্তি এবং ভূমিসংস্কার ঘোষণা করল। রাশিয়ায় সোভিয়েট বিপ্লব সফল হল— নতুন দিনের শুরু।

বলা বাহুল্য, রাশিয়ার ইতিহাসের নতুন পাঠকের কাছে ১৯১৭ সালের এই তথ্যপঞ্জি একটা বিরাট ধাঁধা মনে হবে। কে কীজন্য কার বিরুদ্ধে লড়াই করছে, শত্রু কে মিত্র কে, ঘটনাপ্রবাহ সামান্য এদিক হলে ঘটনার গতি কোন কোন দিকে যেত বা যেতে পারত ইত্যাদি কিছুই বোঝা গেল না এই ঘটনাপঞ্জি থেকে। সুতরাং ব্যাপারটির আর একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস রাশিয়ার জার অর্থাৎ সম্রাট ছিলেন ১৮৯৪ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত। দুর্বল চরিত্রের লোক তিনি, কিন্তু সম্রাটের একচ্ছত্র অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সমস্ত রাশিয়া তিনি একাই শাসন করবেন, এই তাঁর বাসনা। তিনি বিয়ে করেছিলেন ইংল্যাণ্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়ার এক নাতনীকে, নাম তাঁর আলেকজান্দ্রা। ইনি আবার সম্রাটের ক্ষমতা সম্পর্কে নিকোলাসের চাইতেও বেশি স্পর্শকাতর। এই দুই ধর্মভীরু সম্রাট আর সম্রাজ্ঞী চলতেন আবার রাসপুটিন নামে সমস্ত রাশিয়ায় কুখ্যাত এক লম্পট সন্ন্যাসীর কথামতো। মনে হয়, এই গ্রাম্য সন্ন্যাসীটির অসামান্য যাদুশক্তি ছিল এবং নিকোলাসের বালকপুত্রকে অসুখ থেকে সারিয়ে দেবার পর ১৯১৭

সাল পর্যন্ত পুরো রাজদরবারের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তিনি। রাজার অমাত্য নির্বাচনও হতো তাঁর খেয়ালখুশিমতো। তাঁর সুরাসক্তি, লাম্পট্য এবং রাজনৈতিক ব্যভিচার কিন্তু সমস্ত অমাত্যদেরও ক্রোধের কারণ হয়ে উঠেছিল এবং এটা সকলেই জানতেন, প্রথম সুযোগ এলেই তাঁরা রাসপুটিনকে হত্যা করতে দ্বিধা করবেন না।

রাশিয়ায় গণতন্ত্র প্রসারে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নিকোলাসের ছিল না। শিল্পে ক্রমাগত অশান্তি, বছরের পর বছর ফসলের অভাব এবং ১৯০৫ সালে জাপানের হাতে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয়ের পর অবশ্য রাশিয়ায় এক বিপ্লবাত্মক অবস্থা তৈরি হয়েছিল। তখন নিকোলাস বাধ্য হয়েই ডুমা প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'ডুমা' অর্থাৎ সংসদ ভোটাধিকারবলে তৈরি হয় প্রথম ১৯০৬ সালে। কিন্তু নিকোলাস ইচ্ছা করলে নিজে থেকে আইন বানাতে পারবেন, এমন একটা শর্ত রাখলেন। ডুমার আর্থিক ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ রাখা হল। ১৯০৬ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত মোট চারবার ডুমা নির্বাচিত হয়েছিল। মোটামুটি কয়েকটি সংস্কার এই ডুমার মাধ্যমে হয়েছিল বটে, কিন্তু যতই দিন এগুতে লাগল এটা পরিষ্কার হয়ে উঠল যে রাশিয়ার ক্রমাগত শোচনীয় অবস্থা সমাধানে ডুমা হয় অচল অথবা ডুমার প্রতিনিধিরা সেই সমাধানে রাজি নন।

অবস্থা যে সঙিন তার আঁচ পাওয়া গিয়েছিল ১৯০৫ সালেই। নিকোলাস সাংবিধানিক সরকার চালাতে ইচ্ছুক নন। কৃষকরা ফসলের দুর্বিপাকে আধপেটা খেয়ে আছে। শিল্পসংস্থায় উৎপাদন ঠিকমতো হচ্ছে না। এইসব পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বারুদ হয়ে জমছিল, বিস্ফোরণ ঘটল ক্ষুদ্র জাপানের হাতে বিরাট রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে। ২২ জানুয়ারি, ১৯০৫। এক রবিবার রাশিয়ার শ্রমিকরা পেট্রোগ্রাডের রাস্তায় শোভাযাত্রা বার করল জারের শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে। শান্ত এই শোভাযাত্রার উপর জারের সৈন্যরা গুলি চালালো। এই দিন বিখ্যাত হয়ে আছে 'রক্তাক্ত রবিবার' নামে। এই শ্রমিকদের সঙ্গে ছিলেন তাঁদের স্ত্রীপুত্রকন্যারা। গাপন নামে এক পাদ্রির নেতৃত্বে তারা জারের প্রাসাদ অভিমুখে যাচ্ছিল শুধু রাজবন্দীদের মুক্তির আবেদন নিয়ে, কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা নিয়ে, আর কাজের সময় দিনে আট ঘণ্টা করার দাবি জানাতে। গুলিচালনার ফলে প্রায় সাতশো পুরুষ-মেয়ে-বাচ্চা নিহত হল। রক্তাক্ত রবিবার থেকে শুরু হল রাশিয়ার শহরে শহরে অগ্ন্যুৎপাত, যা ইতিহাসে পরিচিত হয়েছে '১৯০৫ সালের বিপ্লব' নামে।

শহরে শহরে জনবিক্ষোভ লক্ষ ক'রে নিকোলাস অবশ্য ডুমা প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে বিক্ষোভ আরো বেড়ে গেল। ধর্মঘট, ক্ষেতখামারে শহরে বন্দরে চোরাখুন অনেক বেশি আকারে দেখা দিল। কৃষ্ণসাগরে একটি নৌজাহাজে, পটেমকিন তার নাম, নৌবাহিনী বিদ্রোহ করল। আক্টোবর ২০ থেকে ৩০ পর্যন্ত সমস্ত রাশিয়া অচল হয়ে গেল রাশিয়া-বন্ধ্ ডাকে। শ্রমিকরা সোভিয়েট তৈরি করল, তারাই এই বন্ধের ডাক দিয়েছিল। ভয় পেয়ে নিকোলাস তাড়াতাড়ি ডুমা প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা নিলেন এবং রাশিয়ার ইতিহাসে প্রথম একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের কথা বললেন। এই প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন যিনি, তাঁর নাম সার্জ উইটি। জারের এই ঘোষণার ফলে বিপ্লবীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল, একদল চাইল জারের সংস্কারগুলো মেনে নিতে, আর একদল কিন্তু বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে। সুযোগ বুঝে জার তাঁর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন, বিশেষ ক'রে গ্রামাঞ্চলে। শহরের রাস্তাগুলো বিদ্রোহীদের পারস্পরিক হানাহানির ফলে রক্তাক্ত হয়ে উঠল। বিপ্লবের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল, জারের শাসন আরো কড়া হয়ে উঠল।

এখানে বোধহয় পারস্পরিক হানাহানির চরিত্রটা বোঝানোর জন্য রাশিয়ার রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে সামান্যকিছু পরিচয় দেওয়া ভাল।

মনার্কিস্ট বা অক্টোব্রিস্টরা ছিল জারের অনুগত, পরের দিকে এরা ক্যাডেট-দের সঙ্গে যোগ দেয়। 'ক্যাডেট' নামটার উৎপত্তি এই দলের নামের পাঁচটি প্রথম অক্ষর থেকে। এরা চাইত সংসদীয় গণতন্ত্র। সম্পত্তিশালী লোকেরা ছিল এর সভ্য, চাইত সংস্কারের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র স্থাপন করতে। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে বিপ্লব শুরু হলে এরাই সরকার গঠন করেছিল।

মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করত যারা, তারা রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠা করেছিল রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক লেবার পার্টি। ১৯০৩ সালে পার্টি-কংগ্রেসে মতবিরোধিতার ফলে এই পার্টি দুদলে ভেঙে যায়। লণ্ডনের এই কংগ্রেসে পার্টির মুখপত্র ইস্ক্রা (অগ্নিশিখা) কে চালাবে, এর উপর ভোটাভুটিতে এই ভাঙাভাঙি হয়। যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় তারা 'বলশেভিক' নামে পরিচিত, সংখ্যা-লঘিষ্ঠরা 'মেনশেভিক' নামে— যদিও অন্যান্য প্রশ্নে বলশেভিকরা হেরে যায়। বলশেভিকরা আসলে বরাবরই ঐ একবারই ছাড়া সংখ্যালঘু ছিল ১৯১৭ সাল পর্যন্ত। ১৯১২ সালে তারা পাকাপাকিভাবে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক লেবার পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এই দলের নেতা ছিলেন লেনিন, ট্রটস্কি,

লুনাচারস্কি প্রমুখ। এঁরা সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র আনা যায়, এ কথা বিশ্বাস করতেন না, প্রচার করতেন সশস্ত্র সংগ্রামের কথা। সবলে সরকারী যন্ত্র দখল ক'রে নেওয়া, কারখানা জমি খনি ইত্যাদি অধিকার করা হল এঁদের লক্ষ্য। এঁদের অনুগামী ছিল কারখানার অনেক শ্রমিক এবং গরিব চাষীদের একটি বেশ বড় অংশ।

মেনশেভিকদের নেতা ছিলেন ড্যান, লাইবার, সেরেটেলি। এঁরা বিশ্বাস করতেন বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ অগ্রসর হয়ে সমাজতন্ত্রে উপনীত হবে। এঁরা ছিলেন জাতীয়তাবাদী। এঁদের মধ্যে যাঁরা একটু উগ্র বামপন্থী ছিলেন তাঁরা আন্তর্জাতীয়তাবাদী। এঁদের নেতা ছিলেন মার্টভ আর মার্টিনভ। এঁরা অন্যান্য মেনশেভিকদের মতো সম্পত্তিশালী লোকদের সঙ্গে একজোট হয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত ছিলেন না। আবার বলশেভিকদের মতো উগ্রও এঁরা ছিলেন না, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে এঁরা বিশ্বাস করতেন না।

মেনশেভিক-বলশেভিকদের মধ্যে দ্বন্দ্বে মধ্যপন্থা যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁরা পরিচিত ছিলেন নোভায়া ঝিজ্ন নামে, গোর্কি ছিলেন এঁদের নেতা। এঁরা অবশ্য বেশির ভাগই ছিলেন কেবল তত্ত্ববিশারদ।

সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারি পার্টি ছিল কৃষকদের পার্টি। এরা জমি থেকে জমিদারদের তাড়ানোর জন্য সংগ্রাম করত। এদের অন্যতম নেতা ছিলেন কেরেনস্কি। কৃষকরাই যদিও এর সভ্য ছিল, শেষের দিকে ধনী কৃষকরা এবং আরো অনেকে যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করত না, তারাও ঢুকে পড়েছিল এর মধ্যে। তবে এই পার্টি, যার সংক্ষিপ্ত নাম ছিল এস.আর, আবার দুভাগে ভেঙে যায়। বামপন্থী এস.আর-দের সঙ্গে বলশেভিক প্রোগ্রামের সাদৃশ্য ছিল, কিন্তু শ্রমিকদের একনায়কত্বে এরা বিশ্বাস করত না।

রাশিয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজনীয়— কারণ রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে দুটো সফল বিপ্লব ঘটেছিল, একটি মার্চে (রাশিয়ার পুরনো ক্যালেণ্ডার-মতে ফেব্রুয়ারিতে) আর একটি নভেম্বরে (পুরনো ক্যালেণ্ডার-মতে অক্টোবরে)। এই দুই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের দল।

এই দুই বিপ্লবেরই অভ্যুত্থান এবং সাফল্যের কারণ সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা চলে এইভাবে। জারের অক্ষম শাসন রাশিয়ার কৃষকদের এবং শ্রমিকদের শোচনীয় দুর্দশায় ফেলেছিল এবং প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদানের ফলে রাশিয়ার

সৈন্যরা ভয়ানকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আড়াই বছর যুদ্ধ চলার পর ক্ষতির খতিয়ান ক'রে দেখা গেল রাশিয়ার ৫৫ লক্ষ সৈন্য নিহত হয়েছে— যুদ্ধে তাদের অস্ত্রশস্ত্র তো দূরের কথা, খাদ্য এবং পরিধেয়ও ঠিকমতো সরবরাহ করা হয় নি। সরকার তখন এমনই অথর্ব অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, ১৯১৭ সালের একবছরে চারবার প্রধানমন্ত্রী, তিনবার যুদ্ধমন্ত্রী, তিনবার বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী পালটাতে হয়েছিল। সমস্ত রাশিয়া, শহর গ্রাম সীমান্ত, অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল বহুদিন ধরেই।

১৯১৭ সালের ৮ মার্চ ধর্মঘট এবং রাস্তায় রাস্তায় মারামারি শুরু হয়ে যায়। জারের সৈন্য দুদিন পরই ধর্মঘটী এবং জনসাধারণের পক্ষ অবলম্বন করে। ১২ মার্চ জার ডুমা ভেঙে দেন। কিন্তু ডুমা জারের আদেশ পালন করতে রাজি হল না, পরিবর্তে প্রিন্স লিভভের নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করল। নিকোলাস পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এই বিপ্লবের নাম 'মার্চ বিপ্লব'। এটা ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কারণ এর নেতৃত্বে ছিল রাশিয়ার সম্পত্তিশালী বুর্জোয়াশ্রেণী। এরা জারের সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার, জারের স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল, তবে সেই গণতন্ত্র সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত হল না— হল শুধু সম্পত্তিবান শ্রেণীর গণতন্ত্র। এরা তখনো বিশ্বাস করত রাশিয়া প্রথম মহাযুদ্ধে জয়ী হবে এবং সংসদের মাধ্যমেই দেশের বিস্তৃত সংস্কার করা সম্ভব হবে। এই দলে ছিল ক্যাডেট, মেনশেভিক এবং দক্ষিণপন্থী এস.আর দলের অনুগামীরা। কিন্তু কেরেনস্কি এবং জেনারেল কর্নিলভের মধ্যে বৈরিতা দেখা দেওয়ার ফলে এই বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রথম থেকেই শিথিল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিল।

ইতিমধ্যে সোশ্যালিস্টরা ১৯০৫ সালের অনুকরণে দিকে দিকে সোভিয়েট গঠন করতে শুরু করেছিল। সোভিয়েটগুলো ছিল স্থানীয় শাসন-সংস্থা। শ্রমিকরা, কৃষকরা, সৈন্যরা তাদের আপন আপন সোভিয়েট তৈরি ক'রে প্রথম থেকেই অস্থায়ী সরকারের বিরোধিতা করতে শুরু করে। তারা যুদ্ধ চলতে দিতে একদম রাজি নয়। খাদ্যাভাবে রাশিয়ার জনসাধারণ নিদারুণ দুর্গতি ভোগ করছে। এদের নেতৃত্ব দিয়ে লেনিন, 'শান্তি, জমি এবং রুটি' এই স্লোগান দিয়ে জারের 'শীতকালীন প্রাসাদ' অধিকার করলেন ৬ নভেম্বর। পরদিন রাশিয়ার সব সোভিয়েট একটি কংগ্রেসে মিলিত হয়ে বলশেভিকদের হাতে নেতৃত্ব অর্পণ করলেন। শাসন চালানোর জন্য বলশেভিকরা গঠন করল কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস। কারখানা চালানোর অধিকার দেওয়া হল শ্রমিকদের, ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্য

বে-আইনি ক'রে দেওয়া হল, চার্চের এবং বিরুদ্ধাচারীর সম্পত্তি দখল ক'রে নেওয়া হল, জার্মানির সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্থাপিত হল। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা হল, শুরু হল সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজ। এটাই হল 'নভেম্বর বিপ্লব'।

এই বিবরণ থেকে অবশ্য বিপ্লবের বাইরের চেহারাটাই পাওয়া যাচ্ছে। যারা বিপ্লব সমাধা করল, তারা সেই শক্তি কোথা থেকে পেল, কোন অসামান্য নেতৃত্বে তারা জনসাধারণের স্বপ্নকে মূর্ত ক'রে তুলল, তার পরিচয় কিন্তু এই বিবরণ থেকে পাওয়া গেল না। রাশিয়ার সামন্ততন্ত্র কেন ভেঙে পড়ল এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রই বা কেন ছ-মাসের বেশি বাঁচল না, তার পরিচয় পেতে গেলে সেই সময়কার রাশিয়ার অবস্থা আর একটু বিশদ ক'রে বলতে হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া রাশিয়ার বিপ্লব বোঝা যাবে না। অনেকেরই ধারণা ছিল না তখন, যুদ্ধ না বিপ্লব কোনটা আগে ঘটবে রাশিয়ায়। যুদ্ধ যখন লাগলই, 'যুদ্ধে জয়ের মধ্য দিয়ে বিপ্লব আনতে হবে' এই ধারণাটি পাল্টে হয়ে গেল 'বিপ্লবের মধ্য দিয়েই যুদ্ধে জয়' এই ধারণায়। যুদ্ধের সঙ্গে বিপ্লবের এই নিবিড় সংযোগ ঘটল কেন?

কারণ যুদ্ধ চালানোয় জারের অক্ষমতা। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে অন্যান্য মিত্রশক্তির সঙ্গে রাশিয়াও যোগ দিয়েছিল। কিন্তু রাশিয়ার সীমান্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে— প্রায় ৫৫০ মাইল। যেখানে সীমান্ত এত বিরাট, রাশিয়ার সৈন্য-বাহিনী মাথাগুণ্‌তিতে বিরাট হলেও, অস্ত্রশস্ত্রের সীমাবদ্ধতায়, সরবরাহ ব্যবস্থার অরাজকতায়, নৈতিক শক্তির এবং নেতৃত্বের অভাবে হীনবীর্য হওয়ায়, তার উচিত ছিল পিছিয়ে এসে আত্মরক্ষা করা। কিন্তু জারের এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গের অদূরদর্শিতা এবং অবিমৃষ্যকারিতায় রাশিয়ার সৈন্যরা কেবলই এগিয়ে কাইজারের সৈন্যদের হাতে মারের পর মার খেতে লাগল। এই মার এমনই যে, রাশিয়ার সৈন্যরা হাজারে হাজারে নয়, লক্ষে লক্ষে ধ্বংস হল। অথচ এমন হওয়ার কথা ছিল না। রাশিয়ার লোকেরা বরাবরই দেশপ্রেমিক এবং জার্মানদের সঙ্গে তাদের সদ্ভাব কখনোই ছিল না। বরং যখন যুদ্ধ প্রথম লাগল তখন দেশপ্রেমের একটা বন্যা বয়ে গিয়েছিল। জারের প্রতি ভালোবাসা না থাকলেও জার্মানরা যুদ্ধ শুরু করলে জারের প্রতি আনুগত্য নতুন ক'রে গজিয়ে উঠল। পেট্রোগ্রাডে শ্রমিকেরা ধর্মঘট স্থগিত রাখল, সরকার-বিরোধিতা কমিয়ে আনল। ডুমাতেও জারের বিরুদ্ধাচার কমে এল। বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা

শুরু করল যাতে একজোট হয়ে শত্রু রোখা যায়। অভিজাত সম্প্রদায় তার আত্মকলহ বিলাসব্যসন ত্যাগ ক'রে দেশকে সেবা করার জন্য এগিয়ে এল।

কিন্তু এই দেশোন্মাদনাকে কাজে লাগাবে কে? সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয় নি। যিনি প্রধান সেনাধ্যক্ষ তিনি গর্বের সঙ্গেই বলতেন পঁচিশ বছর তিনি মিলিটারি-শাস্ত্র ধরাছোঁয়া করেন নি। তাঁর লক্ষ্য কীভাবে দেশের টাকা আত্মসাৎ ক'রে তরুণী ভার্যার মনোরঞ্জন করবেন। সুতরাং সৈন্যদের হাতে অস্ত্র আছে কি নেই সেই খবরটুকু নেওয়াতে কারো উৎসাহ নেই। সৈন্যরা ফ্রণ্টে যাবে কী ক'রে, রেলগাড়ি ঠিক চলে না, পর্যাপ্ত সংখ্যায় ঘোড়া নেই, সুতরাং সৈন্যরা হেঁটেই ফ্রণ্টে যাবে! ফলে যে দেড়কোটি সৈন্য ফ্রণ্টে যুদ্ধ করছিল তাদের বীরত্ব এবং সাহসিকতা বিনষ্ট হল অর্থগৃধ্নু কলহপ্রিয় সেনাপতিদের জন্য।

চার বছরের যুদ্ধ তখন এক বছরও ঘোরে নি, ইতিমধ্যে রাশিয়ায় দেশপ্রেমে ভাঁটা দেখা দিল। যে-জার্মানদের সম্পর্কে রাশিয়ার সাধারণ লোক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, পেট্রোগ্রাডে জার্মান এমব্যাসি লুঠ হয়ে গেল। 'সেণ্ট পিণ্টারসবার্গ' জার্মান নাম বলে বলা হতে লাগল শহরটাকে 'পেট্রোগ্রাড'। সেই রাশিয়ারই লোকেদের ধারণা হল রাজদরবারে নিশ্চয় জার্মান গুপ্তচর আছে যারা রাশিয়াকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

অবশ্য অবস্থাটা তা ছিল না। যুদ্ধের জন্য সব প্রস্তুতি বানচাল ক'রে দিচ্ছিল জার, জারিনা ও রাসপুটিনের অদ্ভুত অদ্ভুত সিদ্ধান্ত। ইচ্ছেমতো অর্বাচীন সেনাপতি নিয়োগ ক'রে ক'রে সমস্ত যুদ্ধপ্রয়াস ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছিলেন এই তিনজন। সমস্ত রোষ সুতরাং এসে পড়ল রাসপুটিনের উপর, সংগত কারণেই। রাসপুটিনকে হত্যা করা হল। এই হত্যার কাহিনী এমন বীভৎস যে ট্রটস্কি এর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, অত্যন্ত বাজে ডিরেক্টার তৃতীয় শ্রেণীর দর্শকের জন্য ফিল্ম তৈরি করলে যা হয় ঠিক সেই ফিল্মের মতো মনে হয় রাসপুটিনের হত্যাকাহিনী।

রাসপুটিনকে যারা হত্যা করে তারা অবশ্য বিপ্লবী নয়, তারা হচ্ছে বুর্জোয়া-শ্রেণীর। তাদের ধারণা হয়েছিল রাসপুটিনকে খতম করতে পারলেই সম্রাটের উপর থেকে এই অশুভ গ্রহের প্রভাব দূর হবে, শাসনব্যবস্থায় একটা শৃঙ্খলা আসবে। তারা রাসপুটিনকে বিষ খাইয়ে, লোহার রড দিয়ে মেরে, বস্তায় বেঁধে, নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে, ঘোষণা করল রাশিয়ার শান্তি, জারের শান্তি। জারিনা কিন্তু সেই মৃতদেহ তুলে নিয়ে এসে হাঁটুগেড়ে প্রার্থনা ক'রে যাচ্ছেন আর জার

জারিনাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। বোঝা গেল স্পষ্টই, রাসপুটিনকে মারলেই রাশিয়ার কল্যাণ ফিরে আসবে না, ব্যাধির শিকড় আরো গভীরে। এই ব্যাধির ওষুধ যাঁরা জানেন, তাঁরা দরবারের আমলা নন, তাঁরা তখন নির্বাসনে।

১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর রাশিয়ান সোশ্যালিস্ট ডেমক্র্যাটিক লেবার পার্টির সব নেতারাই প্রায় রাশিয়া থেকে পালিয়ে গেছেন। বলশেভিক ও মেনশেভিক দুই দল তখনো আনুষ্ঠানিকভাবে আলাদা হয়ে যায় নি। পার্টি অবশ্য এই কলহে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তবে রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিবেশে পার্টি তখন বেশ প্রতিষ্ঠিত, ডুমাতে যোগ দিতেও এর সভ্যদের আইনগত কোনো বাধা ছিল না। ১৯০৬ সালে স্টকহোলমে দুই দলের ঐক্য আনার চেষ্টা ঘটল একটি অধিবেশনে। সংখ্যায় গরিষ্ঠ মেনশেভিকরা এতে অগ্রণী হল। কিন্তু লুঠতরাজের প্রশ্ন বড়ো হয়ে দেখা দিল এই ঐক্যের ব্যাপারে।

বিপ্লবের কাজের জন্য, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে, সাংগঠনিক কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ আসবে কোথা থেকে? বেশির ভাগই আসত ডাকাতি থেকে। ব্যাঙ্ক লুঠ, সরকারী অফিস লুঠ, ব্যবসায়ীদের টাকা লুঠ হয়ে টাকা আসত পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটিতে। বোমা ব্যবহার ক'রে রাজনৈতিক কর্মীরা সমস্ত রাশিয়ায় এক অনিশ্চয়তার আবহাওয়া তৈরি করেছিল। স্টকহোলম অধিবেশনে মেনশেভিকরা এই ডাকাতি বন্ধ করার প্রস্তাব আনল। মেনশেভিকরা তখন শান্তির পক্ষে, বে-আইনি কাজ বন্ধ ক'রে আইনানুগ উপায়ে সংগ্রামের পক্ষপাতী। মেনশেভিক নেতা প্লেখানভ, যিনি রাশিয়ায় মার্কসবাদের গোড়াপত্তন করেন প্রায়, যাঁকে মেনশেভিক ও বলশেভিক উভয় দলই শ্রদ্ধার চোখে দেখ'ত, সেই প্লেখানভ শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের সমর্থনে এতদূর এগিয়ে গেলেন যে ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময়ে রাস্তাঘাটে হানাহানিকে পর্যন্ত তিনি সমালোচনা করলেন। মেনশেভিকরা ভোটের জোরে তাদের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিল।

প্রস্তাব পাশ হল বটে, কিন্তু লেনিন কিছুতেই রাজি হলেন না ডাকাতি বন্ধ করতে। এই ডাকাতি সাধারণ ডাকাতি নয়, দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য মুষ্টিমেয় ধনীর ঐশ্বর্য অপহরণে কোনো নৈতিক অপরাধ থাকতে পারে, এ কথা তিনি স্বীকার করলেন না। সহিংস পদ্ধতি, যার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করল মেন-শেভিকরা, মার্কসবাদী রাজনীতিরই অঙ্গ— এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী লেনিন ডাকাতি চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর এবং তিনি মেনশেভিকদেব না জানিয়ে ডাকাতি চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন তাঁর সমর্থকদের। তিনি তখন ফিনল্যাণ্ডে, কিন্তু

রাশিয়ায় তাঁর অনেক সুযোগ্য সহকর্মী ছিলেন। তাঁদের প্রধান হলেন দার্শনিক বোগদানা এবং ইঞ্জিনিয়ার ক্রাসিন। এঁদের নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে রাশিয়ায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ সমানে চলল। এই দু-বছরে রাজনৈতিক খুনের সংখ্যা প্রায় চার হাজারের কোঠায় গিয়ে দাঁড়াল। লেনিন নতুন একটা কাগজ চালানো শুরু করলেন, নাম 'প্রলিটারাই', যার মাধ্যমে বলশেভিক চিন্তাধারা তিনি প্রবল জোরের সঙ্গে চালালেন।

১৯০৭ সালে লণ্ডনে আর একটি কংগ্রেস বসল পার্টির। সব চেয়ে বড়ো অধিবেশন এটি, প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি যোগ দিলেন এতে। রাশিয়া থেকে, রাশিয়ার বাইরে থেকে, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক সকলে। প্লেখানভ এলেন, এলেন তাঁর একনিষ্ঠ সহকর্মী অ্যাক্সেলরড। এলেন মার্টভ, ড্যান, সেরেটেলি। এলেন লেনিন, ট্রটস্কি। এলেন গোর্কি। সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টির বৃহত্তম সমাবেশ। এই অধিবেশনে মেনশেভিকরা চাইল আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে বেরিয়ে এসে আইনানুগ উপায়ে সংগ্রাম করতে, ডাকাতি ক'রে টাকা সংগ্রহ করা বন্ধ করতে, ডুমাতে যোগ দিতে, ক্যাডেটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জারের স্বৈরতন্ত্রের মোকাবিলা করতে। লেনিন এবং তাঁর বলশেভিক দল প্রবল বিরোধিতা জানালেন। তাঁরা জানালেন, গণতান্ত্রিক উপায়ে শ্রমিকশ্রেণীকে উন্নততর করা যাবে না। তার জন্য প্রয়োজেন গোপন বিপ্লবী পার্টি। কিন্তু লেনিনের সমর্থকরা সংখ্যালঘু। এই কংগ্রেসের পর থেকে লেনিন ক্রমশই শক্তিহীন হতে লাগলেন, অবশ্য সমর্থকদের সংখ্যায়।

বলশেভিকদের সঙ্গে মেনশেভিকদের এই কলহের কারণ অবশ্য আরো গভীরে। কমিউনিস্ট পার্টি কীভাবে গড়া হবে, এই মূল প্রশ্ন নিয়েই যত মারামারি। বল-শেভিকদের বিশ্বাস ছিল, বিপ্লব আনার জন্য সমস্ত জনসাধারণ কখনোই সংগ্রাম করে না, কৃষক ও শ্রমিকরা অত্যাচারিত হলেও শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তারা একজোট হয়ে লড়তে পারে না। শিক্ষাদীক্ষার অভাবে কীভাবে লড়ে তারা শাসকশ্রেণীকে উৎখাত করতে পারবে, তা তারা জানে না। সুতরাং দরকার কিছু শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর বিপ্লবী কর্মী— তারা কৃষক-শ্রমিককে সংগ্রামের পথ দেখাবে। আর শাসকশ্রেণী স্বাভাবিক কারণেই এই সংগ্রামকে প্রশ্রয় দেবে না, সুতরাং তারা চেষ্টা করবে ঐ শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর কর্মীদের ধ্বংস করতে। তাই বলশেভিকরা বলল, চাই গোপন বিপ্লবী কর্মী, চাই গোপন বিপ্লবী পার্টি। যে কেউ এই পার্টির সদস্য হতে পারবে না। যদি তাদের যথেষ্ট শিক্ষা, ধৈর্য আর

সাহস না থাকে তাহলে অত্যাচারের চোটে তারা পার্টির কর্মপ্রণালী সব ফাঁস ক'রে দেবে।

মেনশেভিকরা এতে বিশ্বাস করে না। তারা বলল, সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক যদি তাদের নিজের হয়ে না লড়ে তাহলে বিপ্লব কখনোই সম্পন্ন হবে না। সুতরাং সবাইকেই পার্টিতে নিতে হবে। আর গোপন পার্টির দরকার নেই, ডুমাতে যোগ দিয়ে ক্রমাগত সংস্কারের মধ্য দিয়েই বিপ্লব আনা যাবে।

এই কলহের আর একটা কারণ বিপ্লবের সময় নির্ধারণ নিয়ে। মেনশেভিকদের ধারণা, রাশিয়ায় তখনো বিপ্লবের সময় আসে নি। রাশিয়ায় তখনো সামন্ততন্ত্রের যুগ। জার এই সামন্ততন্ত্রেরই প্রতিনিধি। সুতরাং প্রযোজন প্রথমে সামন্ততন্ত্রের উৎখাত ক'রে বুর্জোয়াতন্ত্র স্থাপন করা। বুর্জোয়াতন্ত্র যথেষ্ট অগ্রসর হলে, রাশিয়ায় ধনতন্ত্র যথেষ্ট বিস্তৃত হলে তবেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় হবে। কারণ তখনই শ্রমিক ও কৃষক সত্যকারের বিপ্লবী হবে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই কৃষক ও শ্রমিকরা দুর্গতির চরম অবস্থায় এসে পৌঁছয়। রাশিযায় তখনো সামন্ততান্ত্রিক পর্যায় চলছে, সুতরাং রাশিয়ায় ধনতন্ত্র প্রসারিত হলে কৃষক ও শ্রমিকের ভালোই হবে, অর্থনৈতিক নানারকম সুখসুবিধা পাবে। তাহলে এই সময়ে শ্রমিক ও কৃষকের কর্তব্য কী? মেনশেভিকরা বলল, বুর্জোয়াদের সাহায্য করা— যাতে তারা জারকে উচ্ছেদ করতে পারে। তারা তাই ডুমাতে ক্যাডেট ইত্যাদি দলগুলোকে সমর্থন করতে চাইল জারকে উৎখাত করার জন্য।

ধনতন্ত্র যে রাশিযায় তখন প্রতিষ্ঠিত হয় নি বলশেভিকরা তা জানত। কিন্তু তারা বলল বিপ্লবের জন্য ঐভাবে ভাগে ভাগে সংগ্রাম করা ঠিক নয়। রাশিয়ার গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে কৃষকরা এবং শ্রমিকরা নিরন্তর সংগ্রাম ক'রে এসেছে। তারা বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় এসে গেছে। একই সঙ্গে সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্র উচ্ছেদ ক'রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সামন্ততন্ত্র রাশিয়াতে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে এসেছে, আবার ধনতন্ত্র যারা প্রতিষ্ঠা করবে সেই বুর্জোয়াশ্রেণীও অত্যন্ত দুর্বল। এই বুর্জোয়া-শ্রেণীকে সময় দিয়ে সবল হতে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। সুতরাং ডুমাতে বুর্জোয়াদের সমর্থন না ক'রে, তাদের বলিষ্ঠ হতে না দিয়ে, এখনই প্রয়োজন সবলে রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার ক'রে নেওয়া।

মেনশেভিক ও বলশেভিকদের এই কলহ আরো বেড়ে গেল যখন জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করল। বলশেভিকরা বলল, একদল শোষক আর একদল

শোষকের সঙ্গে মারামারি করছে, এই যুদ্ধে জনসাধারণের কোনো হিত হবে না, সুতরাং এই যুদ্ধে জনসাধারণের যোগ দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যুদ্ধ বরং বিপ্লবের পক্ষে ভালোই, কারণ শোষকশ্রেণীরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ ক'রে দুর্বল হয়ে পড়ছে। সুতরাং বিপ্লবের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার এটাই হচ্ছে পরম ভালো সময়। যুদ্ধ বাধার পর মেনশেভিকরা কিন্তু হঠাৎ ভয়ানক দেশপ্রেমিক হয়ে পড়ল। তারা বলল, আগে দেশকে বাঁচাই তারপর বিপ্লব করা যাবে। অর্থাৎ শ্রেণীর চাইতে দেশ বড়ো, এটাই তারা বলতে চাইল।

এই কলহের ফলে, যখন ১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধল তখন রাশিয়ার পুরনো সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টি ছত্রভঙ্গ। লেনিন পালিয়ে আছেন পোল্যাণ্ডে, ট্রটস্কি কাজ করছেন সাংবাদিক হিসেবে ভিয়েনাতে, প্লেখানভ তর্ক করছেন সুইজারল্যাণ্ডে বসে, গোর্কি ক্যাপ্রি দ্বীপে, পারভাস কনস্টান্টিনোপলে। কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই, থাকলেও তা মিত্রতার নয়।

যুদ্ধ বাধার পর রাশিয়ার সৈন্যরা কেন প্রথমে জারের পক্ষে এবং বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ভয়ানক বিপক্ষে চলে গেল, তা আগেই বলা হয়েছে। সৈন্য ছাড়া কৃষক ও শ্রমিক রাশিয়ার বিপ্লবে প্রধান স্থান নিয়েছিল— কী কারণে, সে কথা জানা দরকার।

সেই সময়ে রাশিয়ার জনসাধারণের তিন-চতুর্থাংশ ছিল কৃষক। ১৮৬১ সালের আগে পর্যন্ত এই কৃষকরা ছিল জমিদারের দাস হয়ে। ঐ বছরে আইন ক'রে দাসত্বপ্রথা অবলুপ্ত করা হয়, কিন্তু সেটা কৃষকদের সুখের পথ প্রশস্ত করে নি। কারণ যে জমি তারা পেল তার চড়া দাম দিতে হয়েছিল জমিদারকে। খণ্ড খণ্ড জমি চাষ করা সুবিধের নয়, আর জমিও তেমন ভালো নয়। যা কিছু উৎপন্ন হয় তাও দিয়ে দিতে হয় জমিদারদের— হয় ফসলটাই অথবা ফসল বিক্রি করার টাকাটা। ফলে অনাহারেই থাকতে হতো কৃষকদের। থাকার জন্য ছিল চালাঘর। দুর্ভিক্ষ লাগলে চালাঘরের খড় খুলে গোরুবাছুরদের খাওয়াতে হতো। এদের অবস্থার উন্নতির কথা ভাবার জন্য জারের বা তাঁর অমাত্যদের সময় ছিল না। মধ্যে-মধ্যে অবশ্য সমবায় সমিতি স্থাপন ক'রে, খণ্ড খণ্ড জমি একত্র ক'রে চাষ করার ব্যবস্থা হতো, কিন্তু তাতে মুষ্টিমেয় কৃষকই লাভবান হয়েছিল। এই কৃষকরা ধনসঞ্চয় ক'রে 'কুলাক' নামে পরিচিত হয়। জার সম্পর্কে যেমন কৃষকদের আস্থা ছিল না, কুলাকদের সম্পর্কেও তেমন তাদের কোনো মোহ ছিল না, কারণ গরিব কৃষকদের অত্যাচার করতে এরাও কম যেত না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কৃষকরা

জার সম্পর্কে ঘোরতর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, কারণ রাশিয়ায় যতটুকু ফসল উৎপন্ন হতো তা রাশিয়ার জনসাধারণের পক্ষে অপর্যাপ্ত হলেও, সেটা বিদেশের বাজারে বিক্রি ক'রে সেই অর্থে রাশিয়ার সৈন্যদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ কেনা হতো এবং তা সবই যুদ্ধে ধ্বংস হতো।

জার সম্পর্কে শ্রমিকরাও দিনে দিনে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিল। বিরাট দেশ রাশিয়া অথচ কলকারখানা অত্যন্ত অল্প। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে বিশৃঙ্খলভাবে কলকারখানা গজিয়ে উঠছিল বটে, কিন্তু রাশিয়ার বিরাট লোকসংখ্যার পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণে কর্মসংস্থান তাতে হওয়ার কথা নয়। তার উপর, শহরে শহরে শ্রমিকরা ভিড় করছিল বটে, কিন্তু তাদের থাকা-খাওয়ার অব্যবস্থার ফলে অসন্তোষ আরো ভয়ানক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। দিনে তেরো-চৌদ্দ ঘণ্টা খাটতে হতো, অথচ মাইনে চোখে দেখা যায় না এমন। নোংরা ঘিঞ্জি কারখানা, নোংরা ঘিঞ্জি বস্তি। কারখানায় বেশির ভাগ কাজ হাতে করতে হয়, যন্ত্রপাতির তেমন বালাই নেই। ফলে কারখানায় কারখানায় ধর্মঘট নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যদিও জারের আইনে ধর্মঘট নিষিদ্ধ। এক ১৯১৩ সালেই ২০০০ টা ধর্মঘট ঘটেছিল।

১৯১৭ সালের মার্চ মাসে যখন বিপ্লব শুরু হল, সংগত কারণেই শ্রমিক, কৃষক আর সৈন্যরা তাতে ঝাপিয়ে পড়ল। ব্যাপারটা যে বিপ্লব তা অবশ্য তারা জানত না— কেউই জানত না। বহুদিন ধরেই বিপ্লবের কথা সকলেই প্রায় বলাবলি করছিল, কিন্তু সেটা কী আকারে ঘটে তার ধারণা কারোই ছিল না। এখন অবশ্য ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে, পুরো চেহারাটা বোঝা যাচ্ছে বলে।

মস্কোর কাছাকাছি একটা কারখানায় একটি শাখায় কয়েকজন শ্রমিক ছাঁটাই হয়। তার প্রতিবাদে সেই কারখানায় ৩ মার্চ একটা ধর্মঘট হয় এবং শোভাযাত্রা বেরোয়। মালিক শ্রমিকদের দাবি মানল না। ধর্মঘট সেই কারখানার সব কটা শাখায় ছড়িয়ে পড়ল। মালিক লক-আউট ঘোষণা করল, তিরিশ হাজার লোক কর্মচ্যুত হল। মস্কোর আশেপাশে সব কারখানায় ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা ছড়িয়ে পড়ল।

৮ মার্চ একটি মহিলা দিবস অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টি বহুদিন ধরেই মহিলাদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করছিল। তাদের দাবি কাজের পরিবেশ ভালো করা ও মাইনে বাড়ানোর। ৭ মার্চ এক সভায় মিলিত হয়ে তারা স্লোগান তৈরি করল, 'জার নিপাত যাক' এবং 'যুদ্ধ বন্ধ করো'।

৮ মার্চ কাপড়ের কলগুলো, যেখানে অধিকাংশ শ্রমিক ছিল মহিলা, তারা ধর্মঘট ডাকল এবং মস্কোর কাছাকাছি যে কারখানায় ধর্মঘট চলছিল তাদের সঙ্গে হাত মেলালো। একটা 'ধর্মঘট কমিটি' গঠন করা হল, সমস্ত শ্রমিককে নির্দেশ দেওযা হল রাস্তায় নামতে। 'রুটি দাও' এই স্লোগান তুলে শ্রমিকরা রাস্তায নামল। অনেক রুটির কারখানা লুঠ হল। পেট্রোগ্রাড শহরে ঢোকার চেষ্টা দুবার ব্যর্থ হল পুলিশের প্রতিরোধে, তৃতীয়বার সফল হল। ৯ মার্চ রাস্তায শ্রমিকের সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। মেনশেভিক-বলশেভিকদের যারা ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছিল তারা এদের নেতৃত্ব দিল, রাস্তায গাড়িঘোড়া আটকাতে লাগল, তিনদিন বন্ধের ডাক দিল।

সরকারের টনক নড়ল। অন্যান্য ধর্মঘট বা বন্ধের সঙ্গে এই ধর্মঘট একটু পৃথক এটা আঁচ ক'রে, উগ্র শ্রমিকদের দেখে ভয় পেয়ে, সবচেয়ে বিশ্বস্ত জারের সৈন্যবাও শোভাযাত্রীদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে না দেখে আতঙ্কিত হয়ে, সরকারী আমলারা দিশেহারা হযে নিকোলাসকে টেলিগ্রাম করল, নিকোলাস যেন পদত্যাগ করেন। নিকোলাস তখন পেট্রোগ্রাডের বাইরে, অনুরোধ গেল তিনি যেন সত্বর পেট্রোগ্রাডে ফিরে আসেন। নিকোলাস নিশ্চিন্ত মনে হুকুম পাঠালেন, পেট্রোগ্রাডের শোভাযাত্রীদের ধ্বংস করো।

১০ মার্চ তিন লক্ষ শোভাযাত্রীকে হুকুম করা হল রাস্তা পরিষ্কার ক'রে দিতে। শ'খানেক সোশ্যালিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল, তাদের মধ্যে বলশেভিকরাও ছিল।

১১ মার্চ স্লোগান উঠল, জার্মান মেয়েটি নিপাত যাক। আক্রমণের লক্ষ্য জারিনা, যিনি রক্তসূত্রে জার্মানদের আত্মীয়। এবং তখন রাশিয়ায অনেকের ধারণা জার্মানদের রাশিয়ানরা পরাস্ত করতে পারছে না, তার কারণ জারিনা বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে জার্মানদের সব গুপ্তকথা জানিয়ে দিচ্ছেন। শহরের কেন্দ্র-স্থলে শোভাযাত্রা যখন এসে পৌছালো তখন কিছু সৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হল। সৈন্যদের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা হল, সৈন্যদের উপর হুকুম এল গুলি ছোঁড়ার; গুলি ছোঁড়াও হল, তবে আকাশ তাক ক'রে। সৈন্যরাও যে বিদ্রোহ করবে তার প্রথম আভাস পাওয়া গেল। কিন্তু সর্বত্রই যে সৈন্যরা বিদ্রোহী ভাব দেখাতে শুরু করেছিল তা নয়। এক জায়গায় শোভাযাত্রার উপর গুলি চালালে ষাটজন শোভাযাত্রী মারা গেল।

এই গুলি চলার পর এবং খবরটা রটে যাবার পর রাস্তাঘাটে দৌড়োদৌড়ি

শুরু হয়ে গেল, পুলিশ ফাঁড়িগুলো আক্রান্ত হতে লাগল, পুলিশের পোষাক-পরা লোক দেখলেই তাড়া করা হতে লাগল, আদালতের উপর হামলা চলল, কাগজ-পত্র ছুঁড়ে ফেলা হতে লাগল। জেলের উপরও লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল, কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া হতে লাগল। সমস্ত শহর জুড়ে আগুনের তাণ্ডব। সৈন্য-ব্যারাকে একটি রেজিমেণ্ট বিদ্রোহী হয়ে উঠে তাদের কম্যাণ্ডার এক কর্নেলকে মেরে ফেলল। সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র অবশ্য সেখানে কেড়ে নেওয়া হল, কিন্তু অফিসাররা প্রাণভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

পেট্রোগ্রাডে তখন জারের মন্ত্রীরা ঘনঘন সভা ডাকছে। কেউ কেউ আবার গা-ঢাকা দিয়েছে। নিকোলাসকে খবর পাঠানো হল, বলা হল অবস্থা গুরুতর। নিকোলাস সেসব খবরকে পাত্তাই দিলেন না। উল্টে তিনি ডুমাকে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তখন নিকোলাসের আদেশ শোনার মতো অবস্থা আর কারো নেই। সৈন্যরা বিভ্রান্ত, অমাত্যরা আতঙ্কিত, জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ। শোভা-যাত্রীদের উপর গুলি চালানোতে বিরাট জনমত রীতিমতো ক্রুদ্ধ। সৈন্যরা তো বটেই, অফিসাররাও শোভাযাত্রীদের প্রতি সহানুভূতিশীল— জারের উপর তাদেরও আর কোনো আস্থা নেই।

১২ মার্চ বহুসংখ্যক সৈন্য জনসাধারণের সঙ্গে যোগ দিল। পরে পাওয়া এক হিসাবে দেখা গেছে, সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহীদের সংখ্যা এইভাবে বেড়েছিল— ১১ মার্চ বিকেলে সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহী হয় ৬০০, ১২ মার্চ সকালে ১০,২০০, দুপুরে ২৫,৭০০, সন্ধ্যায় ৬৬,৭০০। ১৩ মার্চ সকালে ৭২,৭০০, দুপুরে ১১২,০০০, সন্ধ্যায় ১২৭,০০০। ১৪ মার্চ সকালে ১৪৪,৭০০, দুপুরে ১৭০,০০০ জন। এরা রাস্তার শোভাযাত্রীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পুলিশ মারা শুরু করল— জারের গুপ্ত-পুলিশ 'ওখরানা', যাদের উপর সমস্ত রাশিয়া ক্রুদ্ধ, তাদের হেডকোয়ার্টার্স বিধ্বস্ত ক'রে দিল— এমন কি সেণ্ট পল আর সেণ্ট পিটার নামক বিরাট দুর্গতেও ঢুকে পড়ল। শহরের সৈন্যাধ্যক্ষ নাকি শহরে সে সময়ে কার্ফ্যু জারি করেছিলেন, তবে সমস্ত শহরে আঠা না পাওয়ায় সেই আদেশ দেওয়ালে লাগানো যায় নি!

রাশিয়ার ইতিহাসে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কখনোই পাকা ভিত্ হয় নি। জন-সাধারণ বরাবরই জারের কথা শুনে এসেছে, জারকে ভগবানের প্রতিনিধি মনে ক'রে ভয় করেছে, শ্রদ্ধা করেছে, মান্য করেছে। ১৯০৫ সালে ডুমা প্রতিষ্ঠা হয়ে-ছিল, কিন্তু তা প্রায় কাগজেকলমেই। জনসাধারণের মনে প্রতিনিধিত্বমূলক

শাসনতন্ত্র যে কী তার কোনো ভালো ধারণা হয় নি। ফলে মার্চ মাসের এই উত্তাল বিক্ষোভের পর, নেতা হিসাবে জারের অকর্মণ্যতা শোচনীয়ভাবে প্রমাণিত হবার পর, সাধারণ লোক দিশেহারা হয়ে গেল— এর পর কী করা উচিত, কার কথা শোনা উচিত, কে এবার নেতৃত্ব দেবে! তারা তাই টরাইড প্রাসাদে হাজারে হাজারে ভিড় করল যেখানে ডুমার অধিবেশন বসে। তর্কবিতর্ক, চিৎকার, লাল পতাকা নিয়ে দৌড়োদৌড়ি, এবং 'লা মার্সেই' গানের মধ্যে ১২ মার্চ ডুমার প্রতিনিধিরা ঘোষণা করল, রাশিয়ায় জারের শাসন শেষ হল— সরকার চালানোর দায়িত্ব নিল ডুমা। অধিকাংশ প্রতিনিধি প্রোগ্রেসিভ ব্লকের, কিন্তু তারা সাহস পেল না একা সরকার চালানোর দায়িত্ব নিতে। সোশ্যালিস্টদের আহ্বান করা হল। 'এস. আর'-এর কেরেনস্কি রাজি হলেন প্রোগ্রেসিভ দলের সঙ্গে যোগ দিতে, কিন্তু মেনশেভিকরা রাজি হল না, বলশেভিকরা তখনো আত্মগোপন ক'রে আছে। এই দোটানার মধ্যে ক্যাডেট দল সরকার চালানোর দায়িত্ব নিল। তারা 'ডুমার জরুরি কমিটি' নামে একটি কমিটি তৈরি ক'রে সরকার চালাতে শুরু করল। অর্থাৎ শাসন, শৃঙ্খলা, আইন ইত্যাদি ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় নামল।

অবশ্য ডুমার আদেশ মানার মতো ধৈর্য রাশিয়ার কোথায়ও ছিল না। সোশ্যালিস্টরা তাদের সোভিয়েটগুলোর মাধ্যমে রাশিয়ার শাসনব্যবস্থা আপন হাতে তুলে নিল। দিকে দিকে সোভিয়েট গঠন করা চলল। টরাইড প্রাসাদেরই আর এক অংশে তৈরি হল এক্সিকিউটিভ কমিটি অফ দি সোভিয়েট, সংক্ষেপে এক্সকম। এতে যোগ দিল মেনশেভিকরা, এস. আর-এরা। এদের নির্দেশ নিয়ে কর্মীরা চলে গেল কারখানায় কারখানায়, সৈন্যদের ব্যারাকে ব্যারাকে, বিভিন্ন সোশ্যালিস্ট 'সেল'গুলোতে। দুটো কমিশন তৈরি করা হল, খাদ্য নিয়ে অনুসন্ধান করার জন্য, আর মিলিটারি ব্যাপারে অনুসন্ধান করার জন্য। এই কমিটিতে বলশেভিক দলও যোগ দিল, অবশ্য যারা জেল থেকে বেরুতে পেরেছিল। তবে এই কমিটির সংখ্যাগুরু অংশ ছিল বামপন্থী মেনশেভিকরা।

ডুমার আদেশের সঙ্গে এক্সকমের আদেশের কোনো সাদৃশ্য নেই, ফলে দুই আদেশের সংঘাত ছিল অনিবার্য। কার্যত সমস্ত রাশিয়াতেই তখন দুই ধরনের সরকার চলছিল, একটি ডুমার আর একটি সোভিয়েটের। ডুমার শাসনই স্বীকৃত হবার কথা, কেননা বহুদিন ধরেই ডুমা কাজ ক'রে আসছে, আইনের চোখেও ডুমা স্বীকৃত। পক্ষান্তরে সোভিয়েটগুলো আইনস্বীকৃত নয় এবং কীভাবে

সোভিয়েট চলবে সে বিষয়ে কারো কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই। কিন্তু দেখা গেল সোভিয়েটের উপরই লোকের আস্থা বেশি, ডুমার যেসব আদেশ সোভিয়েট সমর্থন করছে সেসব আদেশই লোকে মানছে, না হলে নয়। সোভিয়েটের পিছনে এইরকম বিপুল সমর্থন দেখে মেনশেভিকরা সে সময়েই চেষ্টা করলে ডুমার কর্তৃত্ব তখন নিয়ে নিতে পারত, কিন্তু তারা তা করল না। কেননা তখনো তাদের ধারণা, দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর কর্তৃত্বে দেশের উন্নয়ন সম্ভব, বুর্জোয়া গণতন্ত্র দেশের পক্ষে ভালো হবে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তখনো সময় হয় নি। সুতরাং ডুমাকে প্রবলতর করাই হচ্ছে দেশের কল্যাণের জন্য কাজ। কিন্তু ডুমা যারা চালাচ্ছে সেই ক্যাডেটদের প্রতি তাদের কোনো আস্থা নেই, বরং সন্দেহ, ক্যাডেটরা জারকে ফিরিয়ে আনার জন্য ষড়যন্ত্র করবে, সোভিয়েটগুলো ভেঙে ফেলার চেষ্টা করবে, যুদ্ধ চালিয়ে যাবে— শ্রমিকদের মাইনে বাড়ানো, আট ঘণ্টা কাজ করানোর প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি ভুলে যাবে।

এই দুই 'সরকারে'র মারামারি বেশ গুরুতর হয়ে দেখা দিল। সোভিয়েট একটা পরিকল্পনা করে, ডুমা তার জন্য দরকারি টাকা দেয় না। জারের পুলিশ নেই, তাদের কাজ চালানোর জন্য সমস্ত শ্রমিকের এক-দশমাংশের হাতে অস্ত্র তুলে দেবার পরিকল্পনা সোভিয়েট নিলে, ডুমা সবলে তার বিরোধিতা করে। পেট্রোগ্রাডের রাস্তা তখন অপেক্ষাকৃত শান্ত, কিন্তু রাশিয়ায় আইনশৃঙ্খলা ফিরে আসার কোনো সুস্থির চিহ্ন তখন নেই। টরাইড প্রাসাদও দুই দলে-- ডুমা আর এক্সকম— বিভক্ত।

টরাইড প্রাসাদের চেহারা তখন বিচিত্র। প্রাসাদের এক ছোট অংশে ডুমা কাজ করছে, কিন্তু বড়ো অংশ সোভিয়েট কমিটির আয়ত্তে। সেখানে দিন নেই রাত নেই সৈন্যরা আসছে, ছাত্ররা আসছে, শ্রমিকরা আসছে নির্দেশ নেওয়ার জন্য। কমিটির বৈঠকের কোনো শেষ নেই। মুহূর্তে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। ব্যাঙ্কের লোকেরা জানতে চায়, ব্যাঙ্ক কি খোলা হবে? রেলওয়ের কর্মীরা জানতে চায়, রেলগাড়ি কি বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে? সৈন্যরা জানতে চায় তারা কি ব্যারাকে ফিরে যাবে? কে তাদের খাবার ব্যবস্থা থাকবার ব্যবস্থা করবে? রেড গার্ড, যে অসংখ্য ছাত্র তরুণ কর্মীরা শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে, তাদের নির্দেশ দেবে কে? জারের অনুগত সৈন্যরা যদি টরাইড প্রাসাদ আক্রমণ করে, কে তাদের বিরুদ্ধে লড়বে? ছাত্ররা জারের মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার ক'রে প্রাসাদে নিয়ে আসছে, তারা কি প্রাসাদে আসবে? জারের গুপ্তচর বলে সন্দেহ

হচ্ছে যাদের তারা যাতে জনতার হাতে মার খেয়ে মারা না যায় তার ব্যবস্থা করবে কে ?

ইতিমধ্যে জার চেষ্টা করলেন পেট্রোগ্রাডে ফিরে আসার। সে খবর পেয়ে রেলের কর্মচারীরা ট্রেনটাকে গ্রেপ্তার ক'রে রাখল !

১৫ মার্চ ডুমা কমিটি নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের কথা ঘোষণা করল, প্রিন্স লিভভের নেতৃত্বে। তাতে কেরেনস্কিও স্থান পেলেন। এই কেরেনস্কির কার্যকলাপ তখন বিচিত্র। তিনি সোভিয়েটেও আছেন ডুমাতেও আছেন। তিনি ধনিক-শ্রেণীর হয়েও কথা বলছেন, গরিবশ্রেণীর হয়েও কথা বলছেন। কিন্তু সেই অসম্ভব গণ্ডগোলের সময় কেউই এইসব জিনিস অদ্ভুত বলে মনে করার সময় পাচ্ছে না। ডুমা এবং সোভিয়েট কমিটি একটা সিদ্ধান্তে এল যে, এই অস্থায়ী সরকার একটি কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি স্থাপন করবে সর্বজনীন ভোটাধিকার-বলে। কিন্তু সোভিয়েট দাবি করল, জারকে এই মুহূর্তে পদত্যাগ করতে হবে। সৈন্যবাহিনী ঢেলে সাজাতে হবে, পেট্রোগ্রাডের সেনাবাহিনী, যে এই বিপ্লবে মূল কাজটি সমাধা করেছে, তাকে রাজধানী পেট্রোগ্রাড থেকে সরানো চলবে না। সোভিয়েট তার বিখ্যাত ১ নং আদেশ জারি করল : সৈন্যরা তাদের অস্ত্র-ত্যাগ করবে না, তারা কমিটি তৈরি ক'রে সোভিয়েটে প্রতিনিধি পাঠাবে, সোভিয়েটের আদেশ মেনে চলবে, চাকরিস্থল ছাড়া অফিসার ও সাধারণ সৈন্যের কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। শুধু পদাতিক বাহিনী নয়, নৌবাহিনী এবং বিমানসেনাতেও এরকম নির্দেশ গেল। স্যালুট দেওয়া উঠে গেল, অফিসারদের হাতে অস্ত্র দেওয়ার ভার নিল এইসব নতুন কমিটিগুলো।

ডুমার কিন্তু এতদূর এগুতে মোটেই ইচ্ছা ছিল না। জার পদত্যাগ করুন কিন্তু তার বদলে নতুন জার আসুন, এই তার মনোবাসনা। কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার দেখে নিকোলাস তাঁর ট্রেনে বসেই পদত্যাগ করলেন, মনোনয়ন করলেন জারের পদে তাঁর ভাইকে। কিন্তু ভাই মাইকেলও সাহস পেলেন না তা গ্রহণ করতে। তিনিও পদত্যাগ করলেন। অত্যন্ত সহজেই জারের পতন হল। জারের 'শীতকালীন প্রাসাদে'র উপর উড়ল লাল পতাকা।

মার্চ বিপ্লব সমাধা হল, কিন্তু সমস্যার পুরো সমাধান কোথায়ও হল না। যুদ্ধের সমস্যা, সৈন্যবাহিনী চালাবার সমস্যা, শ্রমিকদের মাইনে বাড়ানো, আট ঘণ্টা কাজের সমস্যা কোনো কিছুরই সমাধান হল না। ইতিমধ্যে নানা মুনির নানা মত এই বিশৃঙ্খল সময়কে প্রায় উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তুলল।

সোশ্যালিস্ট নেতারা অনেকেই একে একে দেশে ফিরতে লাগল। বলশেভিক নেতা কামেনেভ ফিরে এসে বলশেভিকদের সংগঠন করলেন। সঙ্গে তাঁর সহযোগী স্ট্যালিন, আর আগে থেকেই যিনি কাজ করেছিলেন সেই মলোটভ। তাঁরা চালাতে লাগলেন 'প্রাভদা (সত্য) পত্রিকা। মেনশেভিক নেতারাও ফিরতে লাগল, এলেন সেরেটেলি, ড্যান এবং প্লেখানভ। তাঁরা চালাতে লাগলেন ইজভেস্তিয়া (সংবাদ)। গোর্কি ফিরে এসে চালাচ্ছেন নোভায়া ঝিজ্‌ন (নতুন জীবন)। কিন্তু এক দলের মতের সঙ্গে অন্য দলের মতের মিল হয় না। সবচাইতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল সৈন্যদলে। বিশেষ ক'রে রণাঙ্গনে। দেশে বিপ্লব হচ্ছে, দেশের লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসছে, তারাই শুধু যুদ্ধ করবে কেন? তাছাড়া শান্তির জন্য বিপ্লব হচ্ছে, তাহলে আবার যুদ্ধ চলছে কেন? সুতরাং দলে দলে তারা রণাঙ্গন ছেড়ে চলে আসা শুরু করল। যুদ্ধ চলবে কি চলবে না, তারও কোনো সিদ্ধান্ত হল না। জার্মানদের কাছে নতি স্বীকার করতে রাশিয়ানরা রাজি নয়, এই কল্পনায় অস্থায়ী সরকার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চায়। যুদ্ধ থামানো দরকার, কিন্তু চিরশত্রু জার্মানদের কাছে হেরে যাওয়া অকল্পনীয়, এই কল্পনায় মেনশেভিকরা যুদ্ধ চালাতে চায় না বটে, কিন্তু এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করতে চায় না। আর যদি যুদ্ধই করতে হয় তাহলে তার জন্য অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত কে করবে? যদি শ্রমিকদেরই তা উৎপন্ন করতে হয় তাহলে ওভারটাইম কাজ করতে হয়, দিনে আট ঘণ্টা কাজ করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয় না। পেট্রোগ্রাডের মতো সব শহরেই শ্রমিকদের সোভিয়েট তৈরি হয়েছে, কিন্তু কৃষকরা সেই শ্রমিকদের সংস্থার নির্দেশ মানতে রাজি নয়। সোভিয়েটের সঙ্গে ডুমার বিরোধ, অস্থায়ী সরকারের বিরোধ ক্রমাগত জটিল হয়ে উঠছে, কারণ দুই দলের উদ্দেশ্য পৃথক। এদিকে বাইরের দেশগুলো অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে একে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব দিয়েছে, ফলে এই সরকার আরো প্রবল হয়ে উঠছে।

একদিকে যেমন নেতাদের মধ্যে এই বিশৃঙ্খলা অন্যদিকে জনসাধারণের মধ্যে তেমনই দেখা গেল এক নতুন সমাজ তৈরি করার উন্মাদনা। ট্রাম চলা শুরু হল, কারখানায় কাজ আরম্ভ হল, ব্যাঙ্ক-কর্মীরা নিয়মিত যাওয়া-আসা শুরু করল, অস্ত্রভাণ্ডার আবার অস্ত্রে ভরে উঠতে লাগল। জনসাধারণের শৃঙ্খলাবোধের অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া গেল শহীদ দিবসে। বিপ্লবের সময় যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদের স্মৃতির উদ্দেশে ৫ এপ্রিল পেট্রোগ্রাডের দশ লক্ষাধিক জনতা নীরবে রাস্তায় হেঁটে গেল। রাস্তায় কোনো পুলিশ নেই, কোনো বিশৃঙ্খলাও নেই। সেন্ট

পিটার ও সেণ্ট পল দুর্গ থেকে কামানের একটিবার ধ্বনি শোনা গেল শুধু। কোনোরকম ধর্মানুষ্ঠান নয়, শুধু কফিনগুলো লাল রঙের, জনতা নিঃশব্দে এসে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে গেল। আবার এই জনতাই রাসপুটিনের মৃতদেহ কফিন থেকে বার ক'রে আবার লাঠি দিয়ে মেরে, পেট্রল ঢেলে, কাঠের আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারল। সারারাত বরফের উপর মৃতদেহটি জ্বলছে, অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখে নিশ্চিন্ত হল, জারের গুরু রাসপুটিন সত্যিসত্যি ধ্বংস হল।

একদিকে নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য, কাজ করার অক্ষমতা, অন্যদিকে নতুন সমাজ তৈরি করার জন্য জনসাধারণের উদগ্র ইচ্ছা— এ সময়ে দরকার একজন নেতার। সেই নেতা এলেন এপ্রিল মাসে। লেনিন।

১৬ এপ্রিল রাত্রে লেনিন পেট্রোগ্রাডে এসে পৌছলেন। যে বিচিত্র উপায়ে তিনি এলেন তা অনেক গুজবের কারণ হল। তিনি এলেন জার্মান সরকারের তত্ত্বাবধানে একটি ট্রেনে। জার্মানদের ধারণা ছিল, লেনিন যুদ্ধবিরোধী, সুতরাং লেনিন যদি রাশিয়ায় গিয়ে যুদ্ধ করতে পারেন তাহলে জার্মানির পূর্ব সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ক'রে যুদ্ধ করতে সুবিধা হবে। জার্মানদের এই ধারণাকে কাজে লাগালেন লেনিন। জুরিখে থাকার সময় তিনি শুনেছিলেন রাশিয়ার বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু বিপ্লবের নেতৃত্ব করছে বুর্জোয়াশ্রেণী। সুতরাং দেশে ফিরে এই নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে তুলে দেওয়া দরকার। কিন্তু দেশে ফিরবেন কী ক'রে? সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর মতো কয়েক-শো বিপ্লবী কর্মী তখনো লুকিয়ে আছেন, দেশে ফিরলেই তাঁদের জেলে পোরা হবে এই আশঙ্কায়। বলশেভিক নেতা জিনোভিয়েভ, মেনশেভিক নেতা মার্টভ, এস.আর নেতা ববরভ এবং আরো অনেকে। আইনগত উপায়ে দেশে ফেরা যাবে না, কারণ রাশিয়ান বলে তাঁরা জার্মানির শত্রু হিসেবে পরিগণিত, আবার মার্কসবাদী বলে তাঁরা পেট্রোগ্রাডের অস্থায়ী সরকারের শত্রু। একমাত্র উপায় জার্মানদের বিশ্বাস করানো, তাঁরা রাশিয়ানদের বোঝাবেন জার্মানদের সঙ্গে সন্ধি করতে। লেনিন এইভাবেই পেট্রোগ্রাডে পৌছলেন। যদিও পৌছনোর পর তাঁর শত্রুরা তাঁকে জার্মানদের গুপ্তচর বলে চালানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বিপ্লবের একনিষ্ঠ কর্মী লেনিনকে রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষকরা ভালোভাবেই জানত বলে এই প্রচার লেনিনের তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারে নি।

লেনিনের ফিরে আসা অস্থায়ী সরকার যে সুনজরে দেখবে না জানা কথা, কিন্তু

সোভিয়েট কমিটিও যে ভড়কে যাবে এটা অনেকেই জানত না। তাঁকে স্টেশনে অভ্যর্থনা জানাতে কে যাবে এই প্রশ্নেই বোঝা গেল লেনিনকে সকলেই ভয়ের চোখে দেখে। এমন কি কামেনেভের নেতৃত্বে যে বলশেভিক দল সোভিয়েট কমিটিতে কাজ করছিল তারাও ভয় পেয়ে গেল, কেননা সোভিয়েট কমিটি যে শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থ পুরো দেখছিল না, তা তারাও বুঝতে পারছিল। যুদ্ধের প্রশ্নেও তারা বলশেভিক নির্দেশ পালন করছিল না, যুদ্ধব্যবস্থা অটুট রাখার প্রস্তাবে সায় দিয়ে।

লেনিনের রাশিয়া প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য ইতিহাস হয়ে আছে। বিকেল থেকেই পেট্রোগ্রাডের ফিনল্যাণ্ড স্টেশন লোকে লোকারণ্য। সৈন্যরা তাদের ব্যাণ্ড নিয়ে তৈরি অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। পতাকায় ফেস্টুনে গেট সাজিয়ে লোকে তৈরি। এই অবস্থায় তাঁকে আর কোন সাহসে অস্থায়ী সরকার গ্রেপ্তার করবে!

লেনিন স্টেশনে নেমেই স্বাগত সম্ভাষণের উত্তরে যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে অস্থায়ী সরকার তো বটেই সোভিয়েট কমিটিও প্রমাদ গুণল। লেনিন বললেন দেশে বিপ্লব শুরু হয়েছে, তবে শেষ হয় নি, এটা শেষ করার দায়িত্ব নিতে হবে শ্রমিকদের আর কৃষকদের। নেতাকে ফিরে পেয়ে জনতা সবকিছু অমান্য ক'রে ছুটে গেল। লেনিনের বক্তৃতা শুনে তারা আরো উত্তেজিত। লেনিন বললেন, যুদ্ধ অবিলম্বে থামাতে হবে, দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। তখন উত্তেজনার স্রোতে সব বাধা কোথায় ভেসে গেল। অভ্যর্থনা সমিতির লোকেরা কোনোমতে লেনিনকে স্টেশন থেকে নিরাপদে বার ক'রে নিয়ে এল।

সারারাত সেদিন লেনিন ঘুমোলেন না। বদলে তৈরি করলেন তাঁর বিখ্যাত 'এপ্রিল থিসিস'। পরের দিন সমস্ত রাশিয়ার সোভিয়েটের বৈঠক। সেখানে লেনিন পেশ করলেন এপ্রিল থিসিস। তিনি বললেন, অস্থায়ী সরকারকে সবলে সরিয়ে ফেলতে হবে, তার বদলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সোভিয়েট সরকার, শ্রমিক ও কৃষকদের সরকার। সমস্ত ক্ষমতা যাবে সোভিয়েটগুলোর হাতে। বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করতে হবে, প্রয়োজন হলে সশস্ত্র শক্তি দিয়ে। সমস্ত জমি জাতীয়করণ করতে হবে, সমস্ত উৎপাদনব্যবস্থা সরকার হাতে নেবে। পুলিশ, মিলিটারি, আমলাদের দূর ক'রে দিতে হবে। বদলে সমস্ত শ্রমিক এবং কৃষক অস্ত্র হাতে তুলে নেবে। রণাঙ্গনে সৈন্যরা জার্মানদের সঙ্গে ভাব করবে, জার্মানিতেও যাতে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হয় তার জন্য সাহায্য করবে।

লেনিনের এই বক্তৃতা সোভিয়েটের অধিকাংশ প্রতিনিধি পাগলের প্রলাপ

বলে মনে করল। এমন কি তাঁর বলশেভিক সহকর্মী কামেনেভও পরের দিন প্রাভদা পত্রিকায় লেনিনের সমালোচনা করলেন। কিন্তু তলে তলে যে লেনিনের জনসমর্থন বেড়ে যাচ্ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল কয়েকদিন পরেই।

মে মাসের গোড়ার দিকে অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিলিউকভ গণ্ডগোল পাকালেন। তিনি ব্রিটেন ফ্রান্স ইত্যাদি মিত্রপক্ষীয় দেশগুলোকে জানালেন, জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে রাশিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই গোপন খবরটি রাষ্ট্র হয়ে গেল, দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। সোভিয়েট কমিটি এই বার্তার ব্যাখ্যা চাইল। রাস্তায় তখন পঁচিশ হাজারের বেশি সংখ্যায় জনতা ক্রুদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে মিলিউকভ কী জবাব দেন তার জন্য। মিলিউকভ উত্তরে পদত্যাগ করলেন। মিলিটারি গভর্নর কর্নিলভ অস্থায়ী সরকারের ভীরুতায় রুষ্ট হয়ে পেট্রোগ্রাড ছেড়ে রণাঙ্গনে চলে গেলেন।

এটা বোঝা গেল ক্যাডেটদের পক্ষে একা সরকার চালানো অসম্ভব। তারা চাইল সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রিসভা করতে। মে মাসের মাঝামাঝি তৈরি হল নতুন মন্ত্রিসভা, প্রিন্স লিভভের নেতৃত্বেই আবার। প্রোগ্রেসিভ ব্লকের দশজন আর সোভিয়েট কমিটি থেকে ছ-জন নিয়ে। বুর্জোয়াদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার জন্য সোভিয়েট কমিটি তখন লেনিনের আক্রমণ হওয়ার লক্ষ্য হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে ট্রটস্কি এসে গেছেন। অতীতে অনেকবার তাঁর সঙ্গে বলশেভিকদের মতানৈক্য হয়েছিল, কিন্তু এবার লেনিনের নেতৃত্বে তিনি কাজে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। এই দুই নেতাকে পেয়ে বলশেভিকরা ক্রমশ সঙ্ঘবদ্ধ হতে লাগল। কারখানায় কারখানায় সোভিয়েটে বলশেভিকরা সবল হয়ে উঠল। কর্মপন্থা পরিষ্কার, উদ্দেশ্য পরিষ্কার, সুতরাং যারা সত্যকারের মার্কসবাদী তারা পরিষ্কার মন নিয়ে বলশেভিকদের দলে যোগ দিতে লাগল। তাদের স্লোগান হল, বুর্জোয়া মন্ত্রীরা নিপাত যাক, সোভিয়েটের হাতে ক্ষমতা চাই, চাই রুটি, শান্তি, স্বাধীনতা। প্রাভদায় সম্পাদকীয় লেখা হল রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার জন্য।

সোভিয়েট কংগ্রেসে অবশ্য তখনো বলশেভিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। তাদের এই রাস্তায় জমায়েত হবার পরিকল্পনা স্বভাবতই কংগ্রেস অনুমোদন করল না। তারা পরিবর্তে ঘোষণা করল, ১ জুলাই সোভিয়েটের সব দলের কর্মীরাই যেন রাস্তায় জমায়েত হয়। বলশেভিকরা যে ক্রমশই সংখ্যায় বাড়ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল এই ১ জুলাইয়ের সমাবেশে।

সোভিয়েট কংগ্রেসের স্লোগান ছিল, যুক্তফ্রণ্ট সরকার বেঁচে থাক। কিন্তু কার্যত সমাবেশে শোনা গেল বলশেভিক স্লোগান, যুক্তফ্রণ্ট সরকার জনবিরোধী সরকার। সমাবেশে কিন্তু বলশেভিক নেতাদের দেখা গেল না, সকলেই তখন সরকারের হাতে নির্যাতনের ভয়ে আত্মগোপন করেছেন।

ইতিমধ্যে এটাও প্রমাণ হয়ে গেল মেনশেভিকবা ক্রমশই যুদ্ধের পক্ষে চলে যাচ্ছে। জার্মানি রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধিপ্রস্তাব ক'রে পাঠালো, উত্তরে অস্থায়ী সরকার আরো বড়ো আকারে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। সোভিয়েট কমিটি ঘোষণা করল, প্রত্যেকটি রাশিযানের যুদ্ধে নামা উচিত, কেননা এই যুদ্ধ জারের যুদ্ধ নয়, বিপ্লবের জন্য যুদ্ধ। দেশপ্রেমের বন্যা শুরু হয়ে গেল, কৃষকরাও সোভিয়েটে মিলিত হয়ে বলল, দেশের সম্মানের জন্য যুদ্ধ করতে তারা প্রস্তুত। সোভিযেট কংগ্রেসে যুদ্ধবিরোধিতা করল বলশেভিকরা, কিন্তু সংখ্যায় তারা ১০৫জন, যুদ্ধের পক্ষে ভোট দিল ২৪৮জন মেনশেভিক আর ২৮৫জন এস.আর।

জুন মাসে জেনারেল ব্রসিলভের নেতৃত্বে রাশিয়া বৃহদাকারে আক্রমণ চালালো জার্মানির উপর। কেরেনস্কি তখন যুদ্ধমন্ত্রী। প্রথম তিনদিন রাশিয়া জয়ী হযেছিল বটে কিন্তু তারপর জার্মানি পুরো প্রস্তুত হয়ে রাশিয়ানদের কচুকাটা ক'রে ছাড়ল। রণাঙ্গনে তখন প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা, সৈন্যরা তখন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাচ্ছে। এমন অবস্থা যে জেনারেল কর্নিলভ তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য, তাদের ভয় দেখানোর জন্য, তাদেরই উপর মেশিনগান চালালেন। কিন্তু কোনো কাজই হল না, সৈন্যদের মনোবল তখন একেবারে ভেঙে গেছে।

পেট্রোগ্রাডে যখন এই খবর পৌছাল তখন সাধারণ লোক অস্থায়ী যুক্তফ্রণ্ট সরকারের উপর প্রচণ্ড ক্ষেপে গেল। ভয় পেয়ে ক্যাডেটদের চারজন মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন। হতাশা, বিশৃঙ্খলা, বিক্ষোভ দেখা দিল। শুরু হল বিখ্যাত জুলাই দিনগুলো।

এর আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। জারের পতনের পর যখন জারের অনুগত বলে পরিচিত বড়োলোকদের ঐশ্বর্য লুঠ হবার উপক্রম হয়েছিল তখন নেভা নদীর তীরে একটা বিরাট প্যাগোডার মতো বাড়ি দখল ক'রে নিয়ে সেখানে বলশেভিকরা তাদের ঘাঁটি গেড়েছিল। এই প্রাসাদটি ছিল এক ব্যালে নর্তকীর। তিনি অবশ্য তারস্বরে আপত্তি জানিয়েছিলেন, বলশেভিকরা তাঁর সব ধনরত্ন চুরি 'ক'রে নিয়েছে বলে প্রচার করছিলেন। কিন্তু দেখা গেল বলশেভিকরা সেইসব ধনরত্নে হাতই দেয় নি, একটা ঘরে সেসব বোঝাই ক'রে

তারা তাদের কাজ ক'রে যাচ্ছিল। জুলাই দিনগুলোয় এই প্রাসাদটি হয়ে উঠল সবচেয়ে বড়ো কর্মকেন্দ্র।

জুন মাসে রাশিয়ার বিরাট পরাজয়ের খবর যখন পেট্রোগ্রাডে এসে পৌছল তখন অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল জনসাধারণের একাংশ। বলশেভিক নেতারা অবশ্য তখনই বলপ্রয়োগে ক্ষমতাদখল করার কথা ভাবছিল না, কিন্তু তাদের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা না করেই বলশেভিক সমর্থকরা রাস্তায় নেমে পড়ল। নেতৃত্ব দিল সৈন্যবাহিনীর একটি রেজিমেণ্ট, যারা বরাবরই বলশেভিকদের সমর্থক। নেভা নদীর তীরে বলশেভিক ঘাঁটি থেকে নেতার পর নেতারা এসে এই রেজিমেণ্টকে পরামর্শ দিল তখনই বিদ্রোহ ঘোষণা না করতে, কিন্তু রেজিমেণ্টের সৈন্যরা কোনো কথা না শুনে রাস্তায় বেরিয়ে এল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে। ভাইবর্গের কাছে কারখানাগুলোতে, যেখানে বলশেভিক প্রাধান্য, তাদের প্রতিনিধিরা গেল সমর্থন সংগ্রহের জন্য। ক্রনস্ট্যাটেও তারা গেল নৌবাহিনীর সমর্থনের জন্য। ১৬ জুলাই ৩০,০০০ শ্রমিক সৈন্যদের সমর্থন জানিয়ে কারখানা ছেড়ে বেরিয়ে এল, এগিয়ে চলল টরাইড প্রাসাদের দিকে। পথে মদের দোকান তামাকের দোকান সব লুঠ হয়ে গেল। রাজধানীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল। কোথা থেকে কারা যেন কাদের উপর গুলি চালাতে লাগল। ছোটাছুটি, মারামারি, কে কোন দলে, কে সরকারের বিরোধী, কে নয়, বোঝা মুশকিল।

১৭ জুলাই ক্রনস্ট্যাট থেকে ৬,০০০ নাবিক এসে যোগ দিল এই সৈন্য এবং শ্রমিকদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হল রেড গার্ডরা। টরাইড প্রাসাদের কাছে এরা যখন উপস্থিত হল তখন একজন মন্ত্রী বক্তৃতা দিতে উঠলেন। কিন্তু যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মন্ত্রীর কথা শোনার মতো ধৈর্য তখন কারুর নেই। ট্রটস্কি না থাকলে সেই মন্ত্রী হয়ত জনতার হাতে টুকরো টুকরো হয়ে যেতেন। অবস্থা জরুরি দেখে লেনিন ফিনল্যাণ্ড ছেড়ে এসে বলশেভিক ঘাঁটিতে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি সৈন্য নাবিক ছাত্র শ্রমিকদের অভিনন্দন জানালেন তাদের রোষপ্রকাশের ধরন দেখে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বললেন, খুব ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা ছাড়াই ক্ষমতাদখল করা যাবে না, সুতরাং তারা যেন বলশেভিক পার্টির নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু অশান্ত জনতা তখন যুক্তির জন্য প্রস্তুত নয়। লোকেরা সব নেতাদের তখন চেনেও না। কোথায় মন্ত্রীরা আছে, কোথায় বলশেভিকরা আছে, কোথায় কে বিপ্লবের জন্য কাজ করছে সেবিষয়ে কোনো ধারণা নেই।

কেবল প্রবল ইচ্ছা, বিপ্লবকে জয়যুক্ত করতে হবে। কার জন্য বিপ্লব, কার বিরুদ্ধে বিপ্লব সে সম্পর্কেও কেউ পরিষ্কার নয়। মজার মজার ঘটনা তাই ঘটতে লাগল অজস্র। টরাইড প্রাসাদ আক্রমণ করতে উদ্যত একদল সৈন্যকে যখন মেনশেভিক নেতা ড্যান বোঝালেন যে বিপ্লবের জন্য টরাইড প্রাসাদ আক্রমণ না ক'রে রক্ষা করা উচিত, তখন তারা প্রাসাদ রক্ষা করতে উঠে-পড়ে লেগে গেল। জনতা যখন মন্ত্রীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং মন্ত্রীরা টরাইড় প্রাসাদে লুকিয়ে আছে, তখন এই সৈন্যরাই মন্ত্রীদের বাঁচিয়ে দিল।

রাস্তায় তখন গুলি চলছে। প্রায় চারশো জন আহত কি নিহত হল। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ জনতা তখনো রাস্তায়। এমন সময় এলো বৃষ্টি। পুলিশের গুলি সৈন্যের গুলি যা করতে পারে নি বৃষ্টি তাই ক'রে দিল, জনতা ছত্রাকার হয়ে গেল। যেমন অকস্মাৎ জনতা উপস্থিত হয়েছিল তেমন অকস্মাৎ জনতা অন্তর্হিত হল। আসলে বিক্ষিপ্ত জনতাকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে সুচিন্তিত কর্মপ্রণালী স্থির ক'রে বিপ্লবী কর্ম সমাধা করবার জন্য কোনো নেতা বা দল তখন সেখানে ছিল না। তাই রোষবহ্নি মনে হল যেন বৃষ্টিতেই নিভে গেল। ১৯ জুলাই ক্রনস্ট্যাটের নাবিকরা সেণ্ট পিটার ও সেণ্ট পল দুর্গ অধিকার ক'রে বসেছিল— তারা যখন দেখল সব থেমে গেল, তারাও ফিরে গেল। ইতিমধ্যে সরকার একটি গোপন নথি বার ক'রে প্রচার করা শুরু করল যে লেনিন জার্মান গুপ্তচর। জনতার সকলেই বলশেভিক ছিল না, তাদের মধ্যে মেনশেভিক, এস. আর যেমন ছিল তেমন ছিল দলমতনির্বিশেষে সাধারণ লোক। তারা এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এল। জার্মানরা ইতিমধ্যে প্রবলভাবে আক্রমণ করেছিল, সুতরাং দেশপ্রেম আবার উথলে উঠল। কশাকদের এক বাহিনী প্রাভদা অফিস আক্রমণ ক'রে সব ভেঙেচুরে দিল ১৮ জুলাই। নর্তকীর প্রাসাদে বলশেভিকদের সেই ঘাঁটি আক্রান্ত হল। ১৯ জুলাই কেরেনস্কি লেনিন, কামেনেভ, জিনোভিয়েভকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা সব আবার আত্মগোপন করলেন পেট্রোগ্রাডের কাছে এক জঙ্গলে। ট্রটস্কি গ্রেপ্তার হলেন।

জুলাই দিনগুলো বলশেভিকদের পক্ষে অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কিন্তু মিথ্যা প্রচার বেশিদিন টেকে না। অচিরেই দেখা গেল লেনিনের সমর্থনে হাজারে হাজারে কর্মী আর সৈন্য এগিয়ে আসছে। কারণ, রাশিয়ার শাসনভার আপন-হাতে তুলে নিতে পারে এমন কোনো দলই তখন দেশে ছিল না, ব্যক্তি তো দূরের কথা। কেরেনস্কির অপদার্থতা বারেবারে প্রমাণিত হতে লাগল। বামপন্থী

দক্ষিণপন্থী উভয় দলকেই তুষ্ট রাখবার জন্য কোনো স্থির কর্মধারা নিতে তিনি অক্ষম হলেন। ইতিমধ্যে, অবশ্য প্রিন্স লিভভও পদত্যাগ করেছেন। ২০ জুলাই কেরেনস্কি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী হন। এই মন্ত্রিসভা কিন্তু দশদিনও টি*ঁকল না, সকলেই সকলকে সন্দেহ করে, এই অবস্থায় কোনো মন্ত্রিসভাই কাজ করতে পারে না। এর পর কেরেনস্কি বামপন্থী মন্ত্রীদের বাদ দিয়েই প্রায়, সবাইকেই প্রায় দক্ষিণপন্থী দল থেকে নিয়ে, মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। শক্তহাতে শাসন চালাবেন এমন একটা ভাব দেখা গেল, কিন্তু ঐ ভাব পর্যন্ত। ফলে জনসাধারণের অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে চলল। কারখানার পর কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দিকে দিকে ধর্মঘট। চারদিকে বেকারদশা। এই অবস্থার উন্নতি করার দিকে মন না দিয়ে মালিকপক্ষ দম্ভের সুরে বললেন— ধর্মঘট? খিদে পেলেই আবার সব সুড়সুড় ক'রে ফিরে আসবে। শ্রমিকরা একথা শুনে রেগে ফেটে পড়ল।

বলশেভিক দল একটু একটু ক'রে আবার সংগঠিত হচ্ছে। জুলাই দিনগুলোর আগে তাদের শেষ গোপন সভার সভ্য এসেছিল ১৫১ জন, প্রায় ৮০,০০০ শ্রমিকের প্রতিনিধি হয়ে, জুলাই মাসে যখন লোকের ধারণা বলশেভিক দল একেবারে ভেঙে গেল, তারপরই তাদের গোপন সভায় সভ্য এল ১৭৫ জন, প্রায় ১৭৭,০০০ শ্রমিকের প্রতিনিধি হয়ে। বলশেভিক দল বিপ্লবের মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে।

এই মুহূর্তটি এনে দিলেন জেনারেল কর্নিলভ। কেরেনস্কি তাঁকে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে তুলে দিয়েছেন, কিন্তু অস্থিরচিত্ত দুর্বলমতি কেরেনস্কিকে জেনারেল কর্নিলভ একেবারে সহ্য করতে পারেন না। দক্ষিণপন্থী দলগুলিও খুঁজছিল একজন কঠিন ধাতুতে গড়া নেতা, যাঁকে কেন্দ্র ক'রে তারা বামপন্থীদের একেবারে উৎখাত করতে পারে। কর্নিলভকে তখনকার রাশিয়ার কুখ্যাত কশাক সৈন্যরা খুবই ভক্তি করে। সুতরাং দক্ষিণপন্থী দলের প্ররোচনায় কর্নিলভ সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন কেরেনস্কিকে সরিয়ে দেবার জন্য। কেরেনস্কির ব্যক্তিগত ইচ্ছা যাই হোক না কেন, দক্ষিণপন্থী দলগুলির সঙ্গে মিলে গিয়ে সরকার চালনা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল, কারণ তাঁর সমর্থনকারী দলগুলো ছিল বামপন্থী। সুতরাং কেরেনস্কি-কর্নিলভের দ্বন্দ্বের সমাধান প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছাড়া অসম্ভব হয়ে উঠল। কর্নিলভের মতিগতি জানার জন্য কেরেনস্কি সর্বদলীয় একটি সভা ডাকলেন মস্কোতে। রাজধানী পেট্রোগ্রাডের উত্তেজিত অবস্থায় স্বাভাবিক মনোভাবে

কর্নিলভের সঙ্গে আপস করা সম্ভব নয় বলেই মস্কোতে তিনি এই সভা ডেকেছিলেন। কিন্তু সভার দিন মস্কোতে বলশেভিকরা ধর্মঘট ক'রে গাড়িঘোড়া অচল ক'রে দিল। হোটেল-রেস্টোরাণ্ট বন্ধ, সভায় অংশ গ্রহণকারীরা খাবার বা থাকার জায়গা পেল না। কোনোমতে সভা করা গেল, দক্ষিণপন্থীরা সরবে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার প্রতিজ্ঞা নিল। কেরেনস্কির আসল উদ্দেশ্য অবশ্য কর্নিলভের মতিগতি জানা। কেরেনস্কি জানেন কর্নিলভ তলে তলে ষড়যন্ত্র করছেন সরকারের পতনের জন্য, কর্নিলভও জানেন কেরেনস্কি সুযোগ খুঁজছেন কর্নিলভকে হঠানোর জন্য। কিন্তু উপরে উপরে দুজনই খুব স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা চালালেন। সভাতে অবশ্য একটা জিনিস প্রমাণ হয়ে গেল, যে সৈন্যদের ভরসায় কর্নিলভ সরকার দখলের কল্পনা করছেন সেই সৈন্যরা কর্নিলভের কথা শুনতেই চায় না। কেরেনস্কি আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু কর্নিলভ এবং তাঁর সহযোগীরা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, সৈন্যদলে শৃঙ্খলা তাঁরা ফিরিয়ে আনবেনই। সৈন্যবাহিনীতে সোভিয়েট ইত্যাদি কমিটি তাঁরা ভেঙে দেবেন। ফলে কর্নিলভের বিরুদ্ধে বলশেভিক ছাড়া অন্যসব বামপন্থীরা একজোট হল। বলশেভিকরা কোনো দলেই নেই।

কর্নিলভের পরিকল্পনা তৈরি। পেট্রোগ্রাডের রাস্তায় মারামারি লাগিয়ে দিয়ে রাজধানী রক্ষা করার নাম ক'রে তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজধানীতে ঢুকে পড়বেন। খবরটা অবশ্য ফাঁস হয়ে গেল। মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক ডেকে কেরেনস্কি সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে কর্নিলভকে বরখাস্ত করলেন। উত্তরে কর্নিলভ সৈন্য নিয়ে রাজধানী আক্রমণ করলেন।

বলশেভিকরা এবার রাজধানী রক্ষায় নামল। প্রায় পঁচিশ হাজার রেড গার্ড রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করল। রেলকর্মীরা রেললাইন উপড়ে ফেলে দিল। ক্রনস্ট্যাট থেকে নাবিকরা এসে পৌঁছল যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে। কারখানা থেকে ব্যারাক থেকে শ্রমিকরা সৈন্যরা বেরিয়ে এল রাজধানী রক্ষার জন্য। প্রতিরক্ষার নির্দেশ দিচ্ছে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট, যেখানে বলশেভিকরা প্রবল। উপায়ান্তর না দেখে কেরেনস্কি তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র তুলে দিলেন। লেনিন ফিরে এলেন।

৯ সেপ্টেম্বর কর্নিলভের সৈন্যরা যাত্রা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কারণও বিচিত্র। কর্নিলভের নির্দেশ ঠিকমতো সৈন্যদের কাছে পৌঁছয় না, অস্ত্রশস্ত্র ঠিকমতো তাদের হাতে দেওয়া হয় নি, গাড়িঘোড়াও যথেষ্ট নয়। এরই মধ্যে বলশেভিক কর্মীরা এসে তাদের মধ্যে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে গেল, বোঝালো

কর্নিলভের অসৎ উদ্দেশ্য। সৈন্যরাও কর্নিলভের পথ ছেড়ে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের অনুগামী হয়ে অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ ক'রে বিদ্রোহী হয়ে গেল। কর্নিলভের অনুগত সেনাপতিরা নিজের সৈন্যদের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে গেল। কর্নিলভ ও বাকি সেনাপতিদের কেরেনস্কি জেলে পুরলেন।

কর্নিলভকে শায়েস্তা করার পর কেরেনস্কি নিজেকে অত্যন্ত প্রবল বলে গণ্য করলেন। কিন্তু কার্যত তখন বলশেভিকদেরই পিছনে সমর্থন বেশি। কর্নিলভের ষড়যন্ত্রের পর জনসাধারণের আস্থা ফিরে এল তাদের উপর। পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটে বলশেভিকরা বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতায় একটা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিল, যাতে বলশেভিকদের কার্যসূচি পুরোপুরি নেওয়া হল : শুধুমাত্র সোশ্যালিস্ট-দের নিয়ে সরকার গঠন করতে হবে, জমির দখল দিয়ে দিতে হবে কৃষকদের সোভিয়েটদের কাছে, শ্রমিকরা কারখানা চালাবে, বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যাবতীয় গোপন চুক্তি পুড়িয়ে ফেলতে হবে, যুদ্ধ অবিলম্বে থামাতে হবে।

বলশেভিকরা তখন এতই বেশি শ্রদ্ধাভাজন যে ট্রটস্কি আর কামেনেভকে জেল থেকে ছাড়তে কেরেনস্কি বাধ্য হলেন। ট্রটস্কি এসেই, পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের কর্তৃত্ব নিয়ে নিলেন। প্রদেশে প্রদেশে সোভিয়েটগুলোতেও বলশেভিকরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ হয়ে উঠল। বিভিন্ন সোভিয়েট দখল ক'রে তারা ২ নভেম্বর সোভিয়েটের দ্বিতীয় কংগ্রেস ডাকল।

লেনিন ইতিমধ্যে দেশের চরিত্র, অবস্থা, গতি দেখে মনস্থির ক'রে ফেলেছেন। সশস্ত্র সংগ্রামের মুহূর্ত উপস্থিত। পেট্রোগ্রাড শহর দখল ক'রে নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মস্কো এবং বাল্টিক সাগরের নৌ-তরীগুলো। কংগ্রেস ডেকে বক্তৃতা দেওয়ার সময় এটা নয়। ২২ সেপ্টেম্বর গোপনে তিনি পেট্রোগ্রাডে উপস্থিত হলেন বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য।

বলশেভিকদের ঠেকানোর একমাত্র রাস্তা ছিল বিপক্ষ দলের কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি ডাকা। সোভিয়েটে সোভিয়েটে বলশেভিকদের আধিপত্য হলেও পুরো রাশিয়ায় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোট নিলে হয়ত বলশেভিকরা নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পাবে না, গণতন্ত্রের নাম ক'রে পাঁচমিশেলি সরকার তৈরি ক'রে তাদের ঠেকানো যাবে এই ভরসায় কেরেনস্কি সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে ২০ অক্টোবর প্রাক-সংসদ অনুষ্ঠান করা স্থির করলেন। এই অধিবেশনে মেনশেভিক এবং এস.আর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। ট্রটস্কি বলশেভিকদের নিয়ে প্রাক-সংসদ থেকে বেরিয়ে এলেন।

২৩ অক্টোবর। লেনিন সারারাত ধরে তাঁর প্রধান প্রধান সহযোগীদের তাঁর কাযপন্থা বোঝালেন— কেন অবিলম্বে সরকার দখল ক'রে নেওয়া উচিত। কিন্তু বলশেভিকরা তখন তেমন প্রবল নয়, জুলাই দিনগুলোর স্মৃতি তখনো বেশ মর্মান্তিক, তাই কামেনেভ আর জিনোভিয়েভ এই সশস্ত্র সংগ্রামের পথে তখনই নামতে রাজি নয়। কিন্তু লেনিন বাকি সব বলশেভিক নেতাদের রাজি করালেন। ২৫ অক্টোবর ট্রটস্কি একটি অস্ত্রের কারখানাকে নির্দেশ দিলেন, বলশেভিকদের হাতে ৫,০০০ রাইফেল তুলে দিতে। ট্রটস্কি সেখানকার কেউ নন, কিন্তু কারখানার কর্মীরা বিনা বাক্যব্যয়ে বলশেভিকদের হাতে রাইফেল তুলে দিল।

২৭ অক্টোবর বলশেভিক সেণ্ট্রাল কমিটির বৈঠকে লেনিন বললেন, দ্বিতীয় কংগ্রেসের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। সমস্ত রাশিয়ায় ৪ লক্ষ বলশেভিক কর্মী আছে, সুতরাং সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে পড়ার সময় হয়েছে। লেনিনের এই প্রস্তাব গোপন রাখার প্রয়োজনীয়তা কেউ মনে রাখল না। পেট্রোগ্রাডে লোকের মুখে মুখে রটতে আরম্ভ হল, বিপ্লব শুরু হল বলে। সংবাদপত্রেও এই নিয়ে গবেষণা চলল, কবে বিপ্লব শুরু হবে। কী ক'রে বলশেভিকদের ঠেকানো যায় তা নিয়ে সংবাদপত্রে পরামর্শও দেওয়া চলল।

এই সময় পেট্রোগ্রাডের কয়েকটি ঘাঁটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। শীত-কালীন রাজপ্রাসাদে কেরেনস্কি আর তাঁর মন্ত্রিসভা ঘাটি গেড়ে আছেন। প্রাক-সংসদের বৈঠক চলছে মেরিনস্কি প্রাসাদে। দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেসের এক্সিকিউটিভ কমিটি বসছে স্মলনি ইনস্টিটিউটে, কিন্তু সেখানে বলশেভিকদের আধিপত্য। টরাইড প্রাসাদে কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেমব্লি বসবে, তাই সেটাকে ফাঁকা রাখা হয়েছে।

এই সময়ে ট্রটস্কির অসাধারণ বাগ্মিতা বলশেভিকদের বিশেষভাবে সাহায্য করল। তিনি পেট্রোগ্রাডের সৈন্যবাহিনীকে বক্তৃতা দিয়ে উত্তেজিত ক'রে রাখলেন। দাবি করলেন পেট্রোগ্রাড মিলিটারি ডিস্ট্রিক্টের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে বলশেভিক কর্মীদের ডাকতে হবে। সেণ্ট পিটার ও সেণ্ট পলের সৈন্যরা বরাবরই বলশেভিক-বিরোধী ছিল। সেখানে ট্রটস্কি বক্তৃতা দিয়ে তাদের দলে টানলেন, প্রায় দশ হাজার অস্ত্র বলশেভিকরা পেল সেখান থেকে।

৪ নভেম্বর বলশেভিক কর্মীরা শান্তভাবে কিন্তু বিপুল সংখ্যায় রাস্তায় শোভাযাত্রা ক'রে তাদের শক্তি ও সংখ্যা প্রদর্শন করল।

পরের দিন কেরেনস্কি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেন। বলশেভিকদের

সোভিয়েট মিলিটারি রিভলিউশনারি কমিটি অবৈধ ঘোষিত হল। ট্রটস্কি প্রভৃতি নেতাদের গ্রেপ্তারের আদেশ বেরুল। বলশেভিকদের খবরের কাগজ বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। শুধু স্মলনি ইনস্টিটিউট আক্রমণ করাটাই বাকি রাখলেন কেরেনস্কি।

৬ নভেম্বর স্মলনি ইনস্টিটিউটের টেলিফোন-তার কেটে দেওয়া হল। বিশ্বস্ত সৈন্যরা বলশেভিকদের ছাপাখানাগুলো অধিকার ক'রে নেওয়ার জন্য, নেভা নদীর উপর থেকে বলশেভিক সমর্থক 'অরোরা' জাহাজটিকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আদেশ পেল। সৈন্যদের আহ্বান করা হল শহরে প্রবেশ করতে।

এর পাল্টা জবাব দিল রেড গার্ড। তারা ছাপাখানাগুলো রক্ষা করতে লাগল। দুপুর বেলায় উত্তেজনাময় খবর দিয়ে বলশেভিকদের খবরের কাগজ বেরুলো। স্মলনি ইনস্টিটিউট থেকে ট্রটস্কি নির্দেশ দিলেন, অরোরা জাহাজ যেন স্থানত্যাগ না করে। পেট্রোগ্রাডের সৈন্যরা তৈরি হল কাজের জন্য, ক্রনস্ট্যাটের নাবিকদের খবর দেওয়া হল শহরে চলে আসার জন্য। বলশেভিকরা বিদ্রোহী হয়েছে, লেনিন রাষ্ট্রদ্রোহী, প্রাক-সংসদে কেরেনস্কি এমন একটা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন।

এদিকে ৬ নভেম্বর সোভিয়েটের দ্বিতীয় কংগ্রেস শুরু হবে। ৫৬০ জন প্রতিনিধি এসেছে সমস্ত দেশ থেকে, তার মধ্যে ২৫০ জন বলশেভিক। স্মলনি ইনষ্টিটিউটেই অধিবেশন বসবে। হলে তিল ধারণের জায়গা নেই। প্রতিনিধিরা আগের রাত্রে সিঁড়িতে বারান্দায় যেখানে সেখানে ঘুমিয়েছে সেই তীব্র শীতের মধ্যেও। কেউ কাউকে প্রায় চেনে না, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে তর্ক করছে। অধিবেশনের সময় মেনশেভিক ড্যান উঠলেন, তীব্র চিৎকারে কিছু শোনা গেল না। ট্রটস্কি উঠলেন, বিরোধীদের সমস্বর কোলাহলে তাঁর বক্তৃতা বারবার বাধা পেল। কিন্তু এটা পরিষ্কার হয়ে গেল, পরের দিন অধিবেশনে বলশেভিকদের প্রস্তাবই পাশ হবে।

৭ নভেম্বর। বলশেভিকরা ক্ষমতায় এল। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে নতুন কিছু একটা ঘটল শহরে। দোকানপাট যথারীতি খোলা, লোকে যথারীতি অফিসে যাচ্ছে, রাস্তায় লোকজনের চলাচলের কোনো বিরাম নেই, থিয়েটার সিনেমা খোলা। কিন্তু তারই মধ্যে প্রায় নিঃশব্দে বিপ্লব ঘটে গেল।

বলশেভিক কর্মীরা ভোরবেলা রেলওয়ে স্টেশন, ব্যাঙ্ক, বিদ্যুৎ সরবরাহের স্টেশন, নদীর উপরে ব্রিজ, টেলিফোন-ভবন অধিকার ক'রে নিল। কোথায়ও

কোনো বাধা নেই। বাধা দেবে কে? বিশ্বস্ত সৈন্য খুঁজতে কেরেনস্কি রাজধানী ত্যাগ ক'রে গেলেন। সকাল দশটায় ট্রটস্কি ঘোষণা করলেন, অস্থায়ী সরকারের পতন হয়েছে, সোভিয়েট সরকার গঠন করছে। শীতকালীন প্রাসাদে মন্ত্রীরা হাঁ হয়ে সেই সংবাদ শুনল, শুনে কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। কশাকরাও চুপ। একটার পরে একটা প্রদেশ বলশেভিকদের সমর্থন ক'রে প্রতিনিধি পাঠাতে লাগল। কুড়ি হাজার রেড গার্ড রাস্তা পাহারা দিতে লাগল। সৈন্যবাহিনীও হয় চুপচাপ অথবা বলশেভিকদের পক্ষে। ক্রনস্ট্যাট থেকে নাবিকরা রওনা হয়েছে, যদি বলশেভিকদের প্রয়োজন হয়।

প্রাক-সংসদে অধিবেশন চলছে অস্থায়ী সরকারের অনুগত লোকদের। বলশেভিক-সমর্থক কিছু সৈন্য সেখানে গিয়ে তাদের সরে পড়তে আদেশ দিল, তারাও সরে পড়ল। সন্ধ্যা সাতটার সময় দেখা গেল এক শীতকালীন রাজপ্রসাদ ছাড়া আর সবই বলশেভিকদের দখলে। অবশ্য সেই প্রাসাদের অবস্থাও তখন শোচনীয়। সারাদিন ধরে সেখানকার সৈন্যরা একে একে কেটে পড়ছে। হাজার খানেক সৈন্য তখনো ছিল, বেশির ভাগই নতুন অফিসার আর মেয়ে-সৈন্য। সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় সেখানকার মন্ত্রীদের বলশেভিকরা বলল, হয় আত্মসমর্পণ করুন নাহলে কামান দেগে প্রাসাদ উড়িয়ে দেওয়া হবে। অরোরা জাহাজ থেকে একটা কামানের ফাঁকা আওয়াজ এল, সেণ্ট পিটার এবং সেণ্ট পল থেকে আর একটা। দু-একটা জানলার কাঁচ ভেঙে পড়ল, তাতেই শীতকালীন প্রাসাদের তখনকার শুম্ভ মেয়ে-সৈন্যদের সাহস ফুরিয়ে গেল। কিন্তু মন্ত্রীরা তখনো আত্মসমর্পণ করে নি, তাদের ভরসা কেরেনস্কি বা রণাঙ্গন থেকে বিশ্বস্ত সৈন্যরা যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়ে বলশেভিকদের হঠিয়ে দেবে। সারারাত ধরেই অল্প অল্প গোলাবারুদ এসে পড়তে লাগল প্রাসাদের উপর। রেড গার্ড প্রাসাদে ঢুকে পড়ে ভিড় করতে লাগল। ভোর রাত্রে তারা ঢুকে পড়ল যেখানে মন্ত্রীরা ছিল। তাদের গ্রেপ্তার ক'রে পাঠিয়ে দেওয়া হল সেণ্ট পিটার আর সেণ্ট পল দুর্গে।

এদিকে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের অধিবেশনে লেনিন আত্মপ্রকাশ করেছেন। ট্রটস্কি ঘোষণা করেছেন, বিনা রক্তপাতে বিপ্লব ঘটেছে। রণাঙ্গনে, প্রদেশে প্রদেশে টেলিগ্রাম গেল,-বিপ্লব ঘটে গেছে। সন্ধ্যা বেলা সোভিয়েটের দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। নতুন প্রেসিডিয়ামের নির্বাচন হচ্ছে। বলশেভিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পুরনো প্রেসিডিয়াম নেমে এল, নতুন প্রেসিডিয়াম প্ল্যাটফর্মের উপর উঠে দাঁড়াল। চৌদ্দজন বলশেভিক, সাতজন বামপন্থী এস.আর

এবং উক্রেনের প্রতিনিধি একজন। তিনজন মেনশেভিক আর একজন আন্তর্জাতিক মেনশেভিক নির্বাচিত হয়েছিল বটে, কিন্তু নতুন প্রেসিডিয়ামে তারা কাজ করতে রাজি হল না। বলশেভিকরা আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ হল ১৯০৩ সালের পর। তাদের নামকরণের সার্থকতা তারা প্রমাণ করল।

১৯১৭ সালের রাশিয়ার এই বলশেভিক বিপ্লবের বিচিত্র ঘটনাসমারোহ লক্ষ করার সময় মূল কথাগুলো মনে রাখতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। কারা এটা করল, কী তাদের উদ্দেশ্য এটা জানা নিতান্ত দরকার। সুতরাং মূল কথাগুলো, যা আগেই ছড়িয়ে ছড়িয়ে বলা হয়েছে, আর একবার সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক।

উনিশ শতকের মধ্যেই ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে বুর্জোয়া বিপ্লব হয়েছে, সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে। ধনতন্ত্র তখন তার বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে। রাশিয়ায় কিন্তু অন্য ব্যাপার, সেখানে তখনো আধা-সামন্ততন্ত্র আধা-ধনতন্ত্র চলছে। ১৮৬১ সালে কৃষকরা দাসত্ব-প্রথা থেকে মুক্তি পেয়েছিল, কিন্তু জমিদাররা তাদের শোষণ ক'রে তখনো নিজেদের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে যাচ্ছে। কৃষিব্যবস্থার কোনো উন্নতি ঘটে নি, দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে, কৃষকরা জমি ছেড়ে শহরে ভিড় করছে চাকরির আশায়। সাধারণ লোকেরও রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই।

১৮৬১-র পর থেকে ধনতন্ত্রের প্রসার খুব দ্রুতগতিতে শুরু হয় রাশিয়ায়। কিন্তু সম্যক প্রসারের বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়ালো জারের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন। অন্যদিকে আর এক বাধা শ্রমিকশ্রেণী। শ্রমিকরা ইয়োরোপের শ্রমিকদের কাছ থেকে মার্কসবাদে দীক্ষা পাচ্ছে, ফলে ধনতন্ত্রের শুস্ত বুর্জোয়াদের কাছে তারা ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯০৫ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ এইখানে। এটা ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব। সে-সময় যদি বুর্জোয়াশ্রেণী কৃষক ও শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিতে পারত তাহলে তখনই জার উৎখাত হয়ে যেত, বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। কিন্তু শ্রমিকদের আন্দোলনের তীব্রতা দেখে বুর্জোয়ারা ভয় পেল এবং অর্ধেক পথ এগিয়েই থেমে গেল।

পশ্চিম ইয়োরোপের পুঁজিবাদীরাও রাশিয়ার শ্রমিকদের শক্তি দেখে ভয় পেয়ে জারকে সাহায্য করতে লাগল রাশিয়ায় শিল্প গড়ে তোলার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় ক'রে।

রাশিয়ার বুর্জোয়াদের শক্তিহীনতা লক্ষ ক'রে লেনিন ঠিক করলেন বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভার শ্রমিকশ্রেণীকেই নিতে হবে। সাহায্য করবে কৃষকশ্রেণী। এদের উদ্দেশ্য হবে জারতন্ত্রের অবসান। এবং তার পরই বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে টেনে নিয়ে যেতে হবে সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ শুধু শ্রমিকশ্রেণীর, কিন্তু যেহেতু রাশিয়ায় কৃষকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন, সুতরাং জারতন্ত্রের উচ্ছেদে এদের সাহায্য নিতেই হবে। এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায়ও এদের সাহায্য নিয়ে এদের সচেতন ক'রে তুলতে হবে, সমাজতন্ত্রে যে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হবে তা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

১৯১৭ সালের মার্চ বিপ্লব সমাধা করেছিল শ্রমিক ও কৃষকরাই সৈন্যদের সাহায্য নিয়ে। প্রথম দিকে সমস্ত কৃষকশ্রেণী নিয়ে শ্রমিকরা জারতন্ত্রের অবসান ঘটালো। নভেম্বর বিপ্লবে গরিব কৃষকদের সাহায্য নিয়ে পুঁজিপতিদের উৎখাত করা হল। প্রতিষ্ঠা হল শ্রমিকের একনায়কত্ব। লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্রের প্রসার।

৯

চীন

অস্ত্রের চাইতে মানুষ বেশি শক্তিমান

৩ মে ১৯১৯। পিকিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র পিকিঙের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের ছাত্রদের আহ্বান করল একটি সভায়। সন্ধ্যার সেই সভায় প্রায় হাজারখানেক ছাত্র উপস্থিত হল। সভাতে শাণ্টুঙ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হল, উত্তেজিত বক্তৃতা দিলেন গুটিকয়েক ছাত্র। পরের দিন ৪ মে একটি ছাত্রসভা আহ্বানের প্রস্তাব পাশ হল। সেই সভায় সরকারের বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন তৈরি করবার প্রস্তাবও পাশ হল। শাণ্টুঙ সমস্যার মূলে যে আছে সরকারের এবং দেশের স্বার্থবিরোধী মন্ত্রীরা, সেই সম্বন্ধে দেশের লোককে ওয়াকিবহাল করতে হবে, প্যারিস বৈঠকে চীনের যেসব প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন তাঁদের কাছে পাঠাতে হবে টেলিগ্রাম— যাতে তাঁরা কোনো সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর না দেন। ৭ মে প্রতিপালন করতে হবে জাতীয় অপমান দিবস হিসেবে এবং সমস্ত ছাত্রনেতাদের একটি সমাবেশে আহ্বান ক'রে শোভাযাত্রা বার করতে হবে সরকারের বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে, এমনসব প্রস্তাবও পাশ হল। একটি ছেলে আঙুল কেটে দেওয়ালে লিখল, শিঙতাও ফেরত চাই। একটি ছাত্র উঠে বক্তৃতা করতে করতে কেঁদে ফেলল, বলল কোনো পরিষ্কার প্রস্তাব যদি এই সভায় নেওয়া না হয়, তবে সে আত্মহত্যা করবে।

সভা শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হল। এর আগে ও পরে স্কুলে স্কুলে ছাত্ররা গোপনে জমায়েত হয়ে পরের দিন শোভাযাত্রা কীভাবে বেরুবে সেই বিষয়ে পরিকল্পনা দিল। তিনজন মন্ত্রী যাদের জাপানের টাকা-খাওয়া লোক বলে অনেকেরই সন্দেহ হচ্ছিল তাদের বাড়ি আক্রমণ করারও পরিকল্পনা দেওয়া হল। বাড়িতে আগুন লাগিয়ে ওদের পুড়িয়ে মারতে হবে এমন সিদ্ধান্তও কয়েকজন নিল, যদিও প্রকাশ্যে তা ঘোষণা করল না।

কলেজের, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের প্রস্তাব ও পরিকল্পনা সম্পর্কে

একেবারে অনবহিত ছিল তা নয়। কিন্তু সরকারের দুর্বল বৈদেশিক নীতি, অসৎ মন্ত্রিসভা সম্পর্কে তারাও সহানুভূতিশীল ছিল না, ফলে তারা ছাত্রদের বিরুদ্ধে পরিষ্কার কোনো তিরস্কার উচ্চারণ করল না।

পরের দিন সকাল থেকেই পিকিঙের এক কলেজে ছাত্ররা জমা হতে লাগল। এই সভা ভেঙে দেবার জন্য এবং ছাত্রদের শোভাযাত্রা যাতে বের না হয় সেজন্য পুলিশ এসে ছাত্রদের বারবার অনুরোধ করল। ছাত্ররা কর্ণপাত করল না। স্কুলের ছেলেরা, কলেজের ছেলেরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে, সরকারী অফিসাররা তাদের পরামর্শ দিচ্ছে সরকারের কাছে আবেদপত্র পাঠাতে। ছাত্ররা তার উত্তরে জানাচ্ছে, আবেদপত্র পাঠিয়ে কোনো কাজ হবে না, চাই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এই উত্তর-প্রত্যুত্তর চিৎকারের মধ্যে প্রায় তিনহাজার ছাত্র রাস্তায় বেরিয়ে গেল। তাদের স্লোগান শুনে রাস্তার লোকেরা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে গেল, অনেকে উত্তেজনায় কেঁদে ফেলল। শান্তিপূর্ণ অবস্থাতেই শোভাযাত্রা এগুচ্ছে। কিন্তু মার্কিন, ব্রিটিশ, ফরাসি, ইটালিয়ান দূতাবাসের কাছে যেতে যেতেই উত্তেজনা বেড়ে উঠল। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে গেছে, তারা দূতাবাসগুলোর কাছে ছাত্রদের ঢুকতে দেবে না। এর মধ্যে সাধারণ লোকও ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সমবেত চিৎকার উঠল, বিশ্বাসঘাতকদের বাড়ি চলো। সঙ্গে সঙ্গে শোভাযাত্রার মোড় ঘুরে গেল। বিশ্বাসঘাতক তিন মন্ত্রীর নাম চিৎকার করতে করতে শোভাযাত্রা এসে পৌছল এক মন্ত্রী শাও জু-লিনের বাড়ি। পুলিশে-ঘেরা বাড়ির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ছাত্ররা— তাদের দাবি, শাও জু-লিনে এসে জবাব দিয়ে যান চীনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে কেন তিনি জাপানের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন। পুলিশ কিছুতেই তাদের ঢুকতে দেবে না, ছাত্ররা ঢুকবেই, প্রবল উত্তেজনা। ধস্তাধস্তি, এরই মধ্যে পাঁচটি ছেলে দেওয়াল টপকে বাড়ির ভিতর ঢুকে দরজা খুলে দিল। ছাত্ররা ঢুকে পড়ে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজল, কিন্তু মন্ত্রী তিনটিকে পাওয়া গেল না। তারা ততক্ষণে ছদ্মবেশে পালিয়েছে। ছাত্ররা বাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে দিল। পুলিশ বাধা দিচ্ছিল বা বাধা দেবার অভিনয় করছিল, কারণ তাদেরও সহানুভূতি ছাত্রদের দিকে। কিন্তু তারই মধ্যে কিছু ছাত্র কিছু পুলিশ আহত হল। একটি ছাত্র মারাও গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত চলল এই অবস্থা। সন্ধ্যার দিকে পুলিশের বড়োকর্তারা এল, ফলে পুলিশকে তাদের মনরক্ষার জন্য গুলি ছুঁড়তেই হল, গ্রেপ্তারও করতে হল। সামরিক আইন জারি হল। সমস্ত শহরে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেল।

ছাত্রদের এই আন্দোলন চীনের ইতিহাসে '৪ মে-র আন্দোলন' বলে বিখ্যাত হয়ে আছে। এমনিতে হয়ত এই আন্দোলন তেমন গুরুতর ছিল না, কিন্তু এই আন্দোলন সূত্রপাত করল চীনের নবজাগরণ, নতুন দিনের জন্য সংগ্রাম, বিপ্লবের পথে যুদ্ধ। ছাত্রদের এই উগ্র সংগ্রামের বিরুদ্ধে পুলিশ যে প্রায় নিষ্ক্রিয় ছিল, তার তাৎপর্য যে গূঢ়, একথা বুঝতে কারো বাকি রইল না। এর পর থেকে একের পর এক ঘটনা ঘটে যেতে লাগল, যার পরিসমাপ্তি ১৯৪৯ সালের বিপ্লব।

৪ মে-র আন্দোলনের কারণ জানতে হলে অবশ্য জাপানের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। চীনের মাটির উপর জাপানের লোভ বহুকালের। ১৮৯৫ সালে যুদ্ধে জিতে জাপান চীন থেকে কোরিয়া, ফরমোজা, পেস্কাডোর, লিআওটুঙ নিয়ে নিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে জাপান চীনের জার্মান-অধিকৃত অংশ শাণ্টুঙ নিয়ে নেয়। চীন যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু জাপান তার কোনো মর্যাদা না দিয়ে ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে শিঙতাও বন্দর অধিকার ক'রে নেয়।

১৮ জানুয়ারি ১৯১৫। জাপান গোপনে চীনের সরকারের কাছে পেশ করল তার একুশ দফা দাবি। এই দাবি মানতে হলে চীনের সার্বভৌমত্ব সরাসরি চলে যাবে জাপানের হাতে। যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে জাপান বেশির ভাগ দফাই চীনকে মানতে বাধ্য করে। মে মাসে চীন স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হল, শানটুঙ জাপানের প্রভাবান্বিত অঞ্চল ; ১৯০৫ সালে জাপান রাশিয়াকে হারিয়ে মাঞ্চুরিয়ার যে স্বত্ব পেয়েছিল সেটা চীন ৯৯ বছরের জন্য মানবে ; চীনের লোহা আর স্টীলের ব্যবসার অর্ধেক স্বত্ব জাপান পাবে ; এবং জাপানের অনুমতি ছাড়া চীন কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে দেশের কোনো অংশ ছেড়ে দেবে না।

চীন সরকার গোপনে যে জাপানের কাছে নতি স্বীকার ক'রে নিয়েছে, চীনের ছাত্ররা তা জানত। কিন্তু তাদের আশা ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার সময় এই অপমানকর চুক্তি ছিঁড়ে ফেলা হবে। প্রেসিডেণ্ট উইলসনের স্বায়ত্তাধিকার, সম্মানের সঙ্গে সন্ধি ইত্যাদি বড়ো বড়ো কথায় আশা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল সেইসব মহৎ মহৎ নীতি ইয়োরোপেই শুধু প্রযোজ্য, এশিয়াতে নয়। প্যারিসের শান্তিসভায় বিজয়ী মিত্রশক্তি মেনে নিল জাপান চীনে যে জায়গাগুলো দখল নিয়েছিল তা জাপানের দখলেই থাকবে। উইলসন উল্টে অভিযোগ করলেন, যুদ্ধে চীন যখন নিরপেক্ষই ছিল তখন চীন

জাপানের গোপন শর্ত মেনে নিল কেন? প্যারিসের শান্তিসভা চলতে থাকার সময়ই বোঝা গিয়েছিল শাণ্টুঙ জাপানের কবলে চলে যাবে, গ্রেট বৃটেন এবং ফ্রান্স গোপনেই জাপানকে শাণ্টুঙ দিয়ে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এ খবর এসে পৌঁছয় চীনে ১ মে। চীনের ছাত্ররা বুঝল, বিদেশী রাষ্ট্রগুলো তাদের ভড়ং বাদ দিলে আসলে সেই স্বার্থপর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধলিপ্সু দেশ ছাড়া আর কিছু নয়।

এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই চীনের ছাত্ররা রাজনীতিতে সচেতন হয়ে উঠছিল। রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্রশাসনে তারা আগ্রহ নিচ্ছিল, শাসনসংস্কারের জন্ম আন্দোলনে নামছিল। বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর হাতে নিরন্তর পরাজয় এবং অপমান সহ্য করতে হচ্ছিল তাদের, যে বিদেশী রাষ্ট্রগুলোকে তাদের পূর্বপুরুষরা কৃষ্টিহীন শিক্ষাহীন বর্বর বলে মনে করত। তার উপর ১৯১১ সালের বুর্জোয়া বিপ্লবের পর বিভিন্ন প্রদেশে যুদ্ধবাজ শাসকদের অকর্মণ্য নীতিহীন অর্থগৃধ্নু শাসনে দেশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক চরম দুর্দশা দেখা দিয়েছে— এতেও ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ। কোথায় চীন জগৎকে পথ দেখাবে, না জগতের চোখে চীন একটি পশ্চাৎপদ প্রায়-বর্বর দেশে পরিণত হয়েছে। এতে তাদের আত্মসম্মানবোধ ধিকৃত। অতীতে ছাত্ররাই চীনের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিল, অশিক্ষিত দেশে ছাত্ররা ছিল শ্রদ্ধার পাত্র, সুতরাং প্যারিস চুক্তির কথা শুনে ছাত্ররা যে ৪ মে-র আন্দোলনে নামবে, তা আর বেশি কথা কী!

এজন্য তারা প্রস্তুতও ছিল— সাংগঠনিক দিক দিয়ে। চীনের ছাত্ররা সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে থাকত— এক কলেজের ছাত্র এক হস্টেলে। ফলে মেলামেশা, আলাপ-আলোচনার সুযোগ বেশি। শহরে একত্রে থাকার ফলে গুরুজনদের নির্দেশ-প্রভাবের চাইতে ছাত্রনেতাদের প্রভাব তাদের মধ্যে অনেক বেশি পড়ত। তাদের মধ্যে অনেকেই বিদেশে পড়াশুনার জন্য যেত, ফিরে এসে তারা পশ্চিমী দেশগুলোয় দেখা রীতিনীতি সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল করত। ধর্মঘট, শোভাযাত্রা, বয়কট ইত্যাদির মাধ্যমে অভিযোগ জানানো এবং দাবি আদায় চীনে তখন নতুন হলেও বেশ ছাত্রপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অভাব-অভিযোগের কারণ যেমন শাসককুলের অকর্মণ্যতা, তেমনই চাকরির অভাব। আগে ছাত্ররা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে নিশ্চিন্তে চাকরি পেত। কিন্তু ১৯০৫ সালে সেই পরীক্ষা উঠে যায়। তারপর ছাত্রদের চিন্তা হল, পড়াশুনা শেষ ক'রে তারা কী করবে? সাধারণত, সরকারী চাকরি ছাড়া আর কোনো চাকরিই নেই। ফলে

এই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাদের সমাজ সম্পর্কে বেশি ভাবাতে শুরু করল। শাসকগোষ্ঠী সংস্কারে মন দেয় না, লোকে কী ভাবে তাতে কান দেয় না, ফলে ছাত্রদের বিক্ষোভ আন্দোলনে দানা বাঁধতে শুরু করে। সরকার যারা চালায় সেই আমলারাও ছাত্রদের থেকে দূরে— বয়সে, শিক্ষাদীক্ষায়। তারা বড়ো হয়েছে পুরনো আমলের শিক্ষাব্যবস্থায়, নতুন ছাত্রদের ভাবনাচিন্তা কী তা তাদের বোঝার নাগালের বাইরে।

১৯১১ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার পর থেকেই ছাত্রদের মধ্যে গোপন সমিতি গড়ে উঠতে শুরু করে ইতস্তত। শুধু তাদের মধ্যেই নয়, রাজনীতিকদের, ব্যবসায়ীদের, সাধারণ লোকের সকলেরই এই ধরনের গোপন সমিতি গড়ে ওঠে। সবই যে রাজনীতিক সমিতি তা নয়, কিন্তু ছাত্রদের সমিতির বেশির ভাগই রাজনীতিক। তাদের প্রিয় লেখক ক্রপটকিন এবং টলস্টয় সেখানে পড়া হয়, দর্শন হিসেবে প্রিয় হয়ে ওঠে নৈরাজ্যবাদ। নৈরাজ্যবাদী ভাবনাচিন্তা নিয়ে পত্র-পত্রিকা বেরুতে শুরু হয়। সমাজতন্ত্র নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়।

ছাত্ররা এবং ছাত্রদের এই ৪ মে আন্দোলন এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তার কারণ এ থেকেই উদ্ভূত হল দুটো আন্দোলন, কুওমিণ্টাঙের এবং কমিউনিস্ট পার্টির। ১৯৪৯ পর্যন্ত এই দুটো আন্দোলন চলেছে পাশাপাশি, যার সংঘর্ষ থেকে বিপ্লবের সাফল্যময় প্রতিষ্ঠা।

এখানে সংক্ষেপে ১৯১১ সালের বিপ্লবের কথা একটু জেনে নেওয়া ভালো। ১৯০৫ সাল থেকেই চীনে ছোট ছোট বিপ্লবী দল অত্যাচারী মাঞ্চু শাসন উৎখাত করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল। ১৯১১ সালের অক্টোবরে হ্যাঙকাওতে বিপ্লবীদের গুপ্তকেন্দ্র আবিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হল তা থেকে শাসকগোষ্ঠীর শক্তিহীনতাই প্রমাণ হল। নভেম্বর মাসে দুটো বিরোধী সরকারের গঠন হল, একটা পিকিঙে জাতীয় সংসদ মনোনীত জেনারেল উয়ান শি-কাই-এর কর্তৃত্বে, আর একটা নানকিঙে বিপ্লবীদের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সুন ইয়াত-সেন-এর নেতৃত্বে। ১৯১২ সালে ছ-বছরের সম্রাট পু-ই পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। ঐক্যের খাতিরে সুন ইয়াত-সেন উয়ান শি-কাই-এর হাতে কর্তৃত্ব ছেড়ে দিলেন— শি-কাই হলেন সার্বভৌম চীনের রাষ্ট্রপতি। নানকিঙ-সংবিধান অনুযায়ী গণতন্ত্র স্থাপিত হল, দুই সংসদ নিয়ে পার্লামেণ্ট তৈরি হল। শি-কাই কিন্তু ১৯১৫ সালে নিজেকে আবার সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। পরের বছর তাঁর মৃত্যুর পর আবার নানকিঙ-সংবিধান চালু হল, কিন্তু কার্যত প্রদেশে

প্রদেশে শাসনব্যবস্থা হাতে নিয়ে নিল বিভিন্ন যুদ্ধবাজ সামন্তরা। জাতীয় সরকার কেবল নামেই রইল।

মাঞ্চু রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘটে দেড়শো বছর আগে, যার প্রকাশ হয় তাইপিঙ বিদ্রোহে। দক্ষিণ চীনের প্রায় সবটাই জুড়ে এই তীব্র কৃষক বিদ্রোহ চলে, যদিও সবল হাতে শাসকগোষ্ঠী এই বিদ্রোহ দমন করে। তারপর প্রায় যাট বছর নিরুপদ্রব শাসন চলে। কিন্তু বোঝা গিয়েছিল চীনের জনসাধারণের মধ্যে এই প্রাচীনপন্থী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমা হচ্ছে। ১৯১১ সালের ব্যর্থ বিপ্লবের পর এই প্রাণচঞ্চলতা দেশের প্রায় সর্বত্রই দেখা দিল। বিপ্লবের পাচ বছরের মধ্যেই দেশের শাসনব্যবস্থা চলে গেল প্রাদেশিক সামন্তদের হাতে, যারা অত্যাচারের সাহায্যে নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে চলায় বিশ্বাসী ছিল। প্রত্যেক সামন্তের হাতে নিজের নিজের প্রদেশ, নিজের নিজের সৈন্য। সামন্তদের অনুচরেরা প্রদেশের শহর গ্রাম সব ভাগাভাগি ক'রে আপন আপন খোয়াল-খুশিতে শাসন চালায়। তারা নিজেরাই কর বসায়, শস্য কেড়ে নেয়, মেয়েদের উপর অত্যাচার করে, ছেলেদের জোর ক'রে নিজেদের কাজে লাগায়। দেখা গেল জোর যার মুলুক তার, সুতরাং প্রকৃত শক্তি চলে গেল সৈন্যদের হাতে—তাদের ইচ্ছাই হল আইন, তাদের ছাপা কাগজ হচ্ছে টাকা। সমস্ত চীন নামে একটা দেশ হলেও ভেঙেচুরে ছত্রাকার হয়ে গেল।

মাঞ্চু রাজত্বের সময়ে শাসকদের অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে বিদেশী রাষ্ট্র এসে চীনের পূর্ব উপকূল জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়েছিল। আক্রমণ ক'রে ভূমি দখল না ক'রে, ব্যবসায়িক সুবিধা আদায় ক'রে। চীনের নদীতে নদীতে বিদেশী বাণিজ্যজাহাজ, তাকে সাহায্য করতে বিদেশী রণতরী। চীনের রেলপথ বিদেশীদের কর্তৃত্বে। বাণিজ্যশুল্ক বসায় বিদেশীরা, তারাই তা আদায় করে। নতুন প্রাদেশিক সামন্তদেরও এই বিদেশীরা তেমন পাত্তা দিল না, যেমন দেয় নি মাঞ্চুদের। তবুও প্রাদেশিক সামন্তদের জন্য, যোগাযোগ রাখার জন্য তাদের দরকার হল এমন একটি সম্প্রদায় যারা জন্মগতভাবে চীনেরই লোক হবে কিন্তু কাজ করবে বিদেশীদের স্বার্থে। সুতরাং জন্ম হল নতুন এক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, নতুন ব্যাঙ্ক, নতুন দক্ষ কারিগর। এরা কাজ করবে বিদেশী কর্তৃত্বে চালিত কারখানায়, খনিতে, জাহাজে, রেলে। সামন্ততান্ত্রিক দেশে জন্ম হল একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, যার উচ্চাশা হল বুর্জোয়া সমাজে স্থান লাভ করা— বিদেশীদের সেবা ক'রে, নিজের দেশের জনসাধারণকে শোষণ ক'রে।

এই মধ্যবিত্তশ্রেণী তাদের শিক্ষাদীক্ষা পেল পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি থেকে। চীনে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হল, বিদেশী প্রথায় বিদেশী ভাবে তাদের শিক্ষিত করা হতে লাগল। তারা পড়তে লাগল অ্যাডাম স্মিথের, কার্ল মার্কসের, হেনরি জর্জের কথা। এদের মধ্যে যারা দেশকে ভুলতে পারে নি তাদের কাছে বিদেশীরাও অশ্রদ্ধার পাত্র। দেশের মুৎসুদ্দি সম্প্রদায়ও তেমন অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠল। দেশের কৃষকদের অসন্তোষের মুখপাত্র হয়ে উঠল এরা। এই শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে গজিয়ে উঠল কুওমিনটাঙ দল।

কুওমিনটাঙের দীক্ষা দিলেন স্থন ইয়াত-সেন। ক্যাণ্টনের লোক স্থন ইয়াত-সেন। হাওয়াইতে পড়াশুনা করেছেন, মাঞ্চু রাজত্বের বিরুদ্ধে যে-কটা বিদ্রোহ হয়েছে তার সব-কটাতে অংশ নিয়েছেন এবং তারপর পালিয়ে পালিয়ে থেকেছেন জাপানে, আমেরিকায় আর ইয়োরোপে। স্থন ইয়াত-সেনের মন্ত্রশিষ্য চীনের সর্বত্র, এমনকি প্রাদেশিক সামন্তরাও তাঁর বাণী উচ্চারণ না ক'রে কাজ করে না, যদিও বাণীর সঙ্গে কাজের কোনো সামঞ্জস্য নেই।

স্থন ইয়াতের বক্তব্যের তিনটি মূলমন্ত্র: দেশপ্রেম, গণতন্ত্র এবং জীবিকা-সংস্থান। প্রথমটির অর্থ বিদেশীদের চীন থেকে তাড়াতে হবে, তাদের হাত থেকে অত্যাচারের যন্ত্রগুলো কেড়ে নিতে হবে, চীনের শাসন গ্রহণ করবে চীনের সাধারণ লোক। দ্বিতীয়টির অর্থ চীনের ঐক্য এবং সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে এনে, চীনের সাধারণ লোকদের শিক্ষিত ক'রে তুলে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে চীনের রাষ্ট্রক্ষমতা। তৃতীয়টির অর্থ সাধারণ লোকের জীবিকাসংস্থানের জন্য সমস্ত মৌলিক শিল্পসংস্থানগুলোর রাষ্ট্রীয়করণ করতে হবে, নতুনভাবে অর্থনীতির বিন্যাস করতে হবে, কৃষকদের উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের হাতে জমি ছেড়ে দিতে হবে।

স্থন ইয়াতের চিন্তাশীলতা যতটা ছিল ততটা অবশ্য কর্মদক্ষতা ছিল না। যে বিশাল দেশের উন্নতির জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন সেই দেশের বিশাল জনসংখ্যাকে আপন দলে টেনে, তাদের শিক্ষিত ক'রে কর্মে উদ্বুদ্ধ করার সাংগঠনিক ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বিদেশীদের অপসারণ করার জন্য, প্রাদেশিক সামন্তদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য দরকার নীতিবোধসম্পন্ন সৈন্যবাহিনী। ফলে বহুদিন ধরে তিনি স্বপ্ন দেখলেও, স্বপ্ন কাজে পরিণত করার ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তে এল না।

সুযোগ এল ১৯২০ সাল নাগাদ। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা হয়েছে,

আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের জন্য রাশিয়ার নেতৃত্ব চীনকে সাহায্য করতে উৎসুক। শুধু বাণী দিয়ে নয়, সাংগঠনিক নেতা পাঠিয়ে, সৈন্য পাঠিয়ে। চীনের মধ্যবিত্ত শ্রেণীও তৈরি। ৪ মে-র আন্দোলন তাদের মধ্যে সাড়া এনেছে। ১৯২৩ সাল নাগাদ প্রাদেশিক সামন্তরা রাজি হল। স্থন ইয়াত ক্যাণ্টনে একটি প্রাদেশিক সরকার গঠন করলেন। এই সরকার রাজনৈতিক এবং সামরিকভাবে বিপ্লবের জন্য ভূমি তৈরি করতে প্রস্তুত হল। ইতিমধ্যে চীনে কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হয়েছে, রাশিয়া থেকে মাইকেল বোরোদিন এসেছেন গণসংগঠন করার জন্য। কমিউনিস্টরা কুওমিনটাঙদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে রাজি হল।

১৯২৫ সালে স্থন ইয়াত-সেন মারা গেলে কুওমিনটাঙের নেতৃত্ব নিলেন চিয়াঙ কাই-শেক। চিযাঙের কর্মদক্ষতায মুগ্ধ হয়ে রাশিয়ানরা তাঁকে নিয়ে গেলেন রাশিয়ায় দু-মাসের জন্য। ১৯২৬ সালে শুরু হল বিখ্যাত 'উত্তরদিকে যাত্রা'— কুওমিনটাঙ আর কমিউনিস্টদেব মিলিত যাত্রা।

ক্যাণ্টন থেকে যাত্রা ক'রে উত্তরে ইয়াংসি উপত্যকা পযন্ত এরা চলল প্রাদেশিক সামন্তদের হাত থেকে চীনকে উদ্ধার করতে। নেতা চিয়াঙ। যে বাহিনী চলল তারা যে সম্পূর্ণভাবে সামরিক অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত তা অবশ্য নয— বিদেশী সৈন্যদের ফেলে দেওয়া অস্ত্র। রাশিয়ান মন্ত্রণা। সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই আবার প্রাদেশিক সামন্ত যারা নতুন দেশপ্রেমে জাগ্রত। আগে যাচ্ছে রাজনৈতিক কর্মীরা। কুওমিনটাঙ এবং কমিউনিস্ট উভয দলেরই পথে যেসব গ্রাম পড়ছে তার সমস্ত কৃষকদের রাজনৈতিক এবং সামরিকভাবে উদ্বুদ্ধ করতে করতে এরা এগুচ্ছে। কারখানার শ্রমিকরা পথের মধ্যে এদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। এই নতুন ধরনের সৈন্যবাহিনী বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে প্রদেশগুলো আপন প্রভাবে আনতে আনতে হ্যাঙকাও পৌছল। সেখানকার শ্রমিকরা আগে থেকেই প্রস্তুত, ধর্মঘট ক'রে ক'রে তারা শাসকগোষ্ঠীকে বিপর্যস্ত ক'রে তুলেছে। হ্যাঙকাও করায়ত্ত ক'রে এই বাহিনী পূর্বমুখী হয়ে ইয়াঙসি উপত্যকায় পৌছল— পথে নানকিঙ জয় ক'রে সাঙহাই-এর দিকে।

সাঙহাই দখলের কাহিনী, অত্যন্ত উত্তেজনাময়। সেখানে বিদেশীদের প্রচণ্ড প্রভাব। কিন্তু দক্ষিণ থেকে আসছে নানা উত্তেজক কাহিনী। ফলে জাহাজী কোম্পানিতে, কারখানায় শুরু হয়ে গেল ধর্মঘট—সেগুলো বন্ধ হয়ে গেল। চীনা সৈন্যরা বিদেশী দেখলেই মেরে ফেলছে।

২১ মার্চ, ১৯২৭। কমিউনিস্ট উদ্যোগে সাংহাই বন্ধ। সশস্ত্র শ্রমিকরা দেশের প্রথম সফল বিপ্লবের সূচনা করল। পুলিশ স্টেশন, সরকারী বাড়ি, কারখানাগুলো সব শ্রমিকদের দখলে। তখনো চিয়াঙের বাহিনী এসে পৌঁছয় নি। তার আগেই কমিউনিস্ট কর্মীরা সাংহাই দখলে আনল।

এর পরেই ঘটল, তিন সপ্তাহের মধ্যেই, পৃথিবীর অন্যতম ক্রুর বিশ্বাসঘাতকতা। হঠাৎ একদিন সকাল থেকেই বন্দরের গুণ্ডাবাহিনী চিয়াঙের দলের হয়ে কমিউনিস্ট নিধনে নিয়োজিত হল। চিয়াঙ বিদেশীদের আশ্বাস দিলেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই, বিদেশীদের সাহায্যের জন্য তাঁর কুওমিনটাঙ বাহিনী আছে। চিয়াঙের বিশ্বাসঘাতকতায় নিহত হল শত শত শ্রমিক। কুওমিনটাঙের অনেক সদস্যও চিয়াঙের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে হ্যাঙকাও-তে বামপন্থী কুওমিনটাঙ গঠন করল। ভাঙা পার্টিকে জোড়া লাগিয়ে চিয়াঙ ক্যাণ্টন থেকে তাঁর কেন্দ্র সরিয়ে নিলেন ইয়াঙসি উপত্যকায়। নবোদ্যমে শুরু করলেন তাঁর চীনশাসন— সহায় বিদেশীরা এবং দেশীয় আমলা। সুনের 'তিন নীতি'র অনেকাংশই অস্পষ্ট, তাই তিনি ১৯৩৫ সালে শুরু করলেন তাঁর 'নতুন জীবন' আন্দোলন। আসলে তাঁর উদ্দেশ্য কমিউনিস্টদের প্রতিহত ক'রে জাতীয়তা প্রচার ক'রে পুরো দেশকে তাঁর অধীনে আনা। যে কনফুসিয়াসকে দেশের তরুণ এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীনপন্থী বলে ত্যাগ করেছিলেন, চিয়াঙ তার পুনরুভ্যুদয় করিয়ে, পুরনো নীতিকথা প্রচার করিয়ে, চীনের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার বিষম চেষ্টায় রত হলেন। আসলে এই নতুন জীবন আন্দোলন নেহাতই কথার কথা, দেশের কৃষকসমাজকে পুনর্গঠিত করার জন্য যে সার্বিক প্রচেষ্টা দরকার, তার কোনো চিহ্নই এতে নেই। এই নতুন জীবন আন্দোলনের স্তম্ভ হল শহরের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আর জোতদারেরা। ৪ মে-র তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশীলতা এর মধ্যে অনুপস্থিত, পুরনো ধর্ম আঁকড়ে ধরে তারা চাইল চীনকে জাগাতে। কেউ কেউ খ্রীস্টান হয়ে গেল। চিয়াঙও খ্রীস্টান হলেন তাঁর খ্রীস্টান স্ত্রীর প্রেরণায়। কনফুসিয়াস আর খ্রীস্টের এই বিচিত্র সংমিশ্রণের সঙ্গে চীনের বিরাট জনসমষ্টির কোনো সংযোগই ছিল না। এই মিশ্রণের ফলে যে বিচিত্র তত্ত্ব হল, তার সারমর্ম মাদাম চিয়াঙ কাই-শেক এইভাবে বলেছিলেন: 'লি' অর্থাৎ ভদ্রতা; ভদ্রভাবে লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। 'ই' অর্থাৎ জনসেবা; সম্পত্তি নিজের ভোগে না লাগিয়ে পরের সেবায় নিয়োগ করতে হবে। 'লিয়েন' অর্থাৎ সততা এবং অন্যের সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা; আমলারা এই নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনসেবা

করবে। ‘চি’ অর্থাৎ সম্মান; আত্মসম্মানের সঙ্গে কাজ করলে কেউই কখনো নিচু কাজ করবে না।

কিয়াঙসি প্রদেশে, যেখানে কুওমিনটাঙ প্রভাব নির্ভেজাল, সেখানে শুরু হল এই আন্দোলন। সেখান থেকে আরো দশটি প্রদেশে প্রচার চালানো হল। কিন্তু দেখা গেল শুধু কথায় কাজ হয় না। এই চারটি সর্বস্বীকৃত নীতি জীবনে প্রয়োগ করতে হলে দরকার যে কর্মপদ্ধতি সেই কর্মপদ্ধতিরই কোনো চিহ্ন নেই নতুন জীবন আন্দোলনে।

কথার আড়ালে আসল ঘটনাটি কী? ৪ মে-র আন্দোলনে প্রকৃত উদ্বুদ্ধ যুবগোষ্ঠী তখন কমিউনিজমে বিশ্বাসী হয়ে চীনের কৃষকসমাজ, শ্রমিকসমাজ এবং ছাত্রসমাজে কাজ করছে। চীনের জনজাগরণের উদ্দেশ্য কী? কুওমিনটাঙের উদ্দেশ্য, চীনের মধ্যবিত্তের স্বার্থ— কমিউস্টদের উদ্দেশ্য, কৃষকের স্বার্থ।

চিয়াঙ হয়তো তাঁর উদ্দেশ্যে সার্থক হতেন যদি চীনের সমাজের গোড়াতে গিয়ে আঘাত করতে পারতেন। সামন্ততন্ত্রের স্তম্ভ হল চীনের কৃষকরা, যাদের জোতদাররা পুরনো কায়দায় শোষণ ক’রে যাচ্ছিল। শহরে শ্রমিকরা বিদেশীদের এবং ধনীদের হাতে অত্যাচারিত হচ্ছিল। কুওমিনটাঙ এবং চিয়াঙ এই স্তম্ভ-গুলো নতুন ক’রে সাজিয়ে নতুন সমাজের বিন্যাস করতে পারেন নি। একই সঙ্গে কুওমিনটাঙ আর কমিউনিস্টরা উত্তরদিকে যাত্রা করেছিল। পথে পথে কুওমিনটাঙ চীনের কৃষক ও শ্রমিকদের জাগাতে পারে নি, কমিউনিস্টরা পেরেছিল। এদের সঙ্গে সংযোগ না রেখে চিয়াঙ তাঁর সমর্থনে আনলেন অভিজাত সম্প্রদায়, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং সৈন্যবাহিনী। জার্মানি থেকে তিনি আনলেন নতুন নতুন অস্ত্র আর যোদ্ধা। তাঁর কর্মকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো হোয়ামপোয়া অ্যাকাডেমি। এখানকার শিক্ষিত মিলিটারি অফিসাররাই হল তাঁর দোসর। চীনকে চিয়াঙ দেখলেন এদের দৃষ্টি দিয়ে।

মিলিটারি ছাড়া আর যারা ছিল চিয়াঙের দলে তারা হল আমলা সম্প্রদায়। চিয়াঙ তৈরি করলেন চীনের ইতিহাসে প্রথম অর্থমন্ত্রণালয়, রেলদপ্তর, শিল্প-দপ্তর। তৈরি হল কৃষি-গবেষণাকেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। এতে বেড়ে উঠল যে আমলারা, তারা দেশের কাজে এই কেন্দ্রগুলো না লাগিয়ে লাগালো আপন স্বার্থে।

চিয়াঙের শাসনের এই চার স্তম্ভ: জোতদার, ব্যবসায়ী, মিলিটারি আর আমলা। মধ্যমণি অবশ্য চিয়াঙ নিজেই। মধ্যে মধ্যে রেগে গিয়ে তিনি সরকার

থেকে সরে দাঁড়াতেন, সরকার টলমল ক'রে উঠলে ফিরে এসে কঠিনতর হাতে বল্‌গা ধরতেন। নতুন কুওমিনটাঙ হয়ে উঠল চিয়াঙের স্বেচ্ছাচারক্ষেত্র। সুন ইয়াত-সেনের তিন নীতির সঙ্গে কুওমিনটাঙের নীতির আমূল প্রভেদ। যে জনসাধারণের জন্য সরকার বলে সুন ভাবতেন, চিয়াঙ সেই জনসাধারণকে ভাবতেন মূর্খ— যেদিকে তিনি চালাবেন সেদিকে তারা চলবে। আর তাঁর চালানোর অস্ত্র ছিল গোপন পুলিশ, যারা দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়, খোঁজখবর রাখে আর চিয়াঙকে সংবাদ পরিবেশন করে। জনগণের বাক্-স্বাধীনতা চিয়াঙ কেড়ে নিলেন। প্রেস আর বিশ্ববিদ্যালয়ে চিয়াঙ যা ভাবেন তাই প্রচারিত হয়। নির্বাচনের কোনো বালাই নেই, চিয়াঙের হুকুমই সরকারী নির্দেশ।

চীনের সুখসমৃদ্ধি আনতে চিয়াঙের কুওমিনটাঙ যে অসমর্থ হবে তা এর বুর্জোয়া চরিত্র থেকে বোঝা গিয়েছিল। এর বদলে দরকার ছিল যে কৃষক ও শ্রমিকদের পার্টি, সেই পার্টি গড়ে তুলল কমিউনিস্টরা।

১৯২০ সালে শুরু ক'রে ১৯৩০ সালের মধ্যেই চীনের শ্রমিকসমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। শ্রমিক সঙ্ঘ, প্রতিবাদসভা, ধর্মঘট ইত্যাদি ঘটতে শুরু করে প্রায় প্রত্যেকটি বড়ো বড়ো শহরে। হিংস্র কার্যকলাপ, রক্তপাত প্রায়ই ঘটতে লাগল। মালিকদের কাছ থেকে দাবিদাওয়া আদায়, নতুন নতুন ইউনিয়নের জোরদার হয়ে ওঠা ইত্যাদির মধ্যে শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে লাগল। যুদ্ধের সময় তাদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। জমি থেকে উৎখাত হাজারে হাজারে কৃষক কারখানায় কারখানায় ধর্না দিচ্ছে, যেখানে কাজের সময় সাংঘাতিক বেশি, মাইনে সাংঘাতিক কম। কারখানার মালিকরা তাতে আরো পেয়ে বসল। ১৯২১ সালে সংগঠিত হল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। লিউ শাও-চি, লি লি-সান, চাঙ কুও-তাও অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে কারখানার শ্রমিকদের কমিউনিস্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করলেন। ১৯২২ সালে ঘটল হঙকঙের নাবিকদের ধর্মঘট। ১৯২৩ সালে ঘটল পিকিঙ-হ্যাঙকাওয়ের রেলকর্মীদের ধর্মঘট। এর মধ্যে ঘটেছিল আরো প্রায় শ'খানেক ছোটবড়ো ধর্মঘট, যাতে যোগ দিয়েছিল প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিক। বেশির ভাগ ধর্মঘট সফল। এই ধর্মঘটের সময় প্রাদেশিক সামন্তরা ও বিদেশীরা যেভাবে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই গিয়েছিল, তাতে শ্রমিকদের চিনতে বাকি ছিল না তাদের প্রকৃত শত্রু কে!

শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠছিল কৃষকরা। তারা এতকাল নিষ্ক্রিয় হয়ে বসেছিল তা নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৌদ্ধ 'শ্বেতপদ্ম' বিদ্রোহ করেছিল

তারাই। তাইপিঙ বিদ্রোহও তাদের। উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে তারা বিদ্রোহ ক'রে আসছিল, তবে প্রকাশ্য সজ্ঘটিত বিদ্রোহের সংখ্যা কমে আসছিল। ৪ মে-র আন্দোলনের পর বিপ্লবীরা কৃষকদের সঙ্গে মিলিত হল। ছাত্ররা চলে গেল গ্রামে গ্রামে। কোয়াঙটুঙ প্রদেশে পেঙ পাই স্থাপন করলেন কৃষকসভা। ১৯২৪ সাল নাগাদ তাতে পঁচাত্তর হাজার কৃষক সভ্য হল। হোনানে কৃষকসভার সদস্য হল দু লক্ষ সত্তর হাজার। হুনান প্রদেশে এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার। আন্তঃচীন কৃষকসভা সংগঠনের সভাপতি নিযুক্ত হলেন মাও সে-তুঙ। ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হল কোয়াঙটুঙে প্রথম সোভিয়েট সরকার।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয় ১৯২১ সালের জুলাই মাসে সাঙহাইতে। কমিনটার্নের উপদেষ্টা এলেন, একটি ছোট মার্কসবাদী দল গঠিত হল। সমস্যা হল সংগঠন করার— টাকাপয়সা নেই, অভিজ্ঞতা নেই, বন্ধু নেই। প্রাদেশিক সামন্তরা সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি, কুওমিনটাঙ বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, কারো কাছ থেকে সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। তবু স্ট্যালিনের নির্দেশে কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনটাঙের সঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট তৈরি করল। চীনের নেতাদের এই যুক্তফ্রণ্ট সম্পর্কে আপত্তি ছিল, কেননা কুওমিনটাঙ শক্তিশালী দল। অধিকতর শক্তিমান এই দল কমিউনিস্টদের পিষে মারবে বা দলে ভিড়িয়ে নেবে, এই তাদের ভয়। স্ট্যালিন অবশ্য বললেন কুওমিনটাঙকে লেবুর মতো নিংড়ে সমস্ত রস বের ক'রে ছেড়ে দিতে হবে, স্বতরাং যুক্তফ্রণ্ট দরকার।

প্রথম দিকে যখন স্থন ইয়াত-সেনকে আহ্বান জানানো হল যুক্তফ্রণ্ট করার জন্য, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন— কারণ তিনি কমিউনিজমে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু প্রাদেশিক সামন্ত আর বিদেশীদের তাড়াতে দরকার হবে অর্থবল সৈন্যবল। সেই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন স্ট্যালিন। স্থন রাজি হলেন যুক্তফ্রণ্ট তৈরি করতে। স্থতরাং মৈত্রী হল। উভয়েরই শত্রু প্রাদেশিক সামন্ত ও বিদেশীরা। কমিউনিস্ট দর্শন অনুযায়ী সংগ্রাম শুরু হল, প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয় বিপ্লব, প্রাদেশিক সামন্ত ও বিদেশীদের তাড়িয়ে। পরবর্তী পর্যায়ে শ্রমিক বিপ্লব, কৃষকদের সহায়তায়, কুওমিনটাঙের বিরুদ্ধে।

১৯২৭ সাল নাগাদ এই জাতীয় বিপ্লব প্রায় সমাধা হল। উত্তরদিকে যাত্রা ক'রে কুওমিনটাঙ পার্টি প্রাদেশিক সামন্তদের উৎখাত করেছে, বিদেশীর প্রভাব খর্ব ক'রে এনেছে। মাঞ্চু রাজত্বের পর চীনে এই প্রথম আবার ঐক্যের আভাস এল। এর পরই চিয়াঙ তাঁর স্বরূপ উদঘাটন করলেন। ১৯২৬ সালে তিনি

যাবতীয় রাশিয়ান উপদেষ্টাদের তাড়িয়ে দিলেন, কুওমিনটাঙের বড়ো বড়ো পদ থেকে বিতাড়িত করলেন কমিউনিস্টদের। ১৯২৭ সালে ঘটল সাঙহাই হত্যা। ট্রটস্কি স্ট্যালিনের নীতির প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু স্ট্যালিন তাতে কর্ণপাত করলেন না— চীনে যুক্তফ্রন্টের সময় অতিক্রান্ত হয় নি, এই তাঁর বক্তব্য।

১৯২৭ সালের ১২ এপ্রিল চীনের এক শোচনীয় দিন। সাঙহাইতে সেদিন এল শ্বেতসন্ত্রাসের বিভীষিকা। ভোর চারটায় চিয়াঙের হেড কোয়ার্টার্স থেকে বিউগল বেজে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বন্দর থেকে জাহাজে বেজে উঠল সাইরেন। মেশিন গান গর্জে উঠল দিকে দিকে। সারারাত ধরে গুণ্ডারা তৈরি হচ্ছিল, পরিকল্পনা অনুযায়ী সাদা ব্যাজ পরে কুওমিনটাঙের সশস্ত্র শ্রমিক সেজে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল কমিউনিস্ট শ্রমিকদের উপর, শ্রমিকদের ইউনিয়ন বাড়ির উপর। অতর্কিত আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়ে কমিউনিস্ট শ্রমিকরা পাল্টা আঘাত হানার কোনো সুযোগই পেল না। তাদের অস্ত্রশস্ত্র, টাকাপয়সা, জামাকাপড় সব কেড়ে নিয়ে গুণ্ডারা বাড়ি থেকে তাদের রাস্তায় বের ক'রে নির্বিচারে হত্যা করল। যাদের হত্যা করা হল না তাদের বেত মারতে মারতে রাস্তায় নামানো হল। দুপুরের আগেই কমিউনিস্ট শ্রমিকদের শেষ আশ্রয় কমার্শিয়াল প্রেসের বাড়িটিরও পতন হল। চারশো শ্রমিক কতক্ষণ সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী ও সৈন্য-বাহিনীর যুগপৎ আক্রমণ সহ্য করবে। ব্যাঙ্কমালিক, শিল্পমালিক, আমলা আর ব্যবসায়ীরা সাহায্য করল শ্রমিকদের উৎখাত করতে। ১৪ এপ্রিল রাশিয়া থেকে আগত একদল ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি নির্বাক হয়ে লক্ষ করল এই নৃশংস অত্যাচার।

সাঙহাইয়ের এই শ্বেতসন্ত্রাস ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ল চীনের বিভিন্ন প্রদেশে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, কমিউনিস্টদের প্রভাব খর্ব ক'রে দেশের বৃহৎ কৃষক-সমাজকে পদানত রাখা। কমিউনিস্টরা জমি দখল ক'রে সেই জমি বিলি ক'রে পুরো সামন্তব্যবস্থাকেই উলটে দিচ্ছিল। কৃষকরা জঙ্গী হয়ে উঠে আইন নিজের হাতে নিয়ে জমি দখল করছিল, জোতদার খতম করছিল। কুওমিনটাঙ এই কৃষকসমস্যা, কৃষকদের উন্নতি বিষয়ে কোনো কার্যক্রমই রাখে নি। প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়াসুলভ ভূমি সংস্কারও তার কাজের মধ্যে ছিল না। ফলে শ্বেতসন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে শহর থেকে কমিউনিস্টদের তাড়িয়ে তাদের সঙ্গে শ্রমিকের ব্যবধান রচনা করতে সমর্থ হলেও কুওমিনটাঙ কমিউনিস্টদের সঙ্গে কৃষকদের ব্যবধান রচনা করতে সমর্থ হয় নি। ফলে চীনে কমিউনিস্টরা শহর থেকে

বিতাড়িত হয়ে কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী ক'রে কমিউনিজমে এক নতুন অধ্যায় শুরু করল।

সেণ্ট্রাল কমিটি অবশ্য সাংহাইতেই ছিল, কিন্তু এর প্রভাব ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে সকলেরই সংশয় ছিল। এমন কি ১৯২৮ সালে পার্টি-কংগ্রেসও হল মস্কোতে। শ্রমিকদের সংগঠন সব চূর্ণবিচূর্ণ।

হুনানে এই সময় মাও সে-তুঙ চু তে-র সঙ্গে মিলিত হয়ে লাল ফৌজ গঠন করতে বদ্ধপরিকর হলেন। কোয়াঙটুঙের পর হুনানেই কৃষকরা সবচেয়ে বেশি সংগঠিত। ১৯২৭ সালেই তারা শস্য তোলার সময় যে তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল তা থেকে মাও বিরাট প্রেরণা পেলেন। তাঁর লাল ফৌজে কৃষকদের যোগদান দিনে দিনেই বেড়ে চলল। কৃষকসভাগুলো পরিণত হতে লাগল সৈনিক শ্রমিক ও কৃষকের সোভিয়েট-এ। ১৯৩১ সালে মাওয়ের সভাপতিত্বে গঠিত হল চীনের সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র।

এই কিয়াঙসি-হুনান অঞ্চলে কমিউনিস্টদের জীবন তীব্র সংঘাতের জীবন। চিয়াঙ ক্রমাগত কমিউনিস্ট খতমের অনুষ্ঠান ক'রে যাচ্ছেন, কমিউনিস্টরা তার মোকাবিলা করছে কুওমিনটাঙ সৈন্যদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্র নিয়ে। কৃষকরা গড়ে তুলল গেরিলা সংগ্রাম। শত্রু যেখানে দুর্বল সেখানে আঘাত হানা, শত্রু যেখানে সবল সেখানে পশ্চাদপসরণ ক'রে ফৌজ গড়ে তোলা, লাল ফৌজ জোরদার ক'রে তোলা আর বিপুল সংখ্যায় কৃষকদের লাল ফৌজের অনুগামী ক'রে তোলা। জোতদার উচ্ছেদ করা চলল পুরোদমে।

চারদিকে কুওমিনটাঙ বাহিনী, তারই মধ্যে গজিয়ে উঠতে লাগল লাল অঞ্চল। এর চরিত্র হল— জনসাধারণের সমর্থন, সুসংগঠিত পার্টি, লাল ফৌজ, ফৌজী কার্যধারার পক্ষে উপযুক্ত তরাই এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। মাওয়ের নেতৃত্বে কৃষকরা তখনই আক্রমণ চালাতো যখন বুঝত শাসকদল আত্মকলহে দুর্বল। আক্রমণের আগে তারা ঠিক ক'রে নিত দুর্ভেদ্য লাল অঞ্চল, আক্রমণ প্রচণ্ড হলে যেখানে তারা পিছিয়ে আশ্রয় নিতে পারে। লাল অঞ্চল, লাল সরকার গঠিত হতে লাগল। প্রদেশে প্রদেশে লাল রক্ষী গঠন করা হল। লাল ফৌজ ক্রমেই শক্তিশালী হতে লাগল। এতে অংশ নিল কৃষক, শ্রমিক এবং আপাতদৃষ্টিতে যারা ছিল গুণ্ডা। এই গুণ্ডাদের রাজনৈতিক দীক্ষা দিয়ে তাদের চরিত্র আমূল পরিবর্তন করা হতে লাগল। সাবেকি সৈন্যবাহিনী থেকেও সৈন্য নেওয়া হল লাল ফৌজে, যদিও তাদের চরিত্র পালটে গেল নতুন বিন্যাসে।

যুদ্ধ করার জন্য তারা মাইনে নেওয়া বন্ধ করল, শুধু উদরসংস্থানের জন্য নিত খাবারদাবার। তারা জানত তারা সংগ্রাম করছে কৃষক-শ্রমিকদের উন্নতির জন্য, নিজের জন্য নয়। তাদের রাজনৈতিক দীক্ষা দেওয়ার জন্য পার্টি থেকে প্রতিনিধিরা অবিরত কাজ ক'রে যেত।

যেসব জায়গায় এই মুক্তাঞ্চল তৈরি হল সেখানে আগে ছিল তিন ধরনের কৃষিজীবী। এক, বড়ো ও মাঝারি জোতদার ; দুই, ছোট ছোট জোতদার আর ধনী কৃষক ; তিন, মাঝারি ও গরিব কৃষক। তৃতীয় অংশটি বিপ্লবী কৃষক, এরা কমিউনিস্ট নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে জমিদখল ক'রে নিতে ব্যাপৃত হল। প্রথম অংশটি স্বভাবতই প্রতিবিপ্লবী। তাদের জমিদখল সম্পর্কে কারোই কোনো সংশয় ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় অংশটি সম্পর্কে কী পথ নেওয়া হবে ? এরা যদিও খাঁটি বিপ্লবী নয়, বিপ্লবের সময় এরা অবশ্যই প্রথম দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করে, তবুও, যেহেতু শত্রু শক্তিতে বড়ো, তাই বিপ্লবী সংগ্রামের প্রথমদিকে এদের শত্রু তৈরি করা যুক্তিযুক্ত নয়— কারণ, বন্ধু সেসময় যত বেশি পাওয়া যায় ততই সুবিধা। তাই, চীনের মুক্তাঞ্চলের কৃষকরা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হয়েই প্রথম শ্রেণীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হল। যদিও মুক্তাঞ্চল ও কুওমিনটাঙের সীমানা অঞ্চলে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিও দখল ক'রে নেওয়া শুরু হল।

এই অঞ্চলে এই সময়ে যে বিপ্লব চলছিল তার চরিত্র ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের জন্য দরকার একদিকে যেমন বিদেশী শক্তি অপসারণ তেমন দেশীয় মুৎসুদ্দি আমলা, জোতদার, প্রাদেশিক সামন্তদের অপসারণ। এই বিপ্লব সমাধা হলে পরই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ শুরু হয়ে যাবে। সেই বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন সমস্ত দেশের কৃষক ও শ্রমিকের জাগরণ। ১৯৩০ সালেও চীনে সেই অবস্থার উদ্ভব হয় নি। লাল অঞ্চল, লাল ফৌজ ও কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তখনো সাধারণ লোকের সম্যক জ্ঞান হয় নি। বরং প্রচার হয়েছিল, এরা সব গুণ্ডা, গুণ্ডামি ক'রে, টাকা লুঠ ক'রে, মানুষ খুন ক'রে, নারীধর্ষণ ক'রে চীনের কয়েকটি জায়গায় এরা পৈশাচিক উল্লাসে আছে। একমাত্র হুনান, হুপে আর কিয়াঙসিতে কমিউনিস্টরা তবু কিছুটা আত্মরক্ষা ক'রে আছে। এদের সংখ্যা কুওমিনটাঙদের ধারণায় কুড়ি হাজার সশস্ত্র কৃষক, অস্ত্র পাঁচ হাজার বন্দুক— এদের খতম করার জন্য খরচ করা হচ্ছে এক কোটি টাকা। এই অঞ্চলগুলোতে কমিউনিস্ট প্রভাব কখনো বাড়ে কখনো কমে। একমাত্র সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে যেসব লাল পতাকা তোলা হয়েছিল সেই লাল পতাকার উপর কোনো আঘাত আসে নি।

কমিউনিস্টরা অধিকতর শক্তিমান ও আধুনিক অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত কুওমিনটাঙ বাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণ বেশিদিন প্রতিহত করতে পারল না। প্রথম যখন সোভিয়েট গণতন্ত্র তৈরি হল ১৯৩১ সালে, তখন তার প্রভাবে ছিল প্রায় ষাট হাজার লোক, ১৯৩৪ সাল নাগাদ তারা সংখ্যায় বেড়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় তিন লক্ষে। কিন্তু চিয়াঙ ক্রমাগত চেষ্টায় তাঁদের ব্যূহ ভেঙে ফেললেন।

সব সমেত চিয়াঙ পাঁচবার আক্রমণ চালান। ১৯৩০ সালে প্রথম কিয়াঙসি সোভিয়েটের বিরুদ্ধে। ১৯৩১ সালে দ্বিতীয়বার। ঐ বছরেই আবার চিয়াঙ স্বয়ং নেতৃত্ব নিলেন আক্রমণের। ১৯৩২ সালে আবার আক্রমণ হল হুপেতে। পঞ্চমবার ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে চিয়াঙ সফল হলেন। দুশো এরোপ্লেন, পাঁচলক্ষ সৈন্য, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, জার্মান সেনাপতির নেতৃত্ব দিয়ে কমিউনিস্টদের ঘাঁটিগুলো ঘিরে ফেলে তাদের গেরিলাবাহিনী পর্যুদস্ত ক'রে চিয়াঙ মাত্র তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে কমিউনিস্টদের আটকে ফেললেন ১৯৩৪ সাল নাগাদ। কমিউনিস্টরা বুঝতে পারল কিয়াঙসি ত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই, সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে চীনের অভ্যন্তরে আরো দুর্গম অঞ্চলে। উত্তরে শেনসিতে আর একটি কমিউনিস্ট কেন্দ্র আছে, সেখানে যেভাবেই হোক পৌঁছতে হবে। কিন্তু কীভাবে? প্রায় বারো শো মাইল দূরে শেনসি, সোজা রাস্তায় সেখানে যাওয়া অসম্ভব, পথে কুওমিনটাঙের সুসজ্জিত সৈন্য। সুতরাং যদি পৌঁছতে হয় তাহলে যেতে হবে ঘোরা পথে। তারা সেইপথেই যাত্রা শুরু করল— শুরু হল বিখ্যাত 'লঙ মার্চ', দূর যাত্রা।

অক্টোবর, ১৯৩৪। কিয়াঙসি ত্যাগ ক'রে লাল ফৌজ কুওমিনটাঙ সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ ক'রে দক্ষিণ-পশ্চিমে এসে পশ্চিমদিকে রওনা হল। আক্রমণের ধাক্কায় আবার দক্ষিণদিকে। ইয়াঙসি উপত্যকা পেরিয়ে তারপর উত্তরদিকে। তাতু নদীতে প্রচণ্ড সংঘর্ষ। দুর্গম পর্বত পেরিয়ে উত্তর-পশ্চিমের মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল। কাঙসু প্রদেশের জনবিরল অঞ্চল। তারপর একবছর পর, পথে বহু সৈন্য ধ্বংস হওয়ার পর, শেনসি পৌঁছনো। এক বছরে প্রায় আটহাজার মাইল পথ অতিক্রম। পথে এগারোটি প্রদেশ, সেখানে সন্দেহের চোখে দেখে লোকেরা; জলাভূমি, পুলিশ আর বিরুদ্ধপক্ষীয় সৈন্যদের শ্যেনদৃষ্টি, আঠারোটি পর্বতমালা, চব্বিশটি নদী, দশটি প্রাদেশিক সামন্তের পাহারা। এই পথ অতিক্রম করার সময়ই আবার কমিউনিস্টরা কুওমিনটাঙ সৈন্যদের পরাস্ত করে, বাষট্টিটি শহর দখল করে। যাত্রা যখন শুরু হয় তখন সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল একলক্ষ তিরিশ

হাজার। শেনসি পৌঁছল মাত্র তিরিশ হাজার। কেউ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বাহিনী ত্যাগ করল, কেউ ক্লান্তিতে মারা গেল, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত হল কেউ, কেউ ধ্বংস হল শত্রুর হাতে। যাদের মৃত্যু হল তাদের মধ্যে ছিলেন মাও সে-তুঙের স্ত্রী।

কিন্তু যারা পৌঁছল এই কঠিন পরীক্ষায় সফল হয়ে, তাদের নিয়ে তৈরি হল নতুন এক দুর্ভেদ্য সোভিয়েট। কমিউনিস্টদের খ্যাতি দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। দীর্ঘ যাত্রার মহাকাব্যের মতো কাহিনী রটে গেল চারদিকে, তা দিয়ে তৈরি হতে লাগল গল্প কবিতা গান। যাদের কুওমিনটাঙ সরকার প্রচার করেছিল কমিউনিস্ট গুণ্ডা বলে তারাই জনগণের চোখে হয়ে উঠল দেশপ্রেমিক বীর।

এই পরীক্ষার ফলে পার্টি আরো বেশি সংহত হয়ে দাঁড়ালো। এর আগে পার্টির নেতৃত্ব নিয়ে পার্টির অভ্যন্তরে বিবাদ শুরু হয়েছিল। ১৯৩৪-৩৬ সালের কংগ্রেসে মাওকে আক্রমণ করেছিলেন দক্ষিণপন্থী বামপন্থী দু দলের নেতারাই। দক্ষিণপন্থীদের মুখপাত্র ছিলেন ওয়াঙ মিঙ, তিনি রাশিয়াপন্থী, কুওমিণ্টাঙের সঙ্গে মিলেমিশে চলার পথে। বামপন্থী মুখপাত্র চাঙকুও-তাই। তিনি শেনসিতে নতুন ঘাঁটি করার বিপক্ষে। এই দুই আক্রমণ থেকে মাও কোনোমতে আত্মরক্ষা করেছিলেন। দীর্ঘ যাত্রার সফল পরিসমাপ্তির পর তাঁর নেতৃত্ব সংশয়হীনভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হল।

তাছাড়া, লাল ফৌজের সৈন্যরা পথের ধারে ধারে অজস্র কৃষককে কৃষক-সমাজকে ভালোভাবে চিনতে পাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের সঙ্গে মিশতে পেরে তাদের সমস্যা, তাদের সমর্থন আদায় করার পথ তারা ভালোভাবে বুঝতে পারল। তাছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিমের ও পশ্চিমের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদেরও ভালো ক'রে জানার সুযোগ পেল তারা।

নতুন উৎসাহে নতুন উদ্যমে তারা লাগল নতুন সোভিয়েট তৈরি করতে। ১৯৩৬ সালে ছোট একটা শহর ইয়েনান তাদের কর্তৃত্বে এল। পরের কয়েক বছর এই ইয়েনান হয়ে উঠল তাদের রাজধানী। কিয়াঙসির তুলনায় এই নতুন অঞ্চল অনেক বেশি দুর্গম। সীমান্তের কাছাকাছি অনেকগুলো প্রদেশকে ঘিরে এই অঞ্চল, সেখানে প্রাদেশিক সামন্তদের পাহারা খুব জোরদার নয়। ফলে সুবিধাই হল, বা তুলনায় অসুবিধাগুলো কম। খাদ্যের অবশ্য অভাব। অঞ্চলটি

অনুর্বর। লোকজন বেশি নেই। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা দুষ্কর। কিন্তু এরই মধ্যে কমিউনিস্টরা তাদের দুরূহ তপস্যায় ব্রতী হল।

যে নতুন গ্রামীণ সমাজ তারা তৈরি করল সেই সমাজের চারটি বৈশিষ্ট্য ছিল: নতুন ক'রে জমি বিলি; সুদ নেওয়া বন্ধ; জোর ক'রে খাজনা আদায় বন্ধ; বিশেষ সুখ-সুবিধা ভোগ করা বন্ধ। বলা বাহুল্য, এগুলো সংস্কার, বিপ্লব নয়। কিন্তু কমিউনিস্টরা জেনেশুনেই এটা করেছিল বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের কাজ হিসেবে। জনগণকে প্রস্তুত না ক'রে এক লাফে বিপ্লবে পৌছনো যায় না বলে।

সমাজের লোকদের তারা ভাগ করেছিল এইভাবে: বড়ো জোতদার, মাঝারি আর ছোট জোতদার, ধনী কৃষক, মাঝারি কৃষক, গরিব কৃষক, ভূমিদাস, গ্রামীণ শ্রমিক, হস্তশিল্প শ্রমিক, বৃত্তিধারী শ্রমিক— অর্থাৎ শিক্ষক, ডাক্তার, কুশলী কর্মী— এবং ভবঘুরে নিষ্ক্রিয় গুণ্ডাশ্রেণী। সোভিয়েট নির্বাচনে প্রথমেই নজর দেওয়া হল ভূমিদাস, গ্রামীণ শ্রমিক, হস্তশিল্প শ্রমিকদের উপর। যাতে ক'রে গ্রামীণ শ্রমিকদের একনায়কত্বে পরিণত হতে পারে এই সোভিয়েটগুলো। গ্রামীণ সোভিয়েট, জেলা সোভিয়েট, কাউন্টি সোভিয়েট, প্রাদেশিক সোভিয়েট ও কেন্দ্রীয় সোভিয়েট— এইভাবে ভাগ করা হয়েছিল সোভিয়েটগুলো। প্রত্যেকটি গ্রামীণ সোভিয়েট থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে ক্রমোন্নতভাবে সোভিয়েট কংগ্রেসের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হতো। ষোল বছরের বড়ো হলেই ভোটের অধিকার ছিল, তবে সবশ্রেণীর লোকের সমান ভোটাধিকার ছিল না, যাতে গ্রামীণ শ্রমিকরাই সোভিয়েটে মুখ্য অংশ নিতে পারে।

লাল ফৌজ একটি অঞ্চল অধিকার করার পর, তীব্র প্রচার-অভিযান চালিয়ে, জনসাধারণকে সভায় ডেকে একটি বিপ্লবী কমিটি তৈরি করা হতো, এই বিপ্লবী কমিটিই কখন সোভিয়েটের নির্বাচন বা পুনর্নির্বাচন হবে তা স্থির করত। জেলা সোভিয়েটের অধীনে থাকত নানাধরনের কমিটি— শিল্প, সমবায়, যুদ্ধশিক্ষা, রাজনীতিশিক্ষা, জমি, জনস্বাস্থ্য, লাল ফৌজ সম্প্রসারণ, জমি চাষ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের কমিটি।

পার্টির সদস্যরূপে নেওয়া হতে লাগল অধিকতর সংখ্যায় কৃষক আর শ্রমিক। যুবকদের নিয়ে তৈরি হল যুব সংঘ। মেয়েদের নিয়ে তৈরি হল কমিউনিস্ট লীগ। আরো তৈরি হল বয়স্ক কৃষকদের সংগঠন, কৃষক রক্ষী সংগঠন, ভ্রাম্যমাণ ব্রিগেড।

উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা চলল অব্যাহত। পতিত জমি উদ্ধারের চেষ্টাও।

খুঁটিনাটি বিষয়েও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা হতে লাগল কৃষকদের। কোনো ছেলে বা মেয়ে যাতে অলস হয়ে বসে না থাকে সেইদিকে নজর রাখা হল। কৃষকরা নবোদ্যমে কাজে লাগল। আগে তারা কাজ করত প্রভুর জন্য, ফলে উৎসাহ পেত না চাষে। এবার তারা চাষ করছে নিজের জন্য। কমিউনিস্ট সরকারকে নিজেদের সরকার ভাবতে লাগল তারা। এখানে পুলিশ প্রহরী নেই, যদি থাকে তাহলে তারা নিজেরাই পুলিশ প্রহরী। নিজেদের গ্রাম রক্ষার কাজ তাদের নিজেদের। লাল ফৌজ তাদের বন্ধু, অভিভাবক নয়। নতুন জমি পেয়ে, করের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে তারা চাষের কাজে নতুন আনন্দ পেতে লাগল। চাষের কাজে শস্য বিতরণের ক্ষেত্রে এল সমবায় সমিতি।

রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক তিনদিকেই নজর রাখল এই সোভিয়েট সরকার। আফিম খাওয়া বন্ধ হল। ঘুষ নেওয়া উঠে গেল। ভিক্ষাবৃত্তি, বেকারদশা ঘুচে গেল। মেয়েদের পা বেঁধে চেপে পা সুন্দর করার ব্যর্থ চেষ্টার অভ্যাস বন্ধ হয়ে গেল, বহুবিবাহ শেষ হল, বাচ্চাদের কাজে লাগানো বন্ধ হল। বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি প্রথার আমূল সংস্কার হল, বউ কেনাবেচা, শাশুড়ীর অত্যাচার, কাঁচা বয়সে বিয়ে, পণপ্রথা ইত্যাদি উঠে গেল। শিক্ষাব্যবস্থা চালু হল বিনা পয়সায়। এইসব সংস্কার চীনের সমাজকে সামন্তপ্রথার জগদ্দল পাথরের হাত থেকে একলাফে নিয়ে এল আধুনিক জগতের মুখোমুখি।

কমিউনিস্টদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতে কুওমিনটাঙ যে পেরে উঠবে না, এটা জাপান বহুদিন ধরেই অনুমান করেছিল। চীনের বৃহৎ জনসাধারণ তো বটেই, নেতৃস্থানীয় অনেকেও যে জাপানবিরোধী ছিল এটাও কারো অজানা ছিল না। চীন কমিউনিস্ট হয়ে গেলে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জাপানের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠবে, এই আতঙ্কে জাপান চীন অধিকার করার মতলব অনেক-দিন ধরেই করছিল। ১৯৩১ সালে মুকডেনে জাপানীরা নিরাপত্তার অভাবে ভীত এই অজুহাতে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ক'রে অধিকার ক'রে নিল্। পরের বছর জাপান সাঙহাই আক্রমণ করল। ১৯৩৭ সাল নাগাদ তারা পিকিঙের বাইরে মার্কোপোলো সেতু আক্রমণ ক'রে দক্ষিণদিকে এগিয়ে এল। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত চিয়াঙ আর তাঁর কুওমিনটাঙ জাপানীদের প্রতিরোধ করার তেমন কোনো চেষ্টাই করেন নি, কমিউনিস্ট ঠ্যাঙাতেই তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন। কমিউনিস্টরা কিন্তু প্রথম থেকেই জাপানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। কুওমিনটাঙকে তারা বারবার বলেছিল, আত্মঘাতী যুদ্ধে শক্তিক্ষয় না ক'রে

বিদেশী শত্রুকে প্রতিহত করাই প্রথম কর্তব্য। চিয়াঙ সে কথায় কর্ণপাত করেন নি ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত। সেই সালে একটা ঘটনা ঘটল। চিযাঙকে চুরি ক'রে নিয়ে গেল কারা, যুক্তফ্রণ্ট না করলে তাঁকে ছাড়া হবে না একথা ঘোষণা করা হল। চিয়াঙ যুক্তফ্রণ্ট করতে বাধ্য হলেন।

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত এই যুক্তফ্রণ্ট জাপানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। যুক্তফ্রণ্ট অবশ্য নামেই। যুদ্ধ যেটুকু করল তা সবটা কমিউনিস্টরাই। চিয়াঙ এবং তাঁর সৈন্যরা জাপানীদের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালেন আগাগোড়া। রাজধানী তাঁরা সরালেন নানকিঙ থেকে হ্যাঙকাও, হ্যাঙকাও থেকে চুঙকিঙ। তাঁর সৈন্যরা অপদার্থ, সেনাপতিরা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। অন্যদিকে কমিউনিস্টরা গেরিলা কৌশলে যুদ্ধ ক'রে জাপানীদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলল। অসম যুদ্ধ, এক দিকে জাপানের অতি আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী, অন্যদিকে পুরনো অস্ত্র, বা প্রায় অস্ত্র ছাড়াই চীনা জনসাধারণ। তথাপি জাপান চীন বিজয় করতে অক্ষম হল।

সুশিক্ষিত বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়েও জাপান যে চীন বিজয় করতে পারল না, তার কারণ চীনের কৃষকরা। চীনের রাজনৈতিক দুর্বলতা সামরিক দুর্বলতাই শুধু জাপান লক্ষ করেছিল, কোথায় চীনা সৈন্য আছে, কারখানা আছে, রেলপথ আছে, শহর আছে তাই শুধু জানত জাপান— কিন্তু চীনের প্রকৃত শক্তি যে লুকিয়ে আছে গ্রামে তা জাপানের কাছে অজ্ঞাত ছিল। জাপানীরা চীনা কৃষককে জমি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি।

জাপান যুদ্ধে লিপ্ত হবার পরই অর্থাৎ ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত চীনের কারখানা বিশ্ববিদ্যালয় দপ্তর কাছারি সব সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল থেকে সরে গিয়ে বিশাল দেশের অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত হল। এই স্থানান্তরের কাহিনী বিপুল অধ্যবসায়ের, বিরাট ধৈর্যের কাহিনী। তার চাইতেও বিস্ময়কর কাহিনী প্রায় আড়াই কোটি কৃষকের চীনের অভ্যন্তরে চলে যাওয়ার কাহিনী। এটা শুধু পালিয়ে যাওয়া নয়, নতুন ক'রে প্রতিষ্ঠার, নতুন ক'রে শত্রুর মোকাবিলার কাহিনী। পায়ে হেঁটে, শাম্পানে, রিকশায়, রেলে এই বিরাট কৃষক জনতা দেশের ভেতরে চলে গিয়ে আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত হল। সঙ্গে আছে হাজার হাজার শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্ররা। পিঁপড়ের সারির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে লোক চলে এল ক্রমাগত পশ্চিম দিকে। রোগে, ক্লান্তিতে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কত লোক মারা গেল, পথের ধারে তাদের হাড় গাদা হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু জাতি

হিসেবে চীনের লোকেরা বেঁচে রইল। নতুন ক'রে কারখানা চলল, স্কুল-কলেজ চালু হল, সৈন্যরা নতুন ক'রে ফ্রন্ট তৈরি করল।

চীনের এই প্রতিরোধের চরিত্র জাপান যখন বুঝতে পারল তখন শুরু হল গ্রামাঞ্চলে সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী অভিযানের পর অভিযান। ধানক্ষেতের উপর আক্রমণ চালিযে, গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস ক'রে, গ্রামের পুরুষদের হত্যা ক'রে, নারীধর্ষণ ক'রে জাপান চাইল চীন জয করতে। কিন্তু জাপানী বাহিনী বিশাল চীনের ভূখণ্ড এইভাবেও জয় করতে অসমর্থ হল।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের পর চীনের প্রতি-রোধের চরিত্রও পালটে গেল। ১৯৪৬ সালে আবার শুরু হল কমিউনিস্টদের সঙ্গে কুওমিনটাঙের গৃহযুদ্ধ। এই গৃহযুদ্ধ যে মধ্যে একেবারে থেমে গিয়েছিল তা নয। ১৯৪১ সালেও দক্ষিণ হুনানে লাল ফৌজের চতুর্থ ফৌজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে-ছিল কুওমিনটাঙের হাতে। তবে জাপান উভয়েরই শত্রু থাকায় এই গৃহযুদ্ধ আরো ব্যাপক আকার নেয় নি। জাপানের পরাজয়ের পর জাপান-অধিকৃত অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করার সময এই গৃহযুদ্ধ তীব্র আকার নিল, কমিউনিস্ট সৈন্য আর কুওমিনটাঙ সৈন্যদের মধ্যে কাড়াকাডি পড়ে গেল, কে আগে সেই অঞ্চল অধিকার করবে তা নিয়ে।

মাঞ্চুরিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ার করতলগত হয়। কথা ছিল তিন মাসের মধ্যে রাশিয়া কুওমিনটাঙদের হাতে মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে দেবে। কুওমিন-টাঙের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি মাঞ্চুরিয়ার ভার নেওয়া সম্ভব ছিল না, তাই রাশিয়াকে তারা অনুরোধ জানালো রাশিয়া যেন আরো কিছুকাল মাঞ্চুরিয়ায় থাকে।

মাঞ্চুরিয়া অধিকার করার জন্য উত্তর চীন দিয়ে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া অভিমুখে রওনা হলেন লিন পিয়াও। রাস্তায় গ্রামের পর গ্রামে তাঁর বাহিনী কৃষকদের রাজ-নীতিতে দীক্ষা দিল, রেলপথ উড়িয়ে চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে মাঞ্চুরিয়া বিচ্ছিন্ন ক'রে দিল। ওদিকে আমেরিকার সাহায্য নিয়ে কুওমিনটাঙ বাহিনীও মাঞ্চুরিয়ার দিকে এগুচ্ছে। কুওমিনটাঙ বাহিনী পৌছনোর আগেই লিন পিয়াও মাঞ্চুরিয়া দখল ক'রে নিলেন। চিয়াঙ অবশ্য থেমে থাকলেন না। তাঁর সৈন্যবাহিনী মাঞ্চুরিয়ার অর্ধেকের বেশি শহর দখলে নিল, এমনকি কমিউনিস্টদের প্রাণকেন্দ্র ইয়েনানও দখল করল। কিন্তু বেশিদিন তারা এই দখল টিকিয়ে রাখতে পারল না।

১৯৪৭ সালের বসন্তকালে লিন পিয়াও গঠন করলেন তাঁর জনমুক্তি ফৌজ। এই ঝটিকাবাহিনীর আক্রমণে মাঞ্চুরিয়া শহরের কুওমিনটাঙ সৈন্য ছত্রাকার হয়ে গেল। তিনটি বড়ো শহর বাদে— যার মধ্যে ছিল মুকডেন, কিরিন আর চাঙচুন— সবই কুওমিনটাঙের দখলের বাইরে চলে গেল।

চিয়াঙের ভরসা ছিল আমেরিকান সৈন্য। তাঁর নিজের সৈন্যরা দেখা গেল অপদার্থ। কিন্তু এত দূরে এক অজানা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে হঠাৎ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়া সম্পর্কে আমেরিকার সংশয় ছিল। তারই মধ্যে মাঞ্চুরিয়া আবার কমিউনিস্ট-দের হাতে চলে গেল।

১৯৪৮ সালে মুকডেন আক্রমণ ক'রে মাও সে-তুঙ পুরো চীনে কমিউনিস্ট আধিপত্য বিস্তারের সূচনা করলেন। মাঞ্চুরিয়ার সম্পূর্ণ পতন হল— কুওমিণ্টাঙ ভেঙে গেল। তার সৈন্য যোগ দিল লিন পিয়াওয়ের জনমুক্তি ফৌজে। ইয়েনান পুনরধিকার করলেন পেঙ তে-হুয়াই। হোয়াঙের যুদ্ধে জয়লাভ করলেন চেন-ই এবং লিউ পো চেঙ। সিনান, মুকডেন, লিয়াওনিঙ আর চাঙচুনের যুদ্ধে কুওমিন-টাঙের খতম হল উনচল্লিশটি ডিভিশন, তিন লক্ষ সৈন্য, আমেরিকান অস্ত্র।

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে হোয়াই-হাইয়ের বিরাট যুদ্ধে কুওমিনটাঙের শোচনীয় পরাজয় ঘটল। পঁয়ষট্টি দিন চলেছিল এই যুদ্ধ, অংশ নিয়েছিল উভয় পক্ষের দশ লক্ষ সৈন্য। চেন-ইয়ের নেতৃত্বে জনমুক্তি ফৌজ কুওমিনটাঙকে ঘিরে ফেলে পিষে মারল। ১৯৪৯ সালে সামরিক পরাজয়ের সঙ্গে যুক্ত হল রাজনৈতিক পরাজয়। চিয়াঙ কাই-শেক তাঁর বাহিনী নিয়ে ফরমোজায় পালিয়ে গেলেন। চীনে প্রতিষ্ঠিত হল মাও সে-তুঙের নেতৃত্ব কমিউনিস্ট প্রজাতন্ত্র।

চীনে কমিউনিস্টদের জয় কয়েকটি সত্য প্রমাণ ক'রে গেল। কুওমিনটাঙ এবং কমিউনিস্ট দুই বাহিনীই চীনাদের নিয়ে গঠিত। কুওমিনটাঙ বৃহত্তর বাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র বিস্তর, বহির্বিশ্বের সাহায্যে সে শক্তিমান, এমন কি রাশিয়াও কুওমিন-টাঙকে স্বীকার ক'রে চলেছিল। অপরদিকে কমিউনিস্টদের একমাত্র শক্তি জন-সাধারণের আস্থা এবং কমিউনিজমে বিশ্বাস। ক্ষুদ্রতর বাহিনীর হাতে বৃহত্তর বাহিনীর পরাজয় এটাই প্রমাণ করল, মনোবল অস্ত্রবল ধ্বংস করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কুওমিনটাঙ ছিল অর্থগৃধ্নু আত্মসর্বস্ব নেতাদের দল। চীনের জন-সাধারণের সঙ্গে এর প্রাণের যোগ ছিল না। সুন ইয়াত-সেনের নাম ভাঙিয়ে জনগণকে চিয়াঙ কিছুকাল মোহমুগ্ধ রেখেছিলেন, কিন্তু মাওয়ের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরাই যখন প্রমাণ দিল দেশকে প্রকৃত তারাই ভালোবাসে, বিদেশী শত্রু

বিশেষ ক'রে জাপানীদের রুখতে তারাই বদ্ধপরিকর, দেশের উন্নতি বলতে তারা মুষ্টিমেয় নেতার উন্নতি বা ছোট একটি গোষ্ঠীর উন্নতি বোঝে না, বোঝে কৃষক এবং শ্রমিকদের উন্নতি, তখন আস্তে আস্তে তারা কমিউনিস্টদের পথেই চলে গেল।

কমিউনিস্টদের জয়ের তৃতীয় কারণ হল, লিন পিয়াওয়ের সুদক্ষ জনমুক্তি ফৌজ। এক লক্ষের বাহিনী থেকে ১৯৪৭ সালে লিন পিয়াও একে বাড়িয়ে তোলেন আড়াই লক্ষে। বড়ো যুদ্ধে এই বাহিনী ব্যাপৃত হতো না, ছোট ছোট যুদ্ধে শত্রুকে তটস্থ ক'রে এই ফৌজ নিজের সৈন্যদের মনোবল যেমন বাড়িয়ে দিত, তেমনি শহরে শহরে শত্রুকে আটকে রেখে, শত্রুর খাদ্য অস্ত্র ইত্যাদি সরবরাহের পথ আটকে রেখে, তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করত। মাঞ্চুরিয়ায় এই ধরনের আক্রমণে কুওমিনটাঙ ভেঙে পড়ে, তারপর চীনের সর্বত্র। জনমুক্তি ফৌজের মূলশক্তি ছিল মাঞ্চুরিয়ার জনগণের সমর্থন, যার অভাবে কুওমিনটাঙ কখনো সেখানে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা পায় নি।

চীনের ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যাবে সাবেকি প্রথাগত সর্বহারা বিপ্লব যেভাবে হবে বলে বলা হয়, চীনে বিপ্লব সেইভাবে হয় নি।

বিপ্লবের সময় অর্থাৎ ১৯১৯ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত চীনের গড়পড়তা জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪৫ কোটি। এর মধ্যে প্রায় ৩৬ কোটি ছিল কৃষক ; মাত্র তিরিশ লক্ষ শ্রমিক। প্রাক-বিপ্লব যুগে চীন ছিল সামন্ততান্ত্রিক, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী দেশের আক্রমণে, বিশেষ ক'রে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের শেষদিকে সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সাধারণত ভেঙে ফেলে নবোদ্গত বুর্জোয়ারা। কিন্তু চীনে বুর্জোয়াশ্রেণী ভালো ক'রে গজিয়ে ওঠার সময় পায় নি, শক্তিশালী হওয়া তো দূরে থাক। তারা ছিল সাম্রাজ্যবাদী দেশ-গুলোর করতলগত। এই বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেও আবার দুটো গোষ্ঠী ছিল, এক দল সাম্রাজ্যবাদীর মুৎসুদ্দি, আর একদল জাতীয়তাবাদী। দুটোর কোনোটারই সামর্থ্য ছিল না সামন্ততন্ত্রকে ভেঙে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার। কেননা সাম্রাজ্য-বাদীরা, যারা আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের বাহক, তারা কোনো দেশে দেশীয় ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে দেবে না। ফলে চীনের অত্যাচারিত কৃষক ও শ্রমিকদের কাছে দুই শত্রু দেখা দিল— সামন্ততন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ। সামন্ততন্ত্রও আবার ক্ষয়িষ্ণু, সেটাও আবার সাম্রাজ্যবাদীর প্রভাবপুষ্ট। ফলে চীনের জনসাধারণের কাছে প্রধান শত্রু তখন ছিল সাম্রাজ্যবাদীরা।

শ্রমিকরা চীনে স্বল্পসংখ্যক, এবং সংগ্রামেও বেশিদিনের অভিজ্ঞতা নেই। চীনের কৃষকরা কিন্তু দীর্ঘকালের সংগ্রামে অভিজ্ঞ। তাই চীনে বিপ্লবের মূল শক্তি হল কৃষকশ্রেণী। তবে এককভাবে নয়, কেননা রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করা কোনো দেশের শুধু কৃষকশ্রেণীর পক্ষেই সম্ভব নয়। কৃষকরা বিস্তৃত এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করে শ্রমিকশ্রেণী এবং তার মূলশক্তি কমিউনিস্ট পার্টি। তাই চীনের বিপ্লবে মূল সংগ্রাম করল কৃষকরা শ্রমিকদের নেতৃত্বে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি এককভাবে চীনের শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর ছিল না। তাই এই দুটো শ্রেণী সংগ্রামে বন্ধুরূপে নিল দেশের অন্যান্য বিপ্লবী শক্তিগুলোকে। এদের মধ্যে আছে পেটিবুর্জোয়া শ্রেণী অর্থাৎ, বিভিন্ন বৃত্তিধারী লোক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ছোটখাট ব্যবসায়ী। জাতীয় বুর্জোয়ারাও ঠিক বিপ্লবী চরিত্রের না হলেও, বিভিন্ন সময় সাম্রাজ্যবাদীদের এবং বৃহৎ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের হাতে অত্যাচারিত হবার ফলে, অনেক সময় সর্বহারাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তাই সতর্কভাবে এদের বিপ্লবী সংগ্রামে নেওয়া হল।

এই বিপ্লব যেহেতু পুরোপুরিভাবে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে নয়, সুতরাং এই বিপ্লব সর্বহারা বিপ্লব নয়। আবার সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব, সুতরাং গণতান্ত্রিক বিপ্লবও। কিন্তু বুর্জোয়ারা এই সংগ্রামে প্রধান অংশ নেয় নি, সুতরাং এই বিপ্লব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। তাই চীনের এই বিপ্লব পরিচিত 'নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব' বলে। শহরে শ্রমিকরা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, গ্রামে কৃষকরা যথেষ্ট শক্তিমান, তাই এর কৌশল ছিল : গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলা।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব

সামন্ততান্ত্রিক বিপ্লব, ধনতান্ত্রিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব— ইতিহাসের গতিতে মানব-সভ্যতা এগিয়ে চলেছে উত্তরোত্তর ঐশ্বর্যের দিকে, শান্তির দিকে। সামন্ততান্ত্রিক বিপ্লব যখন ঘটে তখন তা তদানীন্তন সমাজে সৃষ্টিশীল হয়েই দেখা দেয়, সমাজের কল্যাণের কাজে তা লাগে। ধনতান্ত্রিক বিপ্লব যখন ঘটল, তখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সৃষ্টিশীল ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাই ধনতান্ত্রিক

বিপ্লব এল সমাজের কল্যাণে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ধ্বংস ক'রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আনল আবার নতুন কর্মপ্রয়াস, যখন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দান করার মতো কিছু আর ছিল না।

সামন্ততান্ত্রিক বিপ্লব ও ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা মূল পার্থক্য আছে। সামন্ততন্ত্রে সামন্তশ্রেণী সমাজের অন্যান্য শ্রেণীকে শোষণ ক'রে নিজের সুখসুবিধা আদায় ক'রে নেয়। ধনতন্ত্রে বুর্জোয়াশ্রেণী সমাজের শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীকে শোষণ করে। কোনো দেশেই কোনো কালেই কিন্তু এই সামন্তশ্রেণী বা বুর্জোয়াশ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী নয়। মুষ্টিমেয় লোক দেশের বৃহৎ জনসাধারণকে শোষণ ক'রে নিজের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে চলে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর কিন্তু ব্যাপারটা উলটে যায়। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীই সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীকে দমন করে দেশের সার্বিক কল্যাণের জন্য। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা, যেখানে শোষণ বা দমনের প্রয়োজনই থাকবে না, যেখানে শোষণমূলক অর্থনীতির পাপচক্র থেকে মুক্ত হয়ে প্রত্যেকটি ব্যক্তি আপন আপন ব্যক্তিত্বের পূর্ণপ্রতিষ্ঠার পূর্ণবিকাশের সুযোগ পাবে। সাম্যবাদের মূল লক্ষণই এই যে সেখানে প্রত্যেকটি মানুষের লক্ষ্য অপরের সুখের শান্তির সহায় হওয়া, কেবল নিজের নয়। সমাজতান্ত্রিক মানুষের চরিত্র এই অর্থে বিশিষ্ট। সামন্ততন্ত্রে, ধনতন্ত্রে এই ধরনের লোক নিশ্চয়ই থাকে, যারা নিজের সুখের চাইতে অপরের সুখকে বড়ো ক'রে দেখে। কিন্তু সেই ধরনের লোক ব্যতিক্রম মাত্র, তারা মহান। কিন্তু সেই ব্যতিক্রমের নজির দেখে দেশের অন্য লোকের চরিত্র নির্ণীত হতে পারে না।

এই আদর্শ সমাজতান্ত্রিক মানুষ অবশ্যই একদিনে বা এক বৎসরে বা এক শতাব্দীতে তৈরি হয় না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বহুদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল ; ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বহুদিন প্রতিষ্ঠিত আছে— এই ব্যবস্থায় জন্মে বড়ো হয়ে ধ্যানধারণায় লালিতপালিত হয়ে মানুষের সংস্কার গঠিত হয়ে উঠেছে, সেইসব সংস্কার দূর করতে বহু সাধনা করতে হয়। তাই দেখা যায়, ধনতন্ত্রে যারা লালিতপালিত তাদের মধ্যেও থাকে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কার, সমাজতন্ত্রে যারা লালিতপালিত তাদের মধ্যে ধনতান্ত্রিক সংস্কার। তাই সাম্যবাদে পৌঁছতে হলে সমাজতন্ত্রের নিরন্তর সাধনা চালিয়ে যেতে হয় যাতে পুরনো শোষণমূলক সংস্কারগুলো মাথা চাড়া না দিয়ে ওঠে।

সাম্যবাদী মানুষ তৈরি করতে, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বহু

সময় লাগে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধনা সাম্যতন্ত্রে পৌঁছনো। সাম্যতন্ত্রের লক্ষ্য সমাজগঠনে সব মানুষের অংশ গ্রহণ। কিন্তু হঠাৎ সব মানুষ সমাজগঠন-ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না, তাদের আস্তে আস্তে দীক্ষিত করতে হয়। তাই দেখা যায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, যারা সমাজের বহু মানুষের সক্রিয় সমর্থন নিয়ে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংস করে। বিপ্লবের প্রথম দিকে এই পার্টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়, নেতৃত্ব দেয়। এই পার্টির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়— সর্বহারা মানুষের, শ্রমিকের ও কৃষকের একনায়কত্ব। এই একনায়কত্বের চেষ্টা হয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্ত চিহ্ন চূর্ণ ক'রে দেওয়া, যাতে সাধারণ মানুষ ক্রমশই এগিয়ে এসে রাষ্ট্রশাসনে অংশ নিতে পারে। এই পার্টির একমাত্র চেষ্টা সমস্ত সর্বহারাকে এই পার্টির কাজে অংশীদার করা। সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সমস্ত মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া অসম্ভব।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই পার্টি এত গুরুত্বপূর্ণ বলেই সবসময়ে সতর্ক থাকতে হয় যেন পার্টি তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রতিপালনে সর্বদাই সচেষ্ট থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে পার্টির যারা নেতা, তারা প্রবল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তাদের দায়িত্ব ভুলে গিয়ে পুরনো সমাজব্যবস্থার শোষণমূলক ক্ষমতার লোভে পড়ে। এই লোভ আসে শুধু যে রাজনৈতিক ক্ষমতার রূপ নিয়েই তা নয়, সমাজের বিভিন্ন অংশেও। সাম্যবাদী মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ, তাদের সংস্কৃতি আত্মমুখী নয় সমাজমুখী। তাই প্রয়োজন সেই সংস্কৃতির কথা মনে রেখে রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা চালু রাখা, যাতে সেই সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। তাই দরকার নিরন্তর 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'। এই বিপ্লব না চললে কমিউনিস্ট পার্টিও আমলাদের পার্টি হয়ে ওঠে, যে আমলাদের লক্ষ্য দেশের কল্যাণের পরিবর্তে আপন কল্যাণ।

চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়েছিল যাতে কমিউনিস্ট পার্টি, সর্বহারাদের পার্টি আমলাতান্ত্রিক পার্টিতে পরিণত না হয়। উদ্দেশ্য : পার্টিকে জনসাধারণের কল্যাণে নিযুক্ত রাখা, সমাজতান্ত্রিক মানুষের সংস্কৃতি অব্যাহত রাখা।

এই বিপ্লবের শুরু হয় অপেরা নিয়ে তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়ে। চীনের সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের পর নতুন উন্মাদনায় নতুন আবেগে নাট্যকাররা নতুন নতুন অপেরা লেখা শুরু করে। এই অপেরায় স্থান পায় সাধারণ লোকের জীবন-কাহিনী, সাধারণ লোকের সুখদুঃখ আশা-অভিলাষের কাহিনী। বলাই বাহুল্য, নতুন ধরনের সাহিত্য একদিনে তৈরি হয় না, নতুন ভাবনাধারণা যখন

সাহিত্যিকেরা পাঠকেরা আত্মস্থ করে তখনই সৃষ্টি হয় সার্থক নতুন সাহিত্য। চীনের এই নতুন অপেরা নাটক হিসেবে ও আর্ট হিসেবে নিশ্চয়ই উচ্চস্তরের ছিল না, তবে দেশের কর্ণধারদের উচিত ছিল এই সাধারণ মানুষের জীবনকাহিনী নিয়ে লেখা অপেরা যাতে আরো শিল্পমণ্ডিত হয়ে ওঠে তার জন্য নতুন নাট্যকারদের উৎসাহ দেওয়া। কিন্তু পরিবর্তে দেখা গেল, নেতাদের চীনের পুরনো অপেরার দিকেই ঝোঁক। সেই পুরনো অপেরায় নাচগান বেশি, জাঁকজমক বেশি, হৈ হৈ বেশি, যদিও সেই নাচগান জাঁকজমক হৈ হৈ সাধারণ মানুষের নয়, পুরনো রাজরাজড়াদের, মুষ্টিমেয় ঐশ্বর্যবান ব্যক্তিদের নাচগান জাঁকজমক। অর্থাৎ এই নেতাদের মধ্যে সেই পুরনো সামন্ততান্ত্রিক সংস্কার তখনো রয়ে গেছে, যা প্রকাশ হয়ে পড়ল এই অপেরা-প্রীতির মধ্য দিয়ে।

চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা মাও সে-তুঙের স্ত্রী চিয়াঙ চিঙ একজন অপেরা-প্রেমিক, নিজেও অপেরায় অভিনয় করেন। তিনি কিন্তু নতুন অপেরাকে ভালোবাসেন, পুরোনো অপেরা আর্ট হিসেবে অনেক বেশি সার্থক হলেও। এই নতুন অপেরা পুরনো অপেরার দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা ঘটনা ঘটল। পিকিঙের ভাইস-মেয়রের লেখা ১৯৫৬ সালের একটা অপেরার মধ্য দিয়ে। যদিও অপেরাটি প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে, তবুও সকলেই বুঝল, আসলে ভাইস-মেয়র অপেরার মাধ্যমে রাজনীতি প্রচার করছেন। মাও একজন যুদ্ধমন্ত্রীকে বিতাড়িত করে-ছিলেন তাঁর আমলাতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য। পিকিঙের ভাইস-মেয়রের অপেরায় দেখানো হল, সেই যুদ্ধমন্ত্রীকে বিতাড়ন ক'রে মাও অন্যায় করেছেন।

চিয়াঙ চিঙ চেষ্টা করলেন অপেরার মাধ্যমে মাও-বিরোধী ধারণা প্রচার থামাতে। কিন্তু পিকিঙ শহরে কেউ সাহস পেল না ভাইস-মেয়রের বিরুদ্ধে লিখতে। চিয়াঙ চিঙ সাংহাই শহরে গিয়ে প্রতিবাদ-পত্র লেখালেন, পত্রলেখক পিকিঙের মেয়রের কাছে ধমক খেল। একটি সার্কুলারও বেরুল, রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই এই বক্তব্য রেখে। মাওয়ের বহুদিনের সহকর্মী চীনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা লিউ শাও-চি এই বক্তব্য সমর্থন ক'রে পার্টির দলিল হিসেবে চালু করলেন।

রাজনীতি আর সংস্কৃতি আলাদা-আলাদা, দুয়ে কোনো সম্পর্ক নেই— এটা কিন্তু অবৈজ্ঞানিক ধারণা। রাজনীতি থেকেই সংস্কৃতির জন্ম হয় আবার সংস্কৃতি থেকেও রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, এই দুয়ের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। লিউ শাও-চি এই সম্পর্ক অস্বীকার ক'রে অবৈজ্ঞানিক মনের, অবিপ্লবী ধারণার প্রশ্রয় দিলেন।

পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটি তাই পুরনো সার্কুলারটি খণ্ডন ক'রে নতুন সার্কুলার প্রচার করল। পার্টির কর্মীরা খুব চঞ্চল হয়ে উঠল পার্টির উপরতলায় কিছু একটা দ্বন্দ্ব চলছে আন্দাজ ক'রে। ১৯৫৬ সালের ২ জুন একটা বিরাট পোস্টার পড়ল, পিকিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে, যে অধ্যক্ষ পিকিঙের মেয়র এবং লিউ শাও-চির সমর্থক। শুরু হল চীনের বিখ্যাত পোস্টার যুদ্ধ। এক পক্ষ যদি একটি পোস্টার মারে, অপর পক্ষ উল্টো মর্মে পোস্টার মারে। পিকিঙের জনসাধারণ চঞ্চল হয়ে উঠল। লিউ এবং তাঁর অনুগত নেতারা তৎপর হয়ে উঠলেন। যেসব প্রতিষ্ঠানে পার্টি-কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, সেসব প্রতিষ্ঠানে পার্টি থেকে লোক পাঠানো হল তাদের শাস্ত করতে। যেখানে বিদ্রোহীরা প্রকাশ্যে নেতাদের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলছিল তাদের আখ্যা দেওয়া হল সমাজ-তন্ত্র বিরোধী বলে। পিকিঙের মতো সাংহাইয়ের নেতারাও একই পথ ধরল। কারখানার কর্মীদের দু-পক্ষের নেতারা নিজেদের দলে টানবার চেষ্টা করল। মজা হল, দুপক্ষের নেতারাই মাওয়ের সমর্থক বলে নিজেদের প্রচার করল। আর মাও নিজে তখন পিকিঙ শহরে নেই।

মাও ফিরে এলেন। এসেই দেখলেন লিউয়ের দলের লোকেরা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে। তিনি সেণ্ট্রাল কমিটির অধিবেশন ডেকে একটি রিপোর্ট পাশ করালেন। এই ১৬-পয়েণ্টের রিপোর্টের নাম হল, মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে মতামত।

এতদিন তর্ক-বিতর্কে অংশ নিচ্ছিল পার্টির কর্মীরা আর কারখানার শ্রমিকরা। ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে এতে যোগ দিল ছাত্ররা। ছাত্র আর যুবসমাজ নিয়ে তৈরি রেড গার্ডদের আহ্বান করলেন মাও, তিনি স্বয়ং তাদের লাল ব্যাজ পরিয়ে দিলেন। রেড গার্ড যাবতীয় পুরনো চিন্তা, পুরনো সংস্কৃতি, পুরনো প্রথা, পুরনো অভ্যাসের বিরুদ্ধে প্রচারে নামল। এদের নেতৃত্ব দিলেন মাও স্বয়ং একটা পোস্টার লিখে : হেড কোয়ার্টার্স উড়িয়ে দাও। তাঁর বক্তব্য, নতুন মানুষরা যেন নেতাদের কথা অন্ধভাবে অনুসরণ না করে, ভালোমন্দ ঠিক-বেঠিক সব যেন তারা নিজেরা বিবেচনা ক'রে বিচার করে।

এদিকে প্রতিপক্ষও চুপ ক'রে বসে নেই। তারা ভান করলো যেন যাবতীয় গণ্ডগোলের মূলে মাইনে নিয়ে অসন্তোষ। বোনাস দেওয়া শুরু হল। পুরনো প্রাপ্য কাদের কাদের আছে তা খুঁজে নিয়ে তাদের পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেওয়া হল, অ্যাপ্রেনটিসদের পুরো মাইনে দেওয়া শুরু হল। কারখানার কর্মীদের

প্ররোচিত ক'রে রাস্তায় নামানো হল, উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়-হয়। কমিউন থেকে লোক ধরে নিয়ে এসে পিকিঙের রাস্তায় ভিড় জমানো হল। অমিতব্যয়িতায় উৎসাহ দেওয়া হল, ভোগ্যপণ্য কিনে কিনে কর্মীরা বিলাসিতায় গা ঢেলে দিল। বন্দরের কাজকর্ম বন্ধ, ট্রেন চলাচল স্তব্ধ, সর্বত্র একটা নৈরাজ্যের ভাব। স্কুল-কলেজ বন্ধ, লক্ষ লক্ষ ছাত্র রাস্তায়, পোস্টার লিখছে, প্রচার করছে, তর্ক করছে।

১৯৫৬ সালে চলল খাঁটি রেডগার্ডদের প্রতি-আক্রমণ। যেসব প্রতিষ্ঠান বিদ্যায়তন কারখানা প্রতিবিপ্লবী নেতাদের হাতে ছিল তা দখল করার চেষ্টা চলল। মাও বললেন পার্টি-কর্মীরা চার রকমের হতে পারে: কেউ ভালো, কেউ মন্দ-নয়, কেউ মোহগ্রস্ত আর কেউ সমাজতন্ত্র-বিরোধী। আক্রমণের লক্ষ্য হওয়া উচিত এই শেষোক্ত ধরনের কর্মীরা। এদের হাত থেকে রাষ্ট্রশাসনভার তুলে নিতে হবে। সংবাদপত্র, রেলপথ, বন্দর, জল-সরবরাহ, বিদ্যুৎ-সরবরাহ, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো তুলে নিল বিপ্লবী-কর্মীরা। পিকিঙে সাংহাইতে পুরনো মিউনিসিপ্যাল সরকারকে অকর্মণ্য ক'রে দেওয়া হল। শহরের অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের পর চলল পুরো শাসনযন্ত্রের দায়িত্ব আপন হাতে তুলে নেওয়া। পার্টি-কর্মী, বিপ্লবী কমিটির কর্মী আর জনমুক্তি ফৌজের সদস্যদের ত্রয়ী ঐক্য এই সংগ্রাম সঠিক পথে চালানোর প্রেরণা দিল।

বিপ্লবী সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর আরম্ভ হল লিউ শাও-চি'র বিরুদ্ধে আক্রমণ। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে নয়, তাঁর চিন্তাধারার বিরুদ্ধে। এই তর্কে মাওয়ের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা বলল, দেশের শাসনচালনার দায়িত্বে সকলেই এগিয়ে আসবে বটে, তবে তাতে দেশের বুর্জোয়াদের কোনো স্থান নেই, কারণ তারা সমাজতন্ত্রের প্রকাশ্য শত্রু। সকলেরই ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে, কিন্তু বুর্জোয়াদের সেই স্বাধীনতা দেওয়া হবে না, কারণ তারা সেই সুযোগে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করবে। বুর্জোয়াদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে তাদের পরাস্ত করার যে কথা লিউ বলছেন তার কোনো অর্থ হয় না। কেননা সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য শুধু উৎপাদন বাড়িয়ে সাধারণ লোকের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়ানো নয়— এর উদ্দেশ্য নতুন এক সংস্কৃতির, মানবসভ্যতার সৃষ্টি।

১৯৫৬ সালের চীনের এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে একটি বিরাট অগ্রসর পদক্ষেপ। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য পার্টির দরকার, পার্টিকে শক্তিমান করা দরকার। কিন্তু পার্টিকে সব ক্ষমতা দিয়ে, সব শক্তির কেন্দ্রীভূত

আধার ক'রে তুললে সব সময়ে ভয় থাকে পাছে পার্টির নেতারা একচ্ছত্র আধিপত্য পেয়ে দেশের কথা, সাধারণ জনগণের কথা ভুলে যায়। তাই লেনিন বলেছিলেন পার্টির গঠন হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়তা। পার্টি কেন্দ্রীয় শক্তি চালনা করবে, কিন্তু পার্টি গঠিত হবে গণতান্ত্রিকভাবে— পার্টির নেতাদের সবসময়ে কর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে হবে, পার্টির কর্মীদের সংযোগ রাখতে হবে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে, যতদিন সমস্ত জনসাধারণই পার্টির সঙ্গে একাত্ম না হয়ে যায়। পার্টি যদি আমলাতান্ত্রিক হয়ে যায় তাহলে দেশের জনসাধারণই এসে সেই আমলাতান্ত্রিক নেতাদের বহিষ্কার করবে। এই সমালোচনা আর বহিষ্কার পার্টিকে সজীব রাখতে সাহায্য করে। তবে সেই সমালোচনা আর বহিষ্কারের দায়িত্ব গুটিকযেক নেতাই শুধু নেবে না। কেননা ব্যক্তিগতভাবে নেতারা ভুল করতে পারে, কিন্তু সমবেত জনসাধারণ কখনো ভুল করে না। জনসাধারণে এই আস্থা প্রকাশ চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সবচেয়ে বড়ো অবদান। সাংস্কৃতিক বিপ্লব রাজনৈতিক বিপ্লবের মতোই নির্দিষ্ট সময়ে ঘটে যায় না, এটা নিরন্তর চলে। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবও শেষ হয় নি। এর ভবিষ্যৎ কী, ইতিহাসই বলবে। শুধু একটা কথা পরিষ্কার, চীন চেষ্টা করেছিল যে-জনসাধারণ দেশের প্রাণ সেই জনসাধারণের উপর আস্থা রাখতে।

১০

কিউবা

ইতিহাস আমাকে মুক্তি দেবে

১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা খবরের কাগজে, রেডিওতে, টেলিভিশনে একটা খবর পেল : কিউবার বিদ্রোহীরা পর্যুদস্ত, বাটিস্টা কিউবার গুণ্ডাদের খতম ক'রে এনেছেন।

পরের দিন অবশ্য জানা গেল, বাটিস্টা তাঁর রাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ভোররাত্রে উড়োজাহাজে উঠে পালিয়েছেন। ১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি ফিডেল কাস্ট্রো বিপ্লবী সরকার গঠন করেছেন।

এই সরকার গঠনের কাহিনী, কিউবার এই বিপ্লব প্রথম দৃষ্টিতে যেমন রোমহর্ষক ও বিস্ময়কর মনে হয়, পুরো ইতিহাস জানতে পারলে অবশ্য তেমন অত্যাশ্চর্য মনে হবে না। আমেরিকার মানুষেরা তবু বিস্মিত হয়েছিল, ভেবেছিল, এটা কী ক'রে সম্ভব— ফিডেল কাস্ট্রো আর তাঁর এগারোজন সহচর, তাঁদের হাতে মাত্র একটি ক'রে রাইফেল আর দশটি ক'রে কার্তুজ, বাটিস্টার আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত তিরিশ হাজার সৈন্যকে পরাস্ত করলেন! তাদের বিস্ময়ের কারণ, বিপ্লবের রহস্য তখনো তারা বুঝতে পারে নি।

বিপ্লব নিশ্চয়ই কাস্ট্রো আর তাঁর এগারোজন অনুচর করেন নি। কিউবার সর্বত্র তাঁর মিত্র ছিল। পাহাড়ে গহ্বরে, মাঠেঘাটে, গ্রামে শহরে। বাটিস্টার স্বৈরতন্ত্রে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, দারিদ্র্যের পীড়নে তারা জর্জরিত, সত্যিকার স্বাধীন কিউবার স্বপ্নে তারা উদ্দীপ্ত হয়েছিল। তাদের কাছে কাস্ট্রো এসেছিলেন স্বপ্নের বার্তা নিয়ে। ২৬ জুলাইয়ের স্মৃতি, বিচারাধীন কাস্ট্রোর বক্তৃতা, পাহাড়ে কাস্ট্রোর মুষ্টিমেয় বাহিনীর অসাধারণ বীরত্ব তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। দলে দলে তারা কাস্ট্রোর দলে যোগ দিয়েছিল। সবাই যে প্রত্যক্ষভাবে কাস্ট্রোকে সাহায্য করতে পেরেছিল তা নয়। কেউ গোপনে টাকা দিয়ে সাহায্য করল, সেই টাকায় কাস্ট্রো অস্ত্র কিনলেন। কেউ কেউ নিজের টাকায় বন্দুক

কিনল, কেউ বন্দুক ধার নিয়ে, ভিক্ষা নিয়ে, চুরি করেও পাহাড়ের দিকে রওনা হল কাস্ট্রোর গোপন দলে যোগ দিতে।

১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কাস্ট্রো আর তাঁর এগারো সহচর যখন পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন অবশ্য তাঁর সঙ্গে আর কেউ ছিল না। কিন্তু দু-বছরের মধ্যে কিউবার প্রায় সর্বত্রই কাস্ট্রোর সমর্থক। কৃষকরা সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল কাস্ট্রোকে। প্রথমদিকে বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে, বাটিস্টার সৈন্যদের চোখ থেকে তাদের লুকিয়ে রেখে; পরের দিকে দলে দলে কাস্ট্রোর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে।

এর কারণ অতি সরল। ২৬ জুলাইয়ের এই সৈন্যদলের মতো সৈন্য কিউবার কৃষকরা ইতিপূর্বে আর কখনো দেখে নি। এরা উদ্ধত নয়, অত্যাচারী নয়, এরা লুঠ করে না, নারীধর্ষণ করে না। এরা ভদ্র, কৃষককে সাহায্য করতে উদ্‌গ্রীব। এরা, সব চাইতে আশ্চর্যের কথা, জিনিস কিনে পয়সা দেয়! এদের ডাক্তাররা কৃষককে চিকিৎসা করে বিনা পয়সায়। দু-বছরের মধ্যে এই সৈন্যরা তিরিশটা স্কুল বানিয়ে ফেলে যেখানে কৃষকের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করার সুযোগ পায়। এদের নেতা, ফিডেল কাস্ট্রো, সাধারণ কৃষকের সঙ্গে গল্প করেন, তাদের সঙ্গে চলাফেরা করেন, কী ক'রে দেশের শাসনব্যবস্থা পালটে ফেলা যায় তা নিয়ে খোলাখুলি সহজ ভাষায় আলোচনা করেন, কী ক'রে কৃষকরা জমি পেতে পারে, জমি চাষ ক'রে তার শস্য ভোগ করতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করেন। এগুলো সব কথার-কথা নয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কৃষকরা হাতেনাতেই পেল। সিয়েরা ম্যাস্ট্রা-র একজন ধনী কৃষক নিজেকে প্রচার করল, সে কাস্ট্রোর সমর্থক। এই সমর্থনের নাম ক'রে দুঃস্থ কৃষকদের ঠকিয়ে নিজের জমির সীমা দশ একর থেকে চারশো একর পর্যন্ত বাড়িয়ে নিল সে। একথা যখন প্রকাশ পেল, কাস্ট্রোর সৈন্যরা সেই ধনী কৃষকের বিচার ক'রে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিল। সৈন্যদের উপর দুঃস্থ কৃষকদের আস্থা শতগুণে বেড়ে গেল।

বিপ্লবীদের প্রচারে শহরের শ্রমিকরাও উজ্জীবিত হল। কারখানায়, খনিতে, অফিসে আদালতে তারা নিজের নিজের মতো উপায়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করতে শুরু করল। ঘরে ঘরে বোমা তৈরি হতে লাগল, বাস-ট্রেন উড়ে যেতে লাগল, সরকারী গুদামে, রাস্তাঘাটে, থিয়েটারে বোমা, অফিস-আদালতে বোমা, সরকারী দালাল আর চরদের বাড়িতে বোমা। স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়, সুখী লোকের সুখের জীবনে ঘোর দুশ্চিন্তা এল। প্রচারসাহিত্যে সমস্ত কিউবা ছেয়ে গেল।

কাস্ট্রোর সহকর্মী চে গুয়েভারা আবেদন করলেন, 'স্বাধীন কিউবা' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশে সাহায্যের জন্য। শহরের শ্রমিকরা স্টেনসিল, কাগজ, কালি সংগ্রহ ক'রে দিল, 'স্বাধীন কিউবা' নিয়মিত বেরুতে লাগল। কাস্ট্রো আবেদন করলেন অস্ত্র কেনার জন্য, সৈন্যবাহিনী টিকিয়ে রাখার জন্য, টাকা-পয়সার প্রয়োজন। শহরের শ্রমিকরা কিউবার প্রত্যেকটি প্রদেশে মুক্তিবণ্ড বিক্রি করা শুরু করল, লক্ষাধিক টাকা তুলে দিল কাস্ট্রোর হাতে। যেসব শ্রমিক এই সব করেও স্থির থাকতে পারল না, তারা পাহাড়ের দিকে রওনা হল কাস্ট্রোর গোপন সৈন্যদলে নাম লেখাতে। অস্ত্র জোগার হল বাটিস্টার সৈন্যদের উপর হঠাৎ আক্রমণ ক'রে, অন্ধকারে গোপনে নিরালা জায়গায়।

কৃষক এবং শ্রমিক ছাড়া শিক্ষিত শ্রেণীরা তো ছিলই, বিশেষ ক'রে ছাত্ররা, কাস্ট্রোর সমর্থনে। তাছাড়া সমর্থন করল কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি। তারা অবশ্য কাস্ট্রোর পদ্ধতিতে বিশ্বাস করত না, সশস্ত্র উপায়ে বাটিস্টার শাসন উৎখাত করা যাবে তা তারা তখনো বিশ্বাস করে নি, বরং তারা চেষ্টায় ছিল কৃষক ও শ্রমিকদের দিয়ে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার দখলে। কাস্ট্রোর আহ্বানে একটি দেশময় ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছিল। ধর্মঘট সফল হয় নি, তবুও সাধারণ লোকের কাস্ট্রোর প্রতি আস্থা নষ্ট হয় নি। সেই ঘটনা লক্ষ ক'রে কমিউনিস্টরা পরোক্ষভাবে কাস্ট্রোর পিছনে সমর্থন রাখল।

সুতরাং, আমেরিকার লোক যে প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল, বারোজন 'দস্যু'র হাতে বাটিস্টার পতন কী ক'রে হতে পারে ভেবে, তার কারণ আর কিছু নয়, কিউবা সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতা।

৪৪,২১৮ বর্গমাইলের ছোট একটি দেশ এই কিউবা। পশ্চিমবঙ্গের আয়তনের অর্ধেক এই পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জে লোক থাকে ষাট লক্ষের মতো, কলকাতার অধিবাসীর সমান। অত্যন্ত উর্বর জমি, দেশের প্রায় অর্ধেক জমিতেই ফসল ফলে, খনিতে বিস্তর লোহা আর নিকেল। সব মিলিয়ে সুন্দর আবহাওয়ার এই দেশটি, কলম্বাস যাকে বলেছিলেন পৃথিবীর স্বর্গ। সুখের দেশই হওয়া উচিত ছিল। অথচ বাস্তব সত্য হল, কিউবার লোকেরা অসম্ভব গরিব। অর্ধেক লোক থাকে গ্রামে, বাড়ি বলতে তাদের কিছু নেই, আছে কিছু চালাঘর ছাউনি। জল নেই আলো নেই পায়খানা নেই, একটি চালাঘরে হয়ত বারোজন লোক থাকে। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, আধপেটা খেয়ে, অসুখে ভুগে লোক মারা যায়, কারো তাতে মাথাব্যথা নেই। লেখাপড়ারও কোনো বালাই নেই, অক্ষরজ্ঞানই নেই বেশির

ভাগ লোকের। ঘরে ঘরে লোক বসে বসে ধুঁকে মরে— কাজ নেই, কাজের সুযোগও নেই।

অথচ কিউবাতে কাজ তৈরি করার সুযোগ বিস্তর। পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে বেশি আখ এখানে তৈরি হয়, ফলে চিনি হতে পারে পৃথিবীর সব চাইতে বেশি পরিমাণে। হয়ও। তখন কাজ থাকে বেশ। তবে, তা বছরে তিন-চার মাস। তার পরে ঘরে ঘরে বেকার। কিন্তু ঐ আখের ব্যবসা, চিনির ব্যবসা ক'রে কিছু লোক বিস্তর টাকা করে। তারা কতকগুলো কর্পোরেশন তৈরি ক'রে, প্রায় সব জমি হাতে নিয়ে, আখ ফলিয়ে, চিনি বানিয়ে টাকার পাহাড় ক'রে ফেলে।

এবং এই লোকগুলো বেশির ভাগই বিদেশী, সবাই আমেরিকান। চারভাগের তিনভাগ চিনিকলই তাদের হাতে। বলা বাহুল্য, তারা কিউবার লোকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশেষ মাথা ঘামায় না, কী ক'রে চিনিকল থেকে টাকা, আরো টাকা, করা যাবে তা নিয়েই তাদের যত সমস্যা। কিউবার লোকেরা উত্তরের এই দানবাকৃতি দেশ আমেরিকাকে সুতরাং কী নজরে দেখবে, সে বিষয়ে বেশি বলাই বাহুল্য। পাকে-প্রকারে সমস্ত কিউবা দেশটিই চালাচ্ছিল আমেরিকানরা, যদিও নামে দেশটি স্বাধীন। বহুদিন ধরেই আমেরিকার ইচ্ছা, কিউবা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি রাষ্ট্র হয়ে যাক। তা যতদিন না হয়, ততদিন কিউবা স্পেনেরই উপনিবেশ হয়ে থাক। কিউবা তা-ই ছিল। স্পেনের শাসনে অথবা কুশাসনে ভূস্বর্গ এই কিউবার লোকেরা না-খেয়েই প্রায় জীবন কাটাচ্ছিল। স্পেনের সুদিন অবশ্য শেষ হয়ে আসছিল। পৃথিবীর বহু অংশেই উপনিবেশগুলো ভালো ক'রে চালানোর সামর্থ্য তার কমে আসছিল। সুযোগ বুঝে আমেরিকা সত্তর কোটি টাকা দিয়ে স্পেনের কাছ থেকে কিউবা কিনে নিতে চাইল ১৮৩০ সাল নাগাদ। স্পেন রাজি হল না। তাতে অবশ্য আমেরিকা একেবারে মুষড়ে পড়ল না, কারণ দেশী জিনিস কিউবাতে চড়া দরে বিক্রি ক'রে আর কিউবার জিনিসপত্র সস্তায় কিনে, টাকার ব্যবসাটা তার ভালোই চলছিল। কিউবা স্পেনের সঙ্গে যত-না বাণিজ্য করত, তার থেকে বেশি করত আমেরিকার সঙ্গে। স্পেন আর আমেরিকার সঙ্গে এই টানাপোড়েন লেগেই থাকত, যদি না কিউবার লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে দুদেশের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করত। ১৮৬৮ সালে এর শুরু, দশ বছর ধরে এটা চলল। স্পেনের কোটি কোটি টাকা খরচ হল এই বিদ্রোহ দমন করতে, লাখখানেক সৈন্য তার মারা

পড়ল। কিউবা দেশটিও হয়ে উঠল প্রায় শ্মশান। সুযোগ বুঝে আমেরিকানরা আখের জমি দখল ক'রে চিনিকল বানাতে উঠে পড়ে লাগে। খনিগুলোতেও ঝাঁকে ঝাঁকে আমেরিকান উড়ে এসে জুড়ে বসল। ১৮৯৫ সাল নাগাদ কিউবার লোক আবার বিপ্লবে নামল স্পেনের শাসনের বিরুদ্ধে। তিন বছর ধরে তারা চালালো এই যুদ্ধ। যুদ্ধের চাপ সহ্য না করতে পেরে স্পেন প্রায় কিউবা ছাড়ে-ছাড়ে, এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জানালো, কিউবার স্বাধীনতা লাভের অধিকার আছে, স্পেন কিউবা থেকে সৈন্য সরাতে বাধ্য এবং এর জন্য আমেরিকা কিউবাতে সৈন্য পাঠাতে প্রস্তুত! কিউবার শান্তি রক্ষা করবে আমেরিকার সৈন্যরা। বিচিত্র ব্যবস্থা! স্পেনের সৈন্য কিউবা ছাড়ল, আর ১৯০১ সালে আমেরিকা কিউবার সঙ্গে প্ল্যাট চুক্তি ক'রে স্থির করল, কিউবার স্বাধীনতা রক্ষা করবে আমেরিকা। অর্থাৎ কিউবা নামেই স্বাধীন হল, কার্যত তার শাসক হল স্পেনের বদলে আমেরিকা। আমেরিকার সৈন্যরাও কিউবা ছাড়ল বটে, কিন্তু বদলে রেখে গেল কিউবার জমি আর খনিতে আমেরিকান মালিক।

এমনই কিউবায় ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা। প্রার্থী তিনজন। তার মধ্যে কোনো আশাই নেই যাঁর তাঁর নাম বাটিস্টা। বাটিস্টা যখন বুঝলেন নির্বাচনে তাঁর কোনো আশাই নেই, তখন সোজা গিয়ে কিউবার সবচাইতে বড়ো দুর্গে, ক্যাম্প কলাম্বিয়ায়, ঢুকে সেটা দখল ক'রে বসলেন। বাটিস্টা যে বিরাট অপরাধটি করলেন, স্বাধীন নির্বাচন হতে না দিয়ে, কিউবার আইন অনুসারে বিভিন্ন দফায় তার জন্য ১০৮ বছর জেল হওয়ার কথা। পরিবর্তে বাটিস্টা নিজেকে রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষণা করলেন, পিছনে তাঁর সৈন্যরা। এবং তার পিছনে আমেরিকার কলকাঠি। বাটিস্টা তাদেরই হাতের লোক, যেমন তারা চালাবে তেমন ইনি চলবেন।

বাটিস্টার এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একমাত্র লোক যিনি আপত্তি করতে সাহস পেলেন তাঁর নাম ফিডেল কাস্ট্রো। বয়স তাঁর তখন পঁচিশ। সবে হাভানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে আইনব্যবসায়ে নেমেছেন। ধনীর ছেলে, কিন্তু প্রবল জাত্যভিমান। কিউবার সাধারণ লোকের শোচনীয় দুর্গতি তাঁর নজরের বাইরে নয়। কলেজে পড়ার সময়ই অন্যান্য অনেক ছেলের মতোই রাজনীতি বিষয়ে প্রবলভাবে সচেতন, অসাধারণ বাগ্মিতা-শক্তি, প্রখর বুদ্ধি। সৎ কর্মক্ষম সরকার গঠন ক'রে কিউবার সাধারণ লোকের ভাগ্য ফেরাতে হবে,

এই উদ্দেশ্য তখন থেকেই তাঁর মাথায় ঘোরাফেরা করা শুরু করেছে। স্বাধীনতার প্রেম এত বেশি যে এই ছাত্রটি একুশ বছর বয়সে যোগ দিয়েছিলেন এক সৈন্যদলে, উদ্দেশ্য ডমিনিকান রিপাব্লিকের স্বৈরাচারী শাসককে শায়েস্তা করা। উদ্দেশ্য অবশ্য সফল হয় নি, ফিডেল তিন মাইল সাঁতরে কোনো মতে সে যাত্রা গ্রেপ্তারের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।

বাটিস্টার রাষ্ট্রপতি পদ অধিকার করার বিরুদ্ধে ফিডেলের জোরালো আপত্তি যখন কোনো কাজেই এল না, তখন ফিডেল উপলব্ধি করলেন, বিপ্লব ছাড়া দেশের মুক্তি সম্ভব নয়। আর ফিডেল কথায় যেমন তৎপর কাজেও তেমন। তিনি মুক্তি-যোদ্ধা সংগ্রহে মন দিলেন। উদ্দেশ্য বিফল হলে পরিণতি অত্যাচার এবং মৃত্যু, এটা জেনেও প্রায় দুশো তরুণ ফিডেলের দলে নাম লেখালো। একবছর ধরে ট্রেনিং চলল, পরিকল্পনা তৈরি হল।

উদ্দেশ্য, কিউবার দ্বিতীয় বৃহৎ দুর্গ মনসাডা দখল করা। সেখানে আছে প্রায় এক হাজার সৈন্য আর প্রচুর গোলাবারুদ। সান্টিয়াগোর উপান্তে এই দুর্গ দখল করার জন্য ফিডেল আর তাঁর তরুণবাহিনী ভোররাত্রে আক্রমণ করলেন। আক্রমণ সফল হল না। বেশ কয়েকজন তরুণ নিহত হল, কয়েকজনকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হল, বাকি সবাইকে মেরে হাড়গোড় ভেঙে জেলে পাঠানো হল। ফিডেল আর তাঁর ভাই রাউল কয়েটিমাত্র তরুণকে নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন।

এই আক্রমণ ঘটেছিল ১৯৫৩ সালের ২৬ জুলাই। আক্রমণটি সার্থক হয় নি, কিন্তু কিউবার ইতিহাসে ২৬ জুলাই এক বিরাট স্মৃতি। যে তরুণেরা দেশের কল্যাণের জন্য বিপ্লব ঘটাতে গিয়েছিল, তাদের আত্মত্যাগ, মহৎ প্রচেষ্টা সমস্ত কিউবায় এক বিরাট চাঞ্চল্য আনল। বাটিস্টার সৈন্যরা এরপর যা শুরু করল তাতে ২৬ জুলাই আন্দোলন আরো বেশি জোরদার হয়ে উঠল। ফিডেলের অনুচর এই সন্দেহে বাটিস্টার সৈন্যরা প্রায় কুড়ি হাজার নিরীহ লোককে খুন করল, আর কতকে জেলে ঢোকালো তার কোনো সঠিক সংখ্যা জানার উপায় নেই। বন্দুক হাতে সৈন্যরা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, শিশুবৃদ্ধ নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণের সব রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হল, বাক্-স্বাধীনতা লোপ পেল। বাটিস্টা হুকুম করলেন, মনসাডার উপর আক্রমণে যে ক'টি সৈন্য মারা গেছে তার দশগুণ ফিডেল-পন্থীকে হত্যা করতে পারলে তবে তাঁর শান্তি।

বাটিস্টার সৈন্যদের অত্যাচারে শেষপর্যন্ত সান্টিয়াগোর আর্চবিশপও মুখ খুলতে

বাধ্য হলেন। বাটিস্টার কাছে আবেদন জানালেন তিনি, এরকম নির্বিচারে হত্যা না ক'রে বিচার করো, তারপর শাস্তি দাও। বাটিস্টার সেনাপতিরা মুখে অবশ্য বলল, বিচার না ক'রে তারা শাস্তি দেবে না, কিন্তু গোপনে আদেশ গেল, ফিডেলকে দেখামাত্র হত্যা করতে হবে।

ফিডেল হয়ত খুনই হতেন, নেহাৎ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেলেন একবার। সিয়েরা ম্যাস্ট্রা পাহাড়ের তলায় ফিডেল আর তাঁর দুই সহচর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, এমন অবস্থায় বাটিস্টার সৈন্যদলের হাতে ধরা পড়া গেলেন তাঁরা। সেই দলের একজন লেফটেনাণ্ট, তিনিই দলটির নায়ক, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ফিডেলকে চিনতেন। ফিডেলের জামাকাপড় হাতড়িয়ে গোপন অস্ত্র খুঁজে বার করবার অছিলায় ঝুঁকে পড়ে লেফটেনাণ্টটি ফিডেলকে বললেন, নাম বলে দিও না তাহলে খুন করা হবে তোমাকে।

ফিডেল গ্রেপ্তার হলেন। বিচার আরম্ভ হল। সেটা আর এক প্রহসন।

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩, বিচারের শুরু। ফিডেলের আর ১২২ জন কয়েদীর, যাদের সঙ্গে মনসাডা আক্রমণের বিন্দুবিসর্গ সম্পর্ক নেই। আদালতে যাওয়ার সবক'টা রাস্তায় সৈন্যরা টহল দিচ্ছে— পাছে ফিডেল আবার পালিয়ে যান, পাছে কিউবার তরুণেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ফিডেলকে উদ্ধার করতে।

আদালতে দাঁড়িয়ে ফিডেল পরিষ্কার অপরাধ স্বীকার করলেন, হ্যাঁ তিনি মনসাডা আক্রমণ করেছিলেন, মনসাডা আক্রমণ করতে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু সেটা যে অপরাধ তা তিনি স্বীকার করলেন না। তিনি দেশের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রশক্তি দখল করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সেই চেষ্টা তিনি করলেন না কেন। উত্তরে বললেন ফিডেল, শান্তিপূর্ণ অবস্থা এখন কিউবার নয়। এখানে মানুষের কোনো স্বাধীনতা নেই। শান্তিপূর্ণ উপায়েই তিনি বাটিস্টার অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন, যেভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে বাটিস্টা কিউবার রাষ্ট্রপতি হয়েছেন নির্বাচন অগ্রাহ্য ক'রে, ফিডেল তার প্রতিবাদও করেছিলেন, তখন এই আদালত কী করছিলেন?

আদালত প্রশ্ন করলেন, ফিডেল মনসাডা আক্রমণ ক'রে কী লাভ আশা করেছিলেন? ফিডেল বললেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কিউবার বেতার কেন্দ্রগুলো দখল ক'রে কিউবার লোকদের কাছে আবেদন করা, বাটিস্টার স্বৈরতন্ত্রের, স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিউবার গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য।

ফিডেলকে জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁরা কি কমিউনিস্ট? ফিডেল জানালেন, না।

তবে কেন তাঁর অনুচররা লেনিন পড়ে? তাঁর বন্ধুরা পড়াশুনা করতে ভালো-বাসেন, পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে জানার ইচ্ছা তাঁদের প্রবল— ফিডেলের উত্তর। কমিউনিস্টরা যদি সাহায্য না করবে তাহলে অস্ত্রশস্ত্র কেনার টাকাপয়সা আসছে কোথা থেকে?' ফিডেল জানালেন যে এক লক্ষ টাকা তাঁরা সংগ্রহ করেছেন, তা এসেছে কিউবার সাধারণ লোকজনের কাছ থেকে, বাটিস্টার কোনো গোপন শত্রু টাকা জোগাচ্ছে না। কিউবার জনসাধারণ বাটিস্টার শত্রু বটে, তবে গোপনে নয়।

বিচারের দ্বিতীয় দিনে ফিডেলকে সাক্ষীর কাঠগোড়া থেকে বাটিস্টার সরকারকে জেরা করার অধিকার দেওয়া হল। ফিড়েল এটার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর আইনজ্ঞান ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য নয়, বাটিস্টা যে রাশিরাশি মিথ্যা বলে যাচ্ছেন সেটা সর্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করার জন্য। আরো উদ্দেশ্য, ফিডেলের সত্তরজন অনুচরকে গ্রেপ্তার করার পর যে হত্যা করা হয়েছে, সেটা প্রমাণ করা এবং বিচারাধীন তরুণদের নির্বিবাদে মারধোর করা চলছে, সেটা সবাইকে জানানো। ফিডেল, বিচারের দ্বিতীয় দিনে, প্রশ্নবাণে বাটিস্টার সরকারী কর্মচারীদের, মিলিটারি অফিসারদের অতিষ্ঠ ক'রে তুললেন।

বিচারের তৃতীয় দিনে ফিডেলকে আদালতে দেখা গেল না। জানানো হল, ফিডেল অসুস্থ। সন্দেহ জাগল, ফিডেলকে আদালতে আনলে বোধহয় সরকারী অফিসাররা ফিডেলের প্রশ্নের চোটে কাহিল হয়ে পড়বে, সব কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাবে। সন্দেহটি যে অসত্য নয় তা প্রকাশ পেল, যখন একজন তরুণী আদালতের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর চুলের গোছার ভিতর থেকে ফিডেলের চিঠি বার ক'রে জানালেন, ফিডেল অসুস্থ নন, তাঁকে আসতে দিচ্ছে না সরকার, কারণ ভয়।

সরকারের মুখোস উন্মোচন সত্ত্বেও ফিডেলকে আদালতে আনা গেল না। বিচারের প্রহসন চলল ফিডেল ছাড়াই। অবশেষে ফিডেলকে আনা হল মাস-দুয়েক পর, তা-ও প্রকাশ্যে নয়, গোপন আদালতে।

সেই গোপন আদালতে, আত্মপক্ষসমর্থনে, ফিডেল টানা পাঁচ ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। ছিয়াত্তর দিন নির্জন সেলে বসে ফিডেল কোনো বইয়ের সাহায্য ছাড়াই, কোনো দলিলের সাহায্য ছাড়াই যে বক্তৃতা তৈরি করেছিলেন, বাটিস্টার শাসনের, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে আবেদন জানিয়েছিলেন, ইতিহাস, আইন, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন সম্বন্ধে তাঁর যে নিবিড় জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন,

ইতিহাসে তা অমর হয়ে থাকবে। সেই বক্তৃতাটির নাম, 'ইতিহাস আমাকে মুক্তি দেবে'। ফিডেল বাটিস্টার কাছে করুণাভিক্ষা করেন্ নি, তিনি চেয়েছিলেন কিউবার মুক্তি। তিনি ভবিষ্যৎ কিউবার স্বপ্ন কীভাবে দেখেছিলেন, তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় এই বক্তৃতায়।

ফিডেলের বিপ্লবী সরকার রাষ্ট্রশক্তি দখল করতে পারলে কিউবার মানুষের জন্য কী করবে? ফিডেল আদালতকে জানালেন:

যদি কিউবার জনসাধারণ এই বিপ্লবী সরকারকে সমর্থন করে তাহলে এই সরকার অপদার্থ অসৎ সরকারী কর্মচারীদের এবং অফিসগুলো সব ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করবে। দেশকে শিল্পোন্নত করার চেষ্টা করবে। দেশের যে মূলধন অলস হয়ে পড়ে আছে তা প্রায় ১৫০০ মিলিয়ন ডলার হবে। জাতীয় ব্যাঙ্ক, শিল্প ব্যাঙ্ক, কৃষি ব্যাঙ্ক, উন্নয়ন ব্যাঙ্ক তৈরি ক'রে এই টাকার বিনিয়োগ করা হবে। এই দায়িত্ব দেওয়া হবে তাঁদের উপর যাঁরা এসব বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন।

কৃষিসমস্যার সমাধান হবে এইভাবে: প্রায় এক লক্ষ ছোট কৃষক আছে যারা জমি ভাড়া নিয়ে চাষ করে। এই জমির স্বত্ব তাদের দিয়ে দেওয়া হবে। জমির উচ্চসীমা নির্ধারণ ক'রে উদ্বৃত্ত জমি চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হবে। জলা জমি উদ্ধার, চুরি করা জমি উদ্ধার করেও তা বিলি করা হবে। যেসব চাষী পরিবারগুলো বড়ো তাদের মধ্যে জমি আগে বিলি করা হবে। এরপর কৃষি সমবায় সমিতি তৈরি করা হবে। চাষীদের জমি উন্নতভাবে চাষ করতে সাহায্য করা হবে।

গৃহসমস্যা দূর করা হবে চালাঘর সব ভেঙে ফেলে, তার জায়গায় বড়ো বড়ো বাড়ি তৈরি ক'রে। বাড়ি ভাড়া অর্ধেক ক'রে দিতে হবে, যেসব বাড়িতে বাড়ির মালিকরা থাকে সেসব বাড়ির কর উঠিয়ে দিয়ে, যেসব বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয় সেসব বাড়ির কর তিনগুণ বাড়িয়ে।

শিল্প, কৃষি, আর গৃহসমস্যা এইভাবে দূর করতে পারলে, কাজের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে, বেকার সমস্যার সমাধানও আপনা হতে ঘটবে। তারপর সরকার হাত দেবে শিক্ষার উন্নতিতে। এই শিক্ষাসূচিতে জোর দেওয়া হবে কৃষিশিক্ষার উপর।

এত সব সংস্কারের টাকা কোথা থেকে আসবে? আসবে, যখন সরকারী টাকা নিজ স্বার্থে আত্মসাৎ করা বন্ধ হবে, দেশের সমস্ত ঐশ্বর্য দেশের কয়েকজনের

উন্নতিতে না লাগিয়ে সকলের স্বার্থে নিয়োগ করা হবে। কিউবার যে সম্পদ আছে তাতে কিউবার জনসাধারণের তো বটেই, তার বিশগুণ লোকেরও উন্নতি করা যায়।

আদালত ফিডেলের বক্তব্য শোনার পর তাঁকে পনেরো বছরের কারাদণ্ড দিল। একটা দ্বীপে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হল। প্রথম সাত মাস ছিল নির্জন কারাদণ্ড। তারপর যখন তাঁকে অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া হল, তখন ফিডেল শুরু করলেন একটা স্কুল চালানো। ইতিহাস দর্শন পড়াতে শুরু করলেন ফিডেল তাঁর তরুণ সতীর্থদের।

এদিকে কিন্তু সমস্ত কিউবায় অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল। ফিডেলের ২৬ জুলাইয়ের আন্দোলন, তাঁর 'ইতিহাস আমাকে মুক্তি দেবে' বক্তৃতা সমস্ত তরুণদের কৃষকদের শ্রমিকদের কাছে একটা বিরাট উদ্দীপনা এনে দিয়েছে। দেশের অবস্থায় এমন উন্মাদনা দেখে বাটিস্টা ভয় পেয়ে তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা আস্তে আস্তে কমাতে বাধ্য হলেন। কিছু-কিছু বাক্-স্বাধীনতা মানতে তিনি রাজি হলেন। নতুন ক'রে নির্বাচনের দিন নির্ধারণ করতেও স্বীকার করলেন। কিন্তু নির্বাচনের প্রহসনে কিউবার লোকজন ভুলবে না। তারা দেশময় আন্দোলন শুরু করল : ফিডেল কাস্ট্রোর মুক্তি চাই। এই আন্দোলনের সামিল হল কিউবার শিক্ষিত অংশও। ১৯৫৫ সালে বাটিস্টা একাই নির্বাচনে দাঁড়ালেন, সুতরাং ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আবার চার বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতেও তাঁর অসুবিধা থাকল না। কিন্তু তাঁর পরামর্শদাতারা কিউবার হাওয়া বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা বাটিস্টাকে বুদ্ধি দিলেন, সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে। বাটিস্টাও অবস্থা বেগতিক বুঝে রাজি হয়ে গেলেন। ১৯ মে, ১৯৫৫, ফিডেল তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে মুক্তি পেলেন।

ফিডেল মুক্তি পেলেন, কিন্তু টের পেতে দেরি হল না, তাঁকে সবসময়েই চোখে চোখে রাখা হচ্ছে। কার্যক্রম নির্ধারণ করতে ফিডেল দেরি করলেন না। মেক্সিকো চলে গেলেন তিনি। উদ্দেশ্য, কিউবা আক্রমণ করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র কেনার টাকা জোগাড় করা, সৈন্য তৈরি করা। ২৬ জুলাইয়ের সব যোদ্ধারা মিলিত হলেন। আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে কিউবার অনেকে পালিয়ে বসবাস করছিলেন। ফিডেল সেসব জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন, তাঁদের কাছে অর্থভিক্ষা চাইলেন। অর্থ প্রচুর জুটল। ফিডেল মেক্সিকোতে ফিরে এলেন।

আশিজন সৈন্য নিয়ে ফিডেলের নতুন বাহিনী গঠন শুরু হল। গেরিলা যুদ্ধে

তাদের শিক্ষিত ক'রে তোলার জন্য ফিডেল নিয়োগ করলেন কর্নেল বেয়োকে। মেক্সিকো শহরে কয়েকটি বাড়ি ভাড়া ক'রে প্রথমে বেরো শুরু করলেন গেরিলা যুদ্ধের তাত্ত্বিক আলোচনা, তারপর পাহাড়ের ঘন জঙ্গলে হাতেনাতে কাজ করার দীক্ষা। মিলিটারি স্কুলে তিন বছরে যা শেখা যায়, তিন মাসে সেই শিক্ষা নিয়ে নিল ফিডেলের সতীর্থরা। পিস্তল রাইফেল মেশিনগান কীভাবে চালায়, বোমা কীভাবে বানায়, ট্যাঙ্ক কীভাবে ওড়ায়, এরোপ্লেন কীভাবে কুপোকাৎ করা যায়, কীভাবে লুকিয়ে পড়তে হয়, কীভাবে আহতদের নিয়ে পালাতে হয় ইত্যাদি সব বিষয়। কোর্স শেষে পরীক্ষা হল। পরীক্ষায় যিনি প্রথম হলেন তাঁর নাম চে গুয়েভারা। চে ছিলেন আর্জেন্টিনার এক ডাক্তার, স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেই তাঁর প্রথম জীবন কাটে। মেক্সিকো শহরে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে ফিডেলের ভাই রাউলের, তার পরই তিনি ফিডেলের সৈন্যদলে নাম লেখান। ডাক্তার হিসেবে নন, সৈন্য হিসেবে। কর্নেল বেয়ো বললেন, গেরিলা যুদ্ধশাস্ত্রে চে'র মতো ছাত্র পাওয়া দুষ্কর।

এরই মধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ১৯৫৭ সালের জুন মাসে কাস্ট্রো গাড়ি বোঝাই ক'রে অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন মেক্সিকো শহর থেকে পাহাড়ের দিকে, এমন সময়ে চোরের সন্ধানে একদল মেক্সিকান পুলিশ তাঁকে ধরে এবং অস্ত্রশস্ত্র দেখে ফিডেলকে গ্রেপ্তার করে। অস্ত্রশস্ত্রও গেল, বেশ কয়েকটি মূল্যবান দিনও গেল ফিডেলের। বাটিস্টার চরেরাও ফিডেলের বিরুদ্ধে মেক্সিকোর সরকারকে অবহিত ক'রে দিয়েছিল। ফিডেলকে তাই বেশ কয়েকবার জেলে যেতে হয়েছিল মেক্সিকোতে।

কর্নেল বেয়ো বারবার হুঁসিয়ার ক'রে দিয়েছিলেন ফিডেল কাস্ট্রোকে, গেরিলা যুদ্ধের আদি শর্তগুলো সম্পর্কে : উদ্দেশ্য এবং কর্ম সম্পর্কে চরম গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য। কিন্তু ফিডেল এই শর্ত মানতে রাজি হলেন না। তাঁর বক্তব্য, কিউবার সবাইকে জানানো দরকার ফিডেলের উদ্দেশ্য।

১৫ নভেম্বর ফিডেল ঘোষণা করলেন তিনি কিউবা আক্রমণ করছেন। দশ দিন পর 'গ্রানমা' জাহাজে আশিজন সৈন্য অস্ত্র আর খাদ্য নিয়ে যাত্রা করল। কথা ছিল কিউবার একটি স্থানে একজন বিপ্লবী কৃষক একশো জন বিপ্লবী এবং ট্রাক নিয়ে ফিডেলের সঙ্গে যোগ দেবে। সেখান থেকে তাঁরা যাবেন মানজানিলোতে, যেখান থেকে তাঁরা বাটিস্টার সৈন্যদের আক্রমণ করবেন। ইতিমধ্যে কিউবার অন্যান্য বিপ্লবীরা বিভিন্ন শহরে বোমাবর্ষণ ক'রে ক'রে বাটিস্টা সরকারকে বিভ্রান্ত

ক'রে দেবেন। মানজানিলো থেকে ফিডেল সিয়েরার পাহাড়ে আশ্রয় নেবেন, যার দুর্ভেদ্য জঙ্গল থেকে তাঁর আক্রমণ চলবে। এই আক্রমণ আরম্ভ হলে কিউবার শ্রমিকরা ধর্মঘট ক'রে ক'রে কিউবার অর্থনীতি বিপর্যস্ত ক'রে দেবে।

কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হল গ্রানমার জন্য। জোরে চলার জন্য এর ইঞ্জিনও প্রস্তুত ছিল না, ইঞ্জিন ঠিক করার সময়ও ছিল না, উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে তাল রেখে গ্রানমা চলতে পারল না, সৈন্যরা সব অসুস্থ হয়ে পড়ল। ফলে ৩০ নভেম্বর যেদিন কিউবা আক্রমণ করার কথা, সেদিন গ্রানমা কিউবার তীর থেকে বহুদূরে। এদিকে সান্টিয়াগো এবং হলগুইন আক্রমণ শুরু হয়েছে এবং সফলভাবেই। ২ ডিসেম্বর গ্রানমার চালক জলে উল্টে পড়ে গেলেন। তাঁকে গভীর অন্ধকারের মধ্যে জল খুঁজে তোলা হল, আরো সময় নষ্ট হল। তারপর যদি-বা তীরে পৌঁছনো গেল, গ্রানমা আটকে গেল চড়ায়। প্রচণ্ড ঢেউয়ের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র খাদ্যদ্রব্য নিয়ে তীরে ওঠা অসম্ভব। ফলে সেই আশিজন সৈন্য খালি হাতে কিউবার তীরে উঠল। কিন্তু কেউ জানে না জায়গাটা কোথায়। তখন পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর গতি রইল না। ইতিমধ্যে বাটিস্টার সৈন্যরা গ্রানমা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে। রাত্রির অন্ধকারে হাঁটা আর দিনের বেলা লুকিয়ে থাকা— খাওয়া নেই, ঘুম নেই, এইভাবে তিনদিন চলে ফিডেল আর তাঁর সৈন্যরা পৌঁছলেন এক আখ চাষের জমিতে। সেখানে তাঁরা একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন, এমন সময় বাটিস্টার উড়োজাহাজী সৈন্যরা তাঁদের দেখতে পেয়ে অবিরাম বোমাবর্ষণ শুরু করল; ৮০ জনের ৭ জন মারা গেল, অনেকে আহত হল। চে'র ঘাড়ে গুলি লাগল। সেই অবস্থায়ও তিনি আহতদের চিকিৎসা চালিয়ে গেলেন। বিপ্লবী সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, ফিডেল আর দুজন আশ্রয় নিলেন একটা আখের ক্ষেতে, রাউল আর পাঁচজন আশ্রয় নিলেন অন্য একটি ক্ষেতে। পুরো পাঁচটা দিন শুধু আখের রস খেয়ে দিনরাত কাটানো। বাইশজন মোট বাঁচল সেই যাত্রা। আবার সবাই মিলিত হল। মিলনের পর ফিডেল শুধু বললেন, বাটিস্টার দিন ঘনিয়ে এসেছে। ফিডেলকে তখন উন্মাদই মনে হয়েছিল।

বাইশজনের মধ্যে আবার দশজন ধরা পড়ল বাটিস্টার সৈন্যদের হাতে। অবশিষ্ট বারোজন নিয়ে ফিডেল আশ্রয় নিলেন সিয়েরা পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায়। এঁদের মধ্যে ছিলেন ফিডেল, রাউল আর চে।

বারোজন সহচর নিয়ে সিয়েরার মাথা থেকে ফিডেল শুরু করলেন তাঁর তীব্র প্রচার-যুদ্ধ। ১৯৫৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে কিউবার লোক প্রথম শুনল মুক্ত কিউবার বেতার-বার্তা। ফিডেল এই বেতারে শুরু করলেন বাটিস্টার অত্যাচারের চরিত্র উদ্ঘাটন করা, তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিউবার লোকদের অবহিত করা। ফিডেল আবেদন করলেন কিউবার শ্রমিকদের কাছে ধর্মঘট ক'রে ক'রে কলকারখানা অচল ক'রে দিতে। একটা বন্ধ্ ডাকা হল। কিন্তু বেশি গোপনীয়তা রক্ষা করার চেষ্টায় বন্ধ্ সার্থক হল না, অনেক কারখানার শ্রমিক জানতেই পারল না কবে বন্ধ্ ডাকা হয়েছে। তবুও বড়ো বড়ো শহরে, হাভানা বাদ দিয়ে, ধর্মঘট সার্থক হয়েছিল।

বন্ধ্ ডাকার পর বাটিস্টার অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। প্রতিরোধে কিউবার জনসাধারণও উঠেপড়ে লাগল। অনেক বিপ্লবী কর্মী ধরা পড়ল, পুলিশের হাতে নিহত হল। বাটিস্টাকে খুন করতে গিয়ে একদল ছাত্র ধরা পড়ল। নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দিল, বিদ্রোহ অবশ্য দমন করা হল। সফল হোক অসফল হোক, ফিডেলের জনপ্রিয়তা ও সমর্থন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

বাটিস্টা ক্ষিপ্ত হয়ে বারো হাজার সৈন্য নিয়ে সিয়েরার দিক অগ্রসর হলেন ১৯৫৮ সালের ৫ মে, উদ্দেশ্য ফিডেলের তিনশো সৈন্যকে খতম করা। কিন্তু উদ্দেশ্য দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। সিয়েরার জঙ্গল আর পাহাড় এই সৈন্যদের অচেনা। ওখানে যারা আছে তারা প্রাণ দিয়েও রক্ষা করবে তাদের জীবনের ব্রতকে, আর এই সৈন্যরা যুদ্ধ করছে নেহাৎই চাকরির জন্য। ঐ সৈন্যদের আছে ফিডেল, রাউল, চে'র মতো নেতারা। যুদ্ধে বাটিস্টা প্রায় পরাস্তই হলেন। তাঁরই সৈন্যরা ফিডেলের দিকে চলে না গেলেও রেডিও ট্রান্সমিটার ইত্যাদি ফিডেলের হাতে তুলে দিল। যার ফলে ফিডেলের সৈন্যরা টের পেয়ে গেল সরকারী সৈন্যরা কোথায় কোথায় ঘাঁটি গেড়েছে। সরকারী সৈন্যরাও গেরিলা যুদ্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে শুরু হল বৃষ্টি। বাটিস্টা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এদিকে কিউবার সমস্ত বিপক্ষ দলই বাটিস্টার বিরুদ্ধে একজোট হচ্ছিল। ফিডেল অবশ্য এঁদের তেমন পাত্তা দেন নি, কেননা তাঁর বিপ্লবী প্রোগ্রামের সঙ্গে এঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না—এঁরা চাইছিলেন বাটিস্টাকে সরিয়ে দ্বিতীয় কোনো রাষ্ট্রপতি আনতে। ফিডেলের উদ্দেশ্য বিপ্লব, রাষ্ট্রশক্তির চেহারা পুরো পাল্টে দেওয়া।

১৯৫৮ সালের ১০ জুলাই অবশ্য ফিডেল একটা যুক্তফ্রণ্ট তৈরি করতে রাজি

হলেন। এদিকে, তিন মাস পর, সিয়েরায় বাটিস্টার আক্রমণকারী সৈন্যরা প্রায় ধ্বংসই হয়ে গেল। যারা প্রাণে বাঁচল তারা যোগ দিল ফিডেলের বিপ্লবী সৈন্যদলে। কিন্তু তাহলেও বাটিস্টার আরো পঁচিশ হাজার সৈন্য রয়ে গেছে।

২১ আগস্ট চে গুয়েভারার নেতৃত্বে বিপ্লবী সৈন্যরা পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল। পাহাড় থেকে নেমে তারা আসবে লাস ভিলাস প্রদেশে, এর রাজধানী সাণ্টা ক্লারা দখল করার জন্য। আড়াইশো শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা নিয়ে গুয়েভারা, বৃষ্টির মধ্যে, রাত্রের অন্ধকারে, সৈন্যদের এড়িয়ে এগিয়ে চললেন। তাঁর সৈন্যদের কেউ কেউ সামনাসামনি যুদ্ধে পড়ে গেল, কিছু নিহত হল। কিন্তু গুয়েভারা তার পরিবর্তে অনেক বেশি কর্মী পেলেন যারা বিপ্লবী সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিল। দিকে দিকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড সৈন্যদের সংখ্যাও বিপুল হয়ে উঠল।

সেই বছর ক্রিসমাসের আগের সন্ধ্যায় কিউবার লোকেরা শুনল : চে গুয়েভারা সাণ্টা ক্লারা দখল করেছেন, ফিডেলের সৈন্যরা পালমা সরিয়ানোতে ঢুকে পড়েছে, রাউল কাস্ট্রো সান্টিয়াগোর দিকে এগিয়ে চলেছেন, পশ্চিমের এক শহরে বাটিস্টার সৈন্যরা পালাচ্ছে, হাভানা শহরে মিলিটারি ঘাঁটিগুলো বোমায় উড়ে গেছে।

ব্যাপার বুঝে ১৯৫৯ সালের নববর্ষে বাটিস্টা প্লেনে ক'রে কিউবা থেকে পালালেন। বলে গেলেন অবশ্য, তাঁর পদে তিনি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করছেন, তবে তাঁর কথা কেউই গ্রাহ্য করল না। ফিডেলের সৈন্যরা সান্টিয়াগো দখল ক'রে মনসাডা দুর্গের উপর বিপ্লবী বাহিনীর লালকালো পতাকা উড়িয়ে দিল। বিপ্লবী সৈন্যরা প্রতিজ্ঞা করেছিল, যতদিন কিউবার সত্যকার স্বাধীনতা না আসে, ততদিন তারা দাড়ি কামাবে না। তাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হল। কিউবায় বিপ্লব ঘটল, বিপ্লবী সরকারের হাতে রাষ্ট্রশক্তি এল।

১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি কিউবাতে যে বিপ্লব ঘটল সেটা কি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব? আক্ষরিক অর্থে, নয়। বিপ্লবের পরও উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ সরকার হাতে নেয় নি। দেশের অর্থনীতি কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে আসে নি। ব্যক্তিগত মালিকানা একেবারে উচ্ছেদ করা হয় নি।

কিন্তু আক্ষরিক অর্থে না হলেও ২৬ জুলাইয়ের আন্দোলনের ভিত্তি ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশগঠনের প্রতিজ্ঞা। 'ইতিহাস আমাকে মুক্তি দেবে' আবেদনে, ১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারির বিপ্লবী সরকার গঠনের প্রতিজ্ঞাশর্তেও ছিল এর স্পষ্ট ইঙ্গিত। নতুন নতুন শিল্প যা তৈরি হবে, তা হবে সরকারী হাতে। ব্যক্তিগত মালিকানার পুরো উচ্ছেদ হল না, কিন্তু তার শক্তিকে ভোঁতা ক'রে দেওয়া হল।

গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্য ঘোষিত হল। রেল ইত্যাদি বড়ো বড়ো শিল্প-সংস্থা জাতীয়করণ ক'রে নেওয়া হবে জানানো হল।

ফিডেল কাস্ট্রো বা তাঁর সহচররা অবশ্য নিজেদের কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেন নি। কিন্তু কাস্ট্রোর অসাধারণ নেতৃত্ব লক্ষ ক'রে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি শেষের দিকে ফিডেলের সঙ্গে পুরো সহযোগিতা করেছেন এবং ১ জানুয়ারির পর সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। তার কারণ আর কিছু নয়। এই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-সংখ্যা আঠার হাজার হলেও, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নে তাদের শক্তি থাকা সত্ত্বেও, রাষ্ট্রশক্তি দখল করার তেমন কোনো পরিষ্কার পরিকল্পনাই তাদের ছিল না। তারা যদিও ফিডেল সম্পর্কে, ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত তেমন উৎসাহ দেখায় নি, কিন্তু ২৬ জুলাইয়ের আন্দোলন সম্পর্কে আশাবাদী হয়েছিল, এর সমাজতান্ত্রিক চরিত্র লক্ষ ক'রে সহযোগিতা করতে আরম্ভ করেছিল। স্পষ্ট কথায়, ফিডেল কমিউনিজম গ্রহণ করেন নি, কিন্তু মোটামুটি সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাই কিউবাই ইতিহাসে প্রথম ঘটনা যখন কমিউনিস্ট না হয়েও একটি বিপ্লবী সরকার কমিউনিস্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করতে গেল।

১১
ভিয়েতনাম

আমার নাম তোমার নাম…

অস্ত্রের চাইতে মানুষ বড়ো, একথা আর একবার প্রমাণ ক'রে ভিয়েতনাম বর্তমান জগতে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি আমেরিকা দশ বছর ধরে চেষ্টা করেও পৃথিবীর অন্যতম ক্ষুদ্র দেশ ভিয়েতনাম ধ্বংস করতে পারে নি। এই ইতিহাস একদিকে যেমন মানুষের ক্রূর নিষ্ঠুর রূপের সাক্ষ্য অপরদিকে মানুষের ধৈর্য সাহস এবং সংগ্রামেরও। বর্তমান শতাব্দীতে তাই ভিয়েতনামের ইতিহাস মহাকাব্যের মহিমায় মণ্ডিত হয়েছে।

ছোট দেশ এশিয়ার পূর্ব উপকূলে। তিন কোটি মতো লোক। উনিশ শতকের শেষ দিকে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরা এই দেশটি দখল ক'রে নেয়, কারণ শান্তিপ্রিয় ফরাসি বণিক আর মিশনারিদের উপর নাকি ভিয়েতনামীরা অত্যাচার করে। ফরাসিরা দেশটা দখল ক'রে তিনটি ভাগে ভাগ ক'রে দেয়। কোচীন-চীন, এটা একেবারেই ফরাসি উপনিবেশে পরিণত হল, আন্নাম, এটা থাকল ভিয়েতনামেরই রাজার কর্তৃত্বে, এবং টনকিন, এটা হল ফরাসি গভর্নর-শাসিত প্রোটেকটোরেট।

১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা ক'রে লেনিন ঘোষণা করেছিলেন, প্রতিটি উপনিবেশের অধিকার আছে স্বাধীনতা পাওয়ার। ১৯১৮ সালে বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসনও উপনিবেশের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা অর্জনের অধিকার স্বীকার করেন। কিন্তু অন্য অনেক দেশের মতো ভিয়েতনামেও স্বাধীনতা আসার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ভিয়েতনামে ঔপনিবেশিক অত্যাচারে জর্জরিত কৃষকরা কয়েকবার বিদ্রোহ করলে কঠোর হাতে সেসব দমন করে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরা।

আন্নামের এক ব্যক্তি, স্বভাবে কবি আর পুস্তকানুরাগী, নতুন নেওয়া নাম তাঁর হো চি মিন, বয়স ২৯, প্যারিসে ভার্সাই সম্মেলনে আবেদন করলেন, তাঁর দেশকে

স্বাধীনতা দেওয়া হোক। সেই আবেদনে কেউ কর্ণপাত করল না। ইতিমধ্যে হো চি মিন দেশবিদেশে ঘুরেছেন তাঁর দেশের স্বাধীনতার জন্য সাহায্যের আশায় আশায়। ঘুরেটুরে তাঁর মনে হল, দেশের মুক্তি আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে আসবে না। আসবে যদি শ্রমিক-কৃষকের সঙ্ঘবদ্ধ জোট সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে সজোরে রাষ্ট্রশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারে।

পরবর্তী পঁচিশ বছর হো চি মিনের কাটল দেশবিদেশে মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করতে। বিদেশে কোথায় কোথায় মুক্তিসংগ্রামী ভিয়েতনামী আছে, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করা, বিপ্লবী সেল গঠন করা, প্রচার করা, এইসব কাজে। পুলিশকে এড়ানোর জন্য ছদ্মনাম। কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, পুস্তিকা ইত্যাদি রচনা। বাস কখনো জেলে, কখনো প্যাগোডায়, কখনো ভিলাতে। স্বাধীনতাসংগ্রামের নানা পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বর্জন, আবার পরিকল্পনা। এরই সঙ্গে সঙ্গে লেনিন, স্ট্যালিন, মাওয়ের রচনা পাঠ। ইন্দোচীন কমিউনিস্ট পার্টি গঠন। স্ট্যালিনের সঙ্গে পরিচয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে জাপানের এশিয়া-বিজয় শুরু হল। ভিয়েতনামে ফরাসি সরকার জাপানের সঙ্গে মিতালি ক'রে ভিয়েতনামের মাটিতে জাপানি সৈন্য রাখতে রাজি হল।

১৯৪১ সালে হো চি মিন চীনের দক্ষিণ প্রদেশ কোয়াঙসির এক শহরে প্রবাসী ভিয়েতনামীদের এক সম্মেলন ডাকলেন। এই সম্মেলনে কমিউনিস্ট, বামপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী ভিয়েতনামীরা সংগঠিত হল 'ভিয়েতমিন' নামে। যুদ্ধের ফলে ফরাসি জাপানি সাম্রাজ্যবাদীদের ধ্বংস ঘটলে এরাই রাষ্ট্রশক্তি দখল ক'রে নেবে, তার প্রতীক্ষা শুরু হল। সঙ্ঘবদ্ধ কমিউনিস্টরাই ভিয়েতমিনদের মধ্যে প্রবল। এদের এক নেতা, জিয়াপ, সেনাবাহিনী গঠন করা শুরু করলেন বিপ্লবের জন্য। তিনি মাও সে-তুঙের 'গেরিলা যুদ্ধ কৌশল' পাঠ করতে লাগলেন। ওদিকে কুওমিনটাঙ নেতা চিয়াঙ কাই-শেকও পাল্টা দল গঠন করছেন ভিয়েতনামীদের নিয়ে, উদ্দেশ্য ভিয়েতনামে চীনের তাঁবেদার সরকার গঠন। তাঁরা একটা অস্থায়ী সরকারও গঠন করেছেন, হো চি মিনকেও আহ্বান করেছেন তাতে যোগ দেওয়ার জন্য।

অস্থায়ী সরকারের সদস্যদের মধ্যে অবশ্য কোনো মতের বা পথের মিল নেই। ইতিমধ্যে জিয়াপের নেতৃত্বে ভিয়েতমিন গেরিলারা ভিয়েতনামের চাও বাঙ প্রদেশটি দখল ক'রে নেয় ১৯৪৪ সালে, জাপানের আত্মসমর্পণের এক বছর

আগেই। সেই বছরই অক্টোবর মাসে হো চি মিন স্বয়ং ভিয়েতনামে হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন করলেন। ১৯৪৫ সালে ১৬ আগস্ট, জাপানের আত্মসমর্পণের পর, হো চি মিন ও ভিয়েতমিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের জনসাধারণ শহরে-শহরে গ্রামে-গ্রামে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ২ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। হো চি মিন হলেন রাষ্ট্রপতি। রাজা বাও-দাই পদত্যাগ করলেন।

কিন্তু ভিয়েতনামের উপর কর্তৃত্ব ছাড়তে সাম্রাজ্যবাদীরা সম্মত নয়। মহাযুদ্ধের ফলে এক আমেরিকা ছাড়া আর সব সাম্রাজ্যবাদীরই নাভিশ্বাস উঠেছে, কিন্তু শোষণের মোহ যায় নি। মহাযুদ্ধে বিজয়ী শক্তি ইংল্যাণ্ড ভিয়েত-নামে সৈন্য পাঠালো, কিন্তু উপনিবেশ রক্ষা করার শক্তি তার নেই। তাই ব্রিটিশ সৈন্যরা পথ ক'রে দিল ভিয়েতনামের পুরনো ঔপনিবেশিক শক্তি ফরাসি সাম্রাজ্যবাদকে। পরাজিত জাপানি সৈন্যদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার নামে ফরাসি সৈন্যরা ভিয়েতনামের দক্ষিণে ঘাঁটি গেড়ে বসল। ফরাসি সৈন্যদের এবং ফরাসি নাগরিকদের উপর অত্যাচার হচ্ছে এই অজুহাত দেখিয়ে ফরাসি সৈন্যরা আরম্ভ করল ১৬ অক্ষাংশের দক্ষিণে পুরো ভিয়েতনাম অঞ্চলে ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও ভিয়েতনামের রাজনৈতিক কর্মীদের বিতাড়ন। এটা হল ১৯৪৫ সাল। উত্তর-ভিয়েতনামও ফরাসি সৈন্যরা অধিকার করার প্রচেষ্টায় ছিল। ১৯৪৬ সালে হো চি মিনের সঙ্গে ফরাসি সরকারের রফা হল: ভিয়েতনাম স্বাধীন প্রজাতন্ত্র বটে, তবে ফরাসি ইউনিয়নের মধ্যে— পরিবর্তে ভিয়েতনামের মাটিতে পাঁচ বছরের জন্য একটি ফরাসি সৈন্যবাহিনী থাকবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল ভিয়েতনামে ফরাসি প্রতিনিধি কোচিন-চীনে হো চি মিনদের বাদ দিয়ে কিছু ভিয়েতনামীদের নিয়ে সায়গনে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র তৈরি করেছেন। হো চি মিন প্রতিবাদ করলেন, কোনো ফল হল না। হো চি মিন ও ভিয়েতমিনদের শক্তি ফরাসিদের তুলনায় কম, সুতরাং এই অবৈধ কাজটা তাঁদের মেনে নিতেই হল। কিন্তু এটা মানার পরও ফরাসি সৈন্যরা উত্তর-ভিয়েতনামের শহর দখল করা শুরু করল। শুরু হল ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম। যার পরিণতি দিয়েন বিয়েন ফু-তে জিয়াপের হাতে ফরাসিদের প্রচণ্ড পরাজয়।

এদিকে অবশ্য ফরাসিদের প্রতিপত্তি আমেরিকানদের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল। তারাও চায় এশিয়ার মাটিতে শিকড় গাড়তে। সুতরাং তারা

ফরাসিদের সঙ্গেই শুরু করল তাদের খেলা। তাদেরই বুদ্ধিতে ফরাসিরা বাও-দাইকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু বাও-দাই চালে ভুল করলেন। তিনি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন এবং পুরো ভিয়েতনামের সম্রাট হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বললেন ভিয়েতনামীদের কাছে গণভোটের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হোক তারা প্রজাতন্ত্র অথবা রাজতন্ত্র কোন্‌টা চায়। গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের (ডি-আর-ভি) উপরাষ্ট্রমন্ত্রী এর জবাব হিশেবে ঘোষণা করলেন ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর ডি-আর-ভি প্রজাতন্ত্র হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এর পর অনেকবার নির্বাচন হয়েছে, তাতে ভিয়েতনামীরা অংশ গ্রহণ করেছে, অতএব প্রজাতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, এর পর বাও-দাইয়ের ঘোষণার কোনো অর্থ হয় না। ইতিমধ্যে চীনে মাও সে-তুঙ নতুন প্রজাতন্ত্র গঠন করেছেন। নতুন চীন প্রজাতন্ত্র, রাশিয়া এবং পৃথিবীর যাবতীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ডি-আর-ভিকে সমর্থন করল। এই ডি-আর-ভিতে আছে ভিয়েতনামের তিন-চতুর্থাংশ এবং অধিবাসীদের প্রায় অর্ধেক।

এর জবাবে আমেরিকার তত্ত্বাবধানে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ঘোষণা করল ভিয়েতনামে তারা কেবল বাও-দাইকে জানে। এবং বাও-দাই-ই ভিয়েতনামের শাসক। বাকি সব অবৈধ। আমেরিকা ওদিকে চিয়াঙ কাই-শেকের হয়ে লড়ে যাচ্ছে। কোরিয়ায় যুদ্ধ লেগে গেছে ১৯৫০ সালে। আমেরিকার মিলিটারি মিশন এসে গেছে সায়গনে, তাদের যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। ফরাসিদের রাজনৈতিক এবং যুদ্ধবিষয়ে শলাপরামর্শ দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। আমেরিকার সপ্তম নৌবাহিনী চীনের উপকূলে হাজির। ফরাসিরা অবশ্য চেষ্টা করল আমেরিকানদের বাদ দিয়েই ভিয়েতমিনকে খর্ব করতে। কিন্তু দিয়েন বিয়েন ফু-তে সার্বিক পরাজয়ের পর তারা রণে ক্ষান্ত দিল। শুরু হল আমেরিকানদের খেলা।

ফরাসিরা তখন এশিয়া ছাড়তে পারলে বাঁচে। বৃহত্তর শক্তি আমেরিকা পুরো ঘাঁটি গেড়ে বসেছে এশিয়ায়। চীনে চিয়াঙ কাই-শেককে মদৎ দিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা, কোরিয়ায় দক্ষিণদিকের তাঁবেদার সরকার বসিয়েছে। ভিয়েতনামেও সে দখল ছাড়বে না। ভিয়েতনামে যদিও ভিয়েতমিনরাই যুদ্ধ ক'রে এসেছে ফরাসিদের সঙ্গে, তবু আমেরিকার ধারণা ভিয়েতমিনদের শক্তির উৎস চীন। আমেরিকা ভিয়েতনামে ফরাসিদের যে পরিমাণে সাহায্য ক'রে এসেছে, ভিয়েতমিনদের সমর্থনে চীনের সাহায্য সে তুলনায় প্রায় কিছুই নয়, আটভাগের একভাগ

হবে কি না সন্দেহ। তবু আমেরিকা এশিয়ায় কমিউনিজম-রোধে বদ্ধপরিকর, দরকার হলে সে অ্যাটম বোমা ফেলতেও প্রস্তুত।

জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে ১৯৫৪ সালে জেনিভা সম্মেলন বসে, কোরিয়াতে যুদ্ধবিরতি করার জন্য। সেই সম্মেলনেই ঠিক হল ভিয়েতনামেও কোরিয়ার মতো, দুই ভিয়েতনামী দল নিজস্ব প্রভাবান্বিত অংশ ছেড়ে পরস্পর বিরোধিতা করবে না। ১৭ অক্ষাংশ বরাবর যুদ্ধবিরতি রেখা টানা হবে। দু-বছর পর গণ-ভোটের মাধ্যমে ভিয়েতনামীরা বিবেচনা করবে তারা কাকে চায়— হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতমিনকে, অথবা আমেরিকান-ফরাসি সমর্থিত দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারকে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ভিয়েতনাম বিভাগ নয়, দু-বছরের জন্য যুদ্ধে বিরতি। চুক্তি অনুসারে ঠিক হল, ১৭ অক্ষরেখার দক্ষিণ থেকে ভিয়েতমিন গণসেনাবাহিনী উত্তর-ভিয়েতনামে চলে যাবে, ফ্রান্সের বাহিনী চলে আসবে উত্তর থেকে দক্ষিণে। অবশ্য ১৭ অক্ষরেখার উত্তরে দিয়েন বিয়েন ফু-র পতনের পর ফরাসি কোনো বাহিনীই ছিল না। অর্থাৎ এর ফলে দক্ষিণ থেকে গণবাহিনী উত্তরে চলে যেতে বাধ্য হল আমেরিকান চালে।

আমেরিকা এই সুযোগই খুঁজছিল। দক্ষিণ-ভিয়েতনাম তার কব্জায়। ইন্দো-চীন তার চাই সামরিক ও রাজনৈতিক কারণে। ইন্দোচীন যার এশিয়া তার, প্রশান্ত মহাসাগরে আধিপত্য তার। চীনের ও কোরিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক আধিপত্য রোধ করা দরকার। ইন্দোচীনের খনিজ সম্পদ, রবার আর টিন নিজেদের ভোগে লাগানো দরকার।

এদিকে বাও-দাই পদত্যাগ করেছেন, পরিবর্তে নো দিন দিয়েমকে শিখণ্ডী ক'রে আমেরিকা দক্ষিণ-ভিয়েতনামে প্রভাব বিস্তার শুরু করল। উত্তর থেকে জমিদার শ্রেণীর ভিয়েতনামীরা দক্ষিণে চলে এল। বিপ্লবী গণবাহিনী দক্ষিণের অনেক অংশে ভূমিসংস্কার সমাধা করেছিল, সেইসব অঞ্চল আবার সামন্তশ্রেণীর হাতে চলে এল। আগে খাজনা ছিল উৎপন্ন শস্যের ১৫ থেকে ২৫ ভাগ, দিয়েম নেওয়া শুরু করলেন ৪৫ থেকে ৫০ ভাগ। কৃষকরা বিদ্রোহ করল। দিয়েম ধর্মসম্প্রদায়ের উপরও আঘাত করা শুরু করলেন। ফরাসিদের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের খতম করা শুরু হল। জনসাধারণের নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দেওয়া হল। এর প্রতিক্রিয়া শুরু হল শীঘ্রই। ধর্মীয় সভা, নাগরিকদের প্রতিবাদ, হাজার হাজার মিছিল আর সমাবেশ। দাবি উঠল দুই ভিয়েতনামের মিলন, সাধারণ নির্বাচন, দমননীতি বন্ধের— সামরিক বাহিনীর

অত্যাচার বন্ধের। বদলে দিয়েম অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। রাষ্ট্র-বিরোধী কাজের ইচ্ছা পোষণ করলেই মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা বেরুল। সমস্ত দক্ষিণ-ভিয়েতনাম কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ ক'রে প্রত্যেক অঞ্চলে রাষ্ট্রবিরোধীদের খুঁজে মারা হতে লাগল। তৈরি হল অসংখ্য বন্দীশিবির। হাজার হাজার পুলিশ, গোয়েন্দা, নিরাপত্তা বিভাগের লোক ঘুরে বেড়াতে লাগল 'রাষ্ট্রদ্রোহীদের' খোঁজে, তাদের সঙ্গে কামান, বিমান, এমন কি যুদ্ধজাহাজ। হিশেব ক'রে দেখা গেছে ১৯৫৮ সাল থেকে শুরু ক'রে দশ বছরের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ দক্ষিণ ভিয়েতনামীকে মেরেছে এই দিয়েম সরকার, আর পঙ্গু ক'রে দিয়েছে সাড়ে সাত লক্ষ মানুষকে। ছয় লক্ষ ভিয়েতনামী বন্দীশিবিরে।

এর মোকাবিলায় দক্ষিণ ভিয়েতনামীরা সশস্ত্র সংগ্রামে নামল। বিষাক্ত তীর, বাঁশের বর্শা আর লোহা-পাথরের অস্ত্র তাদের সম্বল। উপজাতীয় ভিয়েতনামীরা প্রথম অগ্রসর হল এই সংগ্রামে, যোগ দিল সমতলের অধিবাসীরা। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল গণ-আত্মরক্ষা বাহিনী, প্রতিরোধ সঙ্ঘ। তৈরি হল শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষের গণবিপ্লবী দল। সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হল রাজনৈতিক সংগ্রাম। নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তৈরি হল ১৯৬০ সালের ২০ ডিসেম্বর দক্ষিণ ভিয়েতনামের 'জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্ট'। এতে যোগ দিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে। গণবিপ্লবী দল, র‍্যাডিকাল সোস্যালিষ্ট দল, গণতান্ত্রিক দল— এই তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দল এই ফ্রণ্টে যোগ দিল। সকল ধর্ম, জাতি ও শ্রেণীর লোকদের নিয়ে তৈরি হল ফ্রণ্ট।

এই ফ্রণ্ট আহ্বান জানালো, মার্কিন তাঁবেদার সরকারকে উৎখাত করার জন্য, মার্কিন প্রভাব থেকে ভিয়েতনামের মুক্তি, গণতান্ত্রিক জাতীয় কোয়ালিশনের প্রতিষ্ঠা এবং দুই ভিয়েতনামের মিলনের জন্য। দিয়েন বিয়েন ফু-তে শেষ হয়েছিল ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ। এবার শেষ করতে হবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

এদিকে আমেরিকা ক্রমাগত বাড়িয়ে যাচ্ছে তার ভিয়েতনাম আক্রমণ। ১৯৪৫ সালেই ফরাসি সরকারকে সামরিক শলাপরামর্শ দেওয়ার জন্য মার্কিন সরকার একটা দল পাঠিয়েছে। মহাযুদ্ধের পর যে ফরাসি বাহিনী ভিয়েতনামে উপস্থিত হয়েছিল তার সাজ-সরঞ্জামের শতকরা আশিভাগ মার্কিনদের দেওয়া। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত মার্কিন সরকার ভিয়েতনামে খরচ করল ২০০ কোটি ডলার। জেনিভা চুক্তির সময় এই সরকার পাঠিয়েছে ৩৬০ বিমান,

১৪০০ ট্যাঙ্ক, ৩৯০ যুদ্ধজাহাজ, ১৬,০০০ সামরিক যান, ১,৭৫,০০০ বন্দুক ও মেশিনগান আর ১৯,০০০,০০০ টন যুদ্ধাস্ত্র। এ ছাড়াও ব্রিটিশ প্রভৃতি সরকারকে তারা বাধ্য করল ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অংশীদার করতে।

ভিয়েতনাম, লাওস আর কাম্বোডিয়া 'রক্ষা' করার জন্য তৈরি হল ১৯৫৪ সালে 'সিয়াটো' যুদ্ধসংস্থা। জেনিভা চুক্তি অগ্রাহ্য ক'রে আমেরিকা চালালো তার দক্ষিণ-ভিয়েতনামকে উপনিবেশ করার চক্রান্ত, যাতে উত্তর-ভিয়েতনাম আক্রমণ ক'রে পুরো দেশটাকেই উপনিবেশ বানানো যায়। পাঁচ বছরে অবৈধভাবে পাঠালো ৮০০ জাহাজ বোঝাই অস্ত্র। ৭৯টি সামরিক উপদেষ্টা দল গেল সেই দেশে। মার্কিন সৈন্য সংখ্যায় ২০০ থেকে ২০০০-এ বেড়ে গেল। ১৯৬০ নাগাদ তার প্রেরিত অস্ত্রের দাম হল ৭৪,০০০,০০০ ডলার। দিয়েমকে সাহায্য করার জন্য আরো ১৭০ কোটি ডলার গেল। দক্ষিণ-ভিয়েতনামে তারা তৈরি করল ৫৭টি বিমানঘাঁটি, ৪টি নৌবাহিনীর ঘাঁটি, আর প্রয়োজনীয় রাস্তা।

১৯৫৬ পর্যন্ত এই আক্রমণ আরো বেড়ে গেল। ভিয়েতনামের মাটিতেই ১৯৫৬ সালে গেল ৪৬০,০০০ মার্কিন সৈন্য এবং সপ্তম নৌবহরে আরো; থাইল্যাণ্ড, ফিলিপিনস, ওকিনাওয়া, গুয়ামে আরো। ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্যদের সাহায্যের জন্য গেল ৩৫০০ বিমান; কামান বন্দুকের সংখ্যা অগণিত। বিমানঘাঁটি বেড়ে হল ১৬৯, নৌঘাঁটি ১১। ইতিমধ্যে দিয়েমের সৈন্যসংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে ছয় লক্ষে। অন্যান্য 'সিয়াটো দেশ' থেকে আনা হয়েছে ৫৫ হাজার ভাড়াটে সৈন্য। ১৯৬৭ সাল নাগাদ মার্কিন সরকার দক্ষিণ-ভিয়েতনামে যুদ্ধ করার জন্য খরচ বরাদ্দ করল ৩০০০ কোটি ডলার। নাপাম বোমা, বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, গ্যাস ইত্যাদি অবিরত ব্যবহার করা শুরু হল। রাসায়নিক পদার্থে ধ্বংস হল দক্ষিণ-ভিয়েতনামের ২৬টি প্রদেশে ৭০০,০০০ হেক্টর জমি, মারা গেল দু লক্ষ লোক।

কিন্তু, এই ধ্বংসলীলায় ভিয়েতনামীরা দমে নি, আত্মসমর্পণ করে নি। তাদের 'শান্ত' করা যায় নি। মার্কিন পরামর্শদাতা, ভাড়াটে সৈন্য, তাঁবেদার সৈন্য, খোদ মার্কিন সৈন্যদের নিয়ে 'বিশেষ ধরনে'র যুদ্ধেও ভিয়েতনামীদের কাবু করা যায় নি। 'স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট'-এর কৌশল অনুযায়ী বন্দীশিবির বানিয়েও না। ১৯৫৬ সাল নাগাদ আমেরিকা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নেমে সশস্ত্র ভিয়েতনামী ফৌজকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টায় ব্রতী হয়। সশস্ত্র মুক্তিফৌজ ধ্বংস হয় নি। আমেরিকানদের দ্বিতীয় লক্ষ্য, ভিয়েতনামীদের শান্ত করা। নৃশংস

অত্যাচার একদিকে, অন্তদিকে বিলাসব্যসনে তাদের লুব্ধ করা। তাও সফল হয় নি। তৃতীয় লক্ষ্য, সায়গন সরকারকে সমর্থন করা। কিন্তু ভিয়েতনামীরা তাঁবেদার সরকারের জন্ত যুদ্ধ করতে ক্রমশই নিঃস্পৃহ হয়ে উঠল, সায়গন সরকার ছেড়ে তারা মুক্তি ফ্রণ্টে আসা শুরু করল। চতুর্থ লক্ষ্য, উত্তর-ভিয়েতনামের সঙ্গে দক্ষিণ-ভিয়েতনামর যোগাযোগ ধ্বংস করা, যাতে দক্ষিণের গেরিলারা উত্তর থেকে সাহায্য না পায়। তাও সম্ভব হয় নি। পঞ্চম লক্ষ্য, উত্তর-ভিয়েতনামে বোমা মেরে তাদের আলোচনায় বসতে বাধ্য করা এবং মার্কিন আজ্ঞা মান্ত করা। এই লক্ষ্যও সিদ্ধ হয় নি।

ভিয়েতনামীদের এই অসাধারণ ধৈর্য, অধ্যবসায়, সংগ্রামের সাফল্যের মূলে কী? ভিয়েতনামী জনগণ যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ ক'রে এসেছে। ঔপনিবেশিক দাসত্ব তারা আর মানবে না। জনযুদ্ধে তাদের বিশাল অভিজ্ঞতা। আর সমাজতান্ত্রিক দেশ, বিশেষত রাশিয়া ও চীনের সমর্থন আর সাহায্য তো অছেই। প্রতিটি দক্ষিণ-ভিয়েতনামী এই যুদ্ধের যোদ্ধা, প্রতি পুরুষ, স্ত্রী, বৃদ্ধ, তরুণ। কী ক'রে ফাঁদ পাততে হয়, মাইন লুকোতে হয়, মেশিনগান চালাতে হয়, হাতবোমা ছুঁড়তে হয়, যুদ্ধ-সংবাদ সংগ্রহ করতে হয় তা তারা জানে। তাছাড়া তারা রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত। তাদের ফ্রণ্টে আছে নিয়মিত বাহিনী, আঞ্চলিক সৈন্তদল, স্থানীয় গেরিলার দল। গেরিলাদের জন্য সর্বস্থানে প্রতিরক্ষা সুনিশ্চিত। নিয়মিত বাহিনী গমনাগমনে অতি পারঙ্গম। আঞ্চলিক বাহিনী, গেরিলা আর জনসাধারণ মার্কিন বাহিনীকে একটা স্থানে আটকে ফেলে, যোগাযোগ সূত্র কেটে দেয়, তাদের হামলা ঠেকায়। তখন নিয়মিত সৈন্য তাদের উপর হানে আঘাতের পর আঘাত। সমগ্র জনসাধারণ তাদের পক্ষে, দেশের ভূপ্রকৃতি তাদের নখদর্পণে, তাদের প্রতিরক্ষার জন্য বহুরকম বন্দোবস্ত, ট্রেঞ্চ, সুড়ঙ্গ। বোমা পড়লেও, কামান দাগলেও এরা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়। শত্রু প্রবল, কিন্তু তার কাছে সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য-বস্তু নেই। অস্পষ্ট বা ভুল সংবাদের উপর নির্ভর ক'রে এলোপাথাড়ি বোমা মারে, সেগুলো নষ্ট হয়। অন্তদিকে তাদের সদরঘাঁটি, অস্ত্রভাণ্ডার, বিমানঘাঁটি গণ-ফৌজের নখদর্পণে। সাধারণ যুদ্ধে শত্রুকে ঘায়েল করতে প্রতি-শত্রুতে তিনজন ক'রে সৈন্ত লাগে। ভিয়েতনামে 'বিশেষ ধরনের যুদ্ধ' চালানোর জন্য মার্কিনরা ১ জন গণবাহিনীর সৈনিকের বিরুদ্ধে ১০ জন লাগিয়েছে। তাতেও সুরাহা হয় নি। মার্কিন শিক্ষিত বাহিনীকে জখম ক'রে দিয়েছে গণফৌজ।

পাঁচ লক্ষ মার্কিন সৈন্ত, আর ভাড়াটে ও তাঁবেদার সরকারের পাঁচ লক্ষ সৈন্ত,

১ কোটি ৪০ লক্ষ ভিয়েতনামীকে পরাস্ত করতে পারে নি। তাদের সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র, উড়োজাহাজ, হেলিকপ্টার, রণতরী, নাপাম বোমা, ফসফরাস বোমা, বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করেও তারা নিজেরাই পর্যুদস্ত আর বিচ্ছিন্ন। অস্ত্রবলে ভিয়েতনামকে তারা কাবু করতে পারে নি। দক্ষিণ-ভিয়েতনামের শতকরা আশিভাগ হল মুক্তাঞ্চল, এক কোটি চল্লিশ লক্ষ লোকের এক কোটি মুক্ত। শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক অস্থায়ী গণশাসনব্যবস্থা মুক্ত এলাকায় গড়ে উঠেছে। প্রত্যেক গ্রামে আত্মনিয়ন্ত্রিত গণকমিটি, যারা শৃঙ্খলা রক্ষা করে, উৎপাদন-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখে, যুদ্ধ চালিয়ে যায়। নির্বাচনের মধ্যে গণকমিটি তৈরি হয়। কৃষকদের মধ্যে বিশ লক্ষ হেক্টর জমি বিলি হয়েছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সতেরোটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের নিজের ভাষায় লেখাপড়া শেখে। প্রত্যেক গ্রামে আছে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। বিপুল প্রচার-পত্রিকা। ফ্রন্টের আহ্বানে কৃষকরা উৎপাদন-পদ্ধতি উন্নত করেছে, সেচনির্মাণ শেষ করেছে। শস্য উৎপাদন করে তারা ব্যাপক চাষের মাধ্যমে। সকলের গণ-তান্ত্রিক অধিকার। দক্ষিণ-ভিয়েতনামের সার্বভৌম ক্ষমতা চালাচ্ছে এই মুক্তি-ফ্রন্টের রাজনৈতিক রূপ দক্ষিণ-ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার। সায়গনে মার্কিন তাঁবেদার সরকার নামেই সরকার, আন্তর্জাতিক আইনে তার স্থান নেই, ভিয়েতনামের জনসাধারণকে তা প্রতিনিধিত্ব করে না। নো দিন দিয়েমের পর মার্কিন সরকার বারবার নতুন প্রেসিডেণ্ট বসিয়েছে, কিন্তু কোনো প্রেসিডেণ্টই ভিয়েতনামের সংখ্যাগুরু অংশকে নিজ প্রভাবে আনতে পারে নি।

দক্ষিণ-ভিয়েতনামে অজস্র শক্তিব্যয় করেও আমেরিকা যখন তাকে পরাস্ত করতে পারল না, তখন তাদের রণে ভঙ্গ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমেরিকার নিজের দেশেও জন্মাল প্রবল জনমত এই অন্যায় যুদ্ধ থামানোর জন্য। ভিয়েতনামে যে আমেরিকার কোনো অধিকারই নেই এবং যুদ্ধ ক'রে ভিয়েতনামকে পদানত করা যাবে না এটা বুঝে আমেরিকার জনসাধারণ তাদের সরকারের উপর চাপ দিল যুদ্ধ থামানোর জন্য। ভিয়েতনামে যুদ্ধ ক'রে আমেরিকার অর্থনীতি বিপর্যস্ত, দেশের কল্যাণের জন্য তার কাজকর্ম বন্ধ, শিল্পে উন্নতি ব্যাহত, বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, ডলারের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে কমে গেছে। তাই শেষ পর্যন্ত মার্কিন সরকারকে প্যারিসে শান্তির বৈঠকে আপসের কথা ভাবতে হল। এই বৈঠক চলেছে এখনও, ১৯৭৩ সালের জুন মাসের শেষেও।

আমেরিকা ভিয়েতনামে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে নেমেছে ১ জানুয়ারি ১৯৬২। আর সরকারীভাবে যুদ্ধ থামিয়েছে ১৩ জানুয়ারি ১৯৫৬ সালে। এগারো বছর ধরে যুদ্ধ আমেরিকা এর আগে আর কখনো করে নি। এতে তার খরচ হয়েছে ১০ হাজার কোটি টাকা। মরেছে তার ৫৬ হাজার সৈন্য, জখম হয়েছে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার। তার তাঁবেদার দক্ষিণ-ভিয়েতনামী লোক মরেছে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার। অন্য দিকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছে ৯ লক্ষ ২৮ হাজার গণমুক্তি ফৌজ আর উত্তর-ভিয়েতনামী সৈন্য। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভিয়েতনামের সাধারণ লোকদের মধ্যে যুদ্ধের ফলে মৃত্যুবরণ করেছে ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে সামিল হয়েছে দক্ষিণ-ভিয়েতনামের সর্ব শ্রেণী। এটা তাদের জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ। এই যুদ্ধে সহায়তা করছে চীন, উত্তর-ভিয়েতনাম আর রাশিযার নেতৃত্বে প্রায় সব সমাজতান্ত্রিক দেশ।

আমেরিকা অবশ্য প্রচার ক'রে চলেছিল যে চীন ও উত্তর-ভিয়েতনামের হাত থেকে দক্ষিণ-ভিয়েতনাম বাঁচানোর জন্যই তারা এই বিপুল অর্থব্যয, লোকব্যয়, শক্তিব্যয় ক'রে চলেছে। কিন্তু দক্ষিণ-ভিয়েতনামের লোকেরা যে আমেরিকার এই অযাচিত সাহায্য চায না, বরং উত্তর-ভিয়েতনামের সঙ্গে মিলনই চায়, তা আজ যে কোনো সৎ বিশ্ববাসী স্বীকার করে। চীন, রাশিয়া, উত্তর-ভিয়েতনাম অবশ্য সাহায্য করছে, উত্তর-ভিয়েতনামের সৈন্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধের মূল অংশ দক্ষিণ-ভিয়েতনামীদের নিংযেই। পরিবর্তে আমেরিকার সরকার যে বর্বর অত্যাচারের সাক্ষ্য রেখেছে ভিয়েতনামে, তাতে বার্ট্রাণ্ড রাসেল বাধ্য হয়েছিলেন ভিয়েতনাম যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করতে। এই যুদ্ধ-অপরাধী আর কেউ নয়, মার্কিন সরকার।

এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সংগ্রামী মানুষেরা ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে দক্ষিণ-ভিয়েতনামীদের প্রেরণায়। তাই তাদের সকলের মনের কথা : আমার নাম তোমার নাম··· ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম! ভিয়েতনাম আজ সংগ্রামী ঐক্যের প্রতীক, এক মহাকাব্য।

প রি শি ষ্ট

এই অধ্যায়ে আমরা কিছু ইতিহাসবিখ্যাত বিপ্লবের কথা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করব।

বিপ্লবের পীঠস্থান বলে খ্যাত ফ্রান্স। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের বিপ্লবের পর আরো কয়েকটা বিপ্লব ঘটে এই দেশে। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে, ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে, ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে, ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে।

১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা দশম চার্লস চেষ্টা করেন আবার রাজার এক-নায়কত্ব ফিরিয়ে আনতে। প্যারিস শহর বিপ্লবের পথে নামে, লুই ফিলিপ সেই বিপ্লবের কর্ণধার হয়ে সিংহাসনে এসে বসেন। এই বিপ্লবের ফলে ইয়োরোপে বহু অংশেও বিপ্লব আরম্ভ হয়ে যায়, যার সব ক'টিই ছিল সামন্তবাদী রাজার বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের বিপ্লব। স্যাক্সনি, ব্রানসউইক, হেস-ক্যাসেল, হ্যানোভারে শাসকরা ক্ষমতাচ্যুত হন এবং সেসব দেশে সংবিধান চালু হয়। পোল্যাণ্ডে বিপ্লবের ফলে সেখান থেকে রুশ সৈন্য পালিয়ে যায়। বেলজিয়াম স্বাধীন হয়। ইটালির মডেনা, পার্মা, পোপীয় রাজ্যে অস্ট্রিয়ান শাসকদের বিরুদ্ধে বিপ্লব হয়। কিন্তু এইসব বিপ্লব মূলত ছিল রাজনৈতিক, এর পিছনে অর্থনৈতিক সমর্থন বা সামঞ্জস্য না থাকায় বিপ্লব টেঁকে নি।

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সে এবং ইয়োরোপে বহু স্থানে বিপ্লব ঘটে। অর্থনৈতিক দুর্দশা, ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া, দুর্ভিক্ষ, বেকারত্ব, ব্যবসায়ে মন্দা, রাজনৈতিক স্থবিরত্ব এবং এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তীব্র জাতীয়তাবোধ, বুদ্ধিজীবীদের স্বপ্ন আর জনসাধারণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। যথারীতি এর শুরু ফ্রান্সে। লুই ফিলিপ ভোটাধিকার বাড়াবেন না গোঁ ধরায়, এই বিপ্লবের প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে ফেব্রুয়ারি মাসে, যার ফলে লুই ফিলিপের পতন এবং দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। সাধারণের ভোটাধিকার স্বীকৃত হল এব' এই বিপ্লবের পুরোধা লামার্টিন ভাবলেন বিপ্লব সমাধা হল। কিন্তু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী জনসাধারণ আবার বিপ্লবে নামল লুই ব্লাঁ'র নেতৃত্বে জুন মাসে। এই বিপ্লব নির্মম হাতে দমন করা হল।

একই সময় অস্ট্রিয়ান স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বিপ্লব হয় ইটালির নানা রাজ্যে। ফেব্রুয়ারি-মার্চে নেপলস, টাসকানি, পিডমণ্টে সংবিধান চালু হয়

বিপ্লবের পর। রোমে রোমান সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় পোপ পালিয়ে যাবার পর, কিন্তু পাঁচ মাস পর এর অবলুপ্তি ঘটে। ভেনিসে সেণ্ট মার্ক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার দেড় বছর পর ভেঙে যায়।

তখনকার প্রবল রাষ্ট্র খোদ অষ্ট্রিয়াতেও সাংবিধানিক সরকার তৈরি করার জন্য বিপ্লব হয়। ভিয়েনার রাস্তায় রাস্তায় মারামারির পর মেটারনিক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, সম্রাট পালিয়ে যান। সংবিধান তৈরি করার জন্য পরিষদ কৃষকদের যাবতীয় সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেয়। প্রাগে জাতীয়তাবাদীরা আন্দোলনে নেমে পড়ে, কিন্তু জঙ্গী সরকার তাদের দমন করে।

অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শুরু হয় হাঙ্গেরিতে, যার নেতৃত্ব দেন কসুথ। হাঙ্গেরির এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা অষ্ট্রিয়ান সম্রাট ফার্ডিনাণ্ড স্বীকার ক'রে নেন। হাঙ্গেরিরই অংশ ক্রোশিয়া কিন্তু এই বিপ্লবে অংশ না নিয়ে, নিজস্ব স্বাধীনতা দাবি ক'রে বসে, বিপ্লবীরা দুর্বল হয়ে পড়ে। কসুথ অষ্ট্রিয়ার হাপসবার্গ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরির স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সমবেত অষ্ট্রিয়া, ক্রোশিয়া আর রাশিয়ার সৈন্যদের মুখোমুখি হয়। একই সময়ে সার্বিয়া আর রুমানিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। হাঙ্গেরির জনসাধারণ এবং কসুথ রাশিয়ার হাতে পরাজিত হন, হাঙ্গেরিতে নেমে আসে প্রবল অত্যাচারীর শাসন।

জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যেও, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের এবং এক-জার্মানি গঠনের চেষ্টায়, বিপ্লব শুরু হয়। বার্লিনে গৃহযুদ্ধের পর রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়াম প্রাশিয়াকে জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত হন এবং সংবিধান তৈরি হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু হাঙ্গেরির বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ায় আশঙ্কিত হয়ে রাজা আবার স্বৈরতন্ত্র জোরদার করেন।

একই সময়ে ঘটে ইংল্যাণ্ডে চার্টিস্ট আন্দোলন, আয়ার্ল্যাণ্ডে কৃষক বিদ্রোহ, যার নাম তরুণ আয়ার্ল্যাণ্ড বিপ্লব, সুইটসারল্যাণ্ডের ব্যাডেনে বিপ্লব, ডেনমার্কে সংবিধানের জন্য বিপ্লব, রুমানিয়াতে তুর্কী সম্রাটের বিরুদ্ধে বিপ্লব।

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের এই সব বিপ্লবই ব্যর্থ হয়। সব বিপ্লবই ঘটে রাজার সামন্ততান্ত্রিক অধিকারে বিরুদ্ধে। বিপ্লব ব্যর্থ হলেও, সামন্ততন্ত্র যে ক্রমেই ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে, এই সব বিপ্লব তার পরিচয়। এক ফ্রান্সেই কেবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চেষ্টা হয়েছিল।

১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয় 'প্যারিস কমিউন'। প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে

হেরে গিয়ে ফ্রান্স অত্যন্ত অপমানকর সন্ধি করে প্রাশিয়ার সঙ্গে। ফ্রান্সে তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় এর পর এবং এর নেতা ছিলেন থিয়ার্স। এই থিয়ার্স ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে লিয়ঁ এবং প্যারিসে শ্রমিকদের বর্বরভাবে দমন ক'রে কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রাশিয়ানদের সঙ্গে অবমাননাকর সন্ধি করতে অস্বীকার ক'রে প্যারিসের বিপ্লবী জনসাধারণ প্রাশিয়ানদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে অস্বীকার করে। থিয়ার্স ভয়ে প্যারিস ছেড়ে পালিয়ে যান। ১৮ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় প্যারিস কমিউন। এর আদর্শ ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের জ্যাকোবিন পরিষদ। ২১ থেকে ২৯ মে পর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে প্যারিসের রাস্তায়, কমিউনের সঙ্গে প্রতিবিপ্লবী ফরাসি সরকারের। প্যারিস প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে যতটা ধ্বংস হয় নি, ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের সংগ্রামে যত ব্যক্তি নিহত হয় নি, তার থেকেও ধ্বংস ও মৃত্যু ঘটে এই সাতদিনে। কমিউন ধ্বংস ক'রে থিযার্স তৃতীয় সাধারণ-তন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজেকে নিযুক্ত করেন।

১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে মে-জুন মাসে ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রবিক্ষোভ ঘটে এবং এই বিক্ষোভ শ্রমিক-বিপ্লবে পরিণত হয়। ছাত্ররা বিক্ষোভ শুরু করে লেকচার বয়কট ক'রে, বিভিন্ন শাসন-ভবন অধিকার ক'রে, পরীক্ষা বর্জন ক'রে, রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে মারামারি ক'রে। ছাত্রদের সমর্থনে শ্রমিকরাও বিপ্লবে অংশ নিল, ঘটল বিরাট শ্রমিক-আন্দোলন। প্যারিস শহর উত্তাল। সরকার একেবারে অথর্ব। কিন্তু ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি এই বিপ্লবকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কোনো চেষ্টাই করে নি বলে অনেকের সন্দেহ। বিপ্লব ব্যর্থ হয়।

ল্যাটিন আমেরিকায় কিউবার বিপ্লব হয় ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে। এই মহাদেশের আর একটি দেশ, মেক্সিকোতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা চেষ্টা হয়েছিল ১৯১০ সালে। বস্তুত মেক্সিকোর আর এক নাম, বিপ্লবের দেশ, বিপ্লব এর ঘরে ঘরে শোনা নাম। কারণ চিরকাল মেক্সিকানরা সংগ্রাম ক'রে এসেছে তাদের মুক্তি অর্জনের জন্য। এই মেক্সিকোর মাধ্যমেই স্পেন তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকায়। ১৮১০ সালে মেক্সিকোয় বিপ্লব হয় জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের জন্য। ফরাসি বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হয়ে হিডালগো নামে এক গ্রাম্য পুরোহিতের নেতৃত্বে, গেরিলা সাংগ্রামের মধ্য দিয়ে, স্পেনের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু এবং সাফল্য ঘটে। তার একশো বছর পর ১৯১০ সালে ঘটে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লব সংঘটিত হয় স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপতি ডিয়াজ এবং বিদেশী পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে। এই সময় মেক্সিকোতে বিদেশী পুঁজি

দেশী পুঁজির চাইতেও বেশি ছিল। এ থেকেই বোঝা যায় মেক্সিকোর শাসন কার স্বার্থে চলছিল। জমিদার এবং বিদেশী পুঁজিপতিদের কৃষকরা গেরিলা-সংগ্রামের মধ্যে পরাজিত করে ১৯১১ সালে। তাদের নেতা মাডেরো রাষ্ট্রপতি হন ঐ বছরই। এই বিপ্লবের সময় জাপাটা, পাঞ্চো ভিলা, ওবরেগন— সবাই কৃষকসন্তান— এই সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামে বিভিন্ন অংশে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু এই বিপ্লব বেশিদিন টেঁকে নি। ১৯২০ সাল নাগাদ সমস্ত বিপ্লবী চিন্তা ধুয়েমুছে পরিষ্কার হয়ে যায। নেতারা সব নিহত হন গুপ্তঘাতকদের হাতে, প্রতিবিপ্লবীরা আবার শাসনভার তুলে নেয় তাদের হতে।

অনেক দেশে বিপ্লবের আর এক চেহারা ফুটে ওঠে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়। সমস্ত দক্ষিণ-আমেরিকা এবং মেক্সিকোতে ছিল স্পেন আর পর্তুগালের উপনিবেশ। আফ্রিকায় ছিল ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্সের উপনিবেশ। প্রশান্ত মহাসাগর দ্বীপপুঞ্জে ছিল আমেরিকার উপনিবেশ। ইন্দোচীনে ছিল ফ্রান্সের উপনিবেশ। মাঞ্চুরিযায ছিল রাশিযার উপনিবেশ। জাপানও চেষ্টা করেছিল উত্তর-চীনে উপনিবেশ করতে— কোরিযা, ফরমোজাতেও। এই ঔপনিবেশিক শাসনের ধরন বিভিন্ন রকম ছিল। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের প্রেরণায যে ঔপনিবেশিক শাসন চালু হয়, তারই নাম সাম্রাজ্যবাদ। এর উদ্দেশ্য, উপনিবেশগুলো শোষণ ক'রে, আপন দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি ক'রে, আপন দেশের কৃষক ও শ্রমিককে তুষ্ট ক'রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের হাত থেকে স্বীয় দেশকে রক্ষা করা। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই সাম্রাজ্যবাদীরা অনেকেই দুর্বল হযে পড়ে, সাম্রাজ্যরক্ষা করার মতো শক্তি তাদের হাতে ছিল না। অনেকেই ভাবেন, সাম্রাজ্যবাদীরা প্রত্যক্ষভাবে সৈন্য ও আমলা দিয়ে উপনিবেশ রক্ষা করার চেষ্টা ছেড়ে দিযে রাজনৈতিকভাবে উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয। যেমন দিয়েছিল ভারতবর্ষে ১৯৪৭ সালে। কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিলেও, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেয় নি। উপনিবেশগুলোতে তারা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক উপনিবেশ রেখেই চলেছে। এরই নাম নয়া-ঔপনিবেশিকতাবাদ। তাহলেও, প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এসেছে বলে, এই উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা-প্রাপ্তিও একরকমের বিপ্লব। নতুন একটি শ্রেণী এইসব দেশে রাষ্ট্রশক্তি আয়ত্ত করেছে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ হাত থেকে। দেশে দেশে এই শ্রেণীর বিভিন্ন রূপ।

বিপ্লবের ভবিষ্যৎ

আমরা এ পর্যন্ত যে আলোচনা করলাম, তা থেকে এটা অনুমান করা যায়, ভবিষ্যতেও বিভিন্ন দেশে শ্রমিক এবং কৃষক সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ধনতান্ত্রিক শোষণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রশক্তি হাতে নেবার চেষ্টা করবে।

এই চেষ্টা কীভাবে হবে, সহিংস অথবা অহিংস পদ্ধতিতে, সশস্ত্র অথবা গণতান্ত্রিক উপায়ে, তা নিয়ে প্রবল মতবিরোধ আছে। অনেকে মনে করেন— যেমন রাশিয়ার বর্তমান নেতারা— যেহেতু পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, রাশিয়ায়, চীনে, পূর্ব-ইয়োরোপে, সমাজতান্ত্রিক শক্তি রাষ্ট্র চালাচ্ছে, যেহেতু এই সমাজ-তান্ত্রিক শক্তি এখন বেশ প্রবল, সেই হেতু সাম্রাজ্যবাদীরা সশস্ত্র উপায়ে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব-চেষ্টা ব্যর্থ করতে সাহস পাবে না। আর সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের অনুচর বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিরা সশস্ত্র উপায়ে শ্রমিক-কৃষককে দমন না করলে, শ্রমিক-কৃষকেরও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন নেই. গণতান্ত্রিক— অর্থাৎ নির্বাচন, বিক্ষোভ, ইত্যাদি— আন্দোলনেই বিপ্লব আসবে। অপর দল বলেন, ধনতন্ত্রএবং সাম্রাজ্যবাদ সব সময়েই সশস্ত্র উপায়ে বিপ্লব দমন করবে, অতএব কৃষক-শ্রমিকের সশস্ত্র আন্দোলন ছাড়া উপায় নেই।

আবার তৃতীয় এক দল আছেন, যাঁরা মনে করেন, বিপ্লব জিনিসটারই আর কোনো প্রয়োজন নেই। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ নেই, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা। বর্তমান ধনতন্ত্রও পুরনো ধনতন্ত্র থেকে পৃথক। পুরনো ধনতন্ত্র সত্যসত্যই শোষণ করত, কিন্তু বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষের ঐশ্বর্যসৃষ্টির সম্ভাবনা এত হাজার গুণে বেড়ে গেছে যে কাউকে শোষণ করার দরকার হবে না। যেমন অনেকে মনে করেন, ইংল্যাণ্ড ধনতান্ত্রিক হলেও শ্রমিক-কৃষককে শোষণ করে না, এটার নাম জনকল্যাণকর রাষ্ট্র, ওয়েলফেয়ার স্টেট। এখন যদিও-বা কোথাও কোথাও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ আছে, ভবিষ্যতে তা-ও থাকবে না, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে—টেকনোলজি, প্রয়োগবিদ্যার অভাবনীয় সৃষ্টিক্ষমতার প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

এইসব মতের কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা তা বিচার করবে ভবিষ্যতের ইতিহাস। ইতিহাসচর্চা এখনো পুরো বিজ্ঞানসম্মত হয়ে ওঠে নি, তাই এবিষয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী ব্যর্থ হতে বাধ্য।